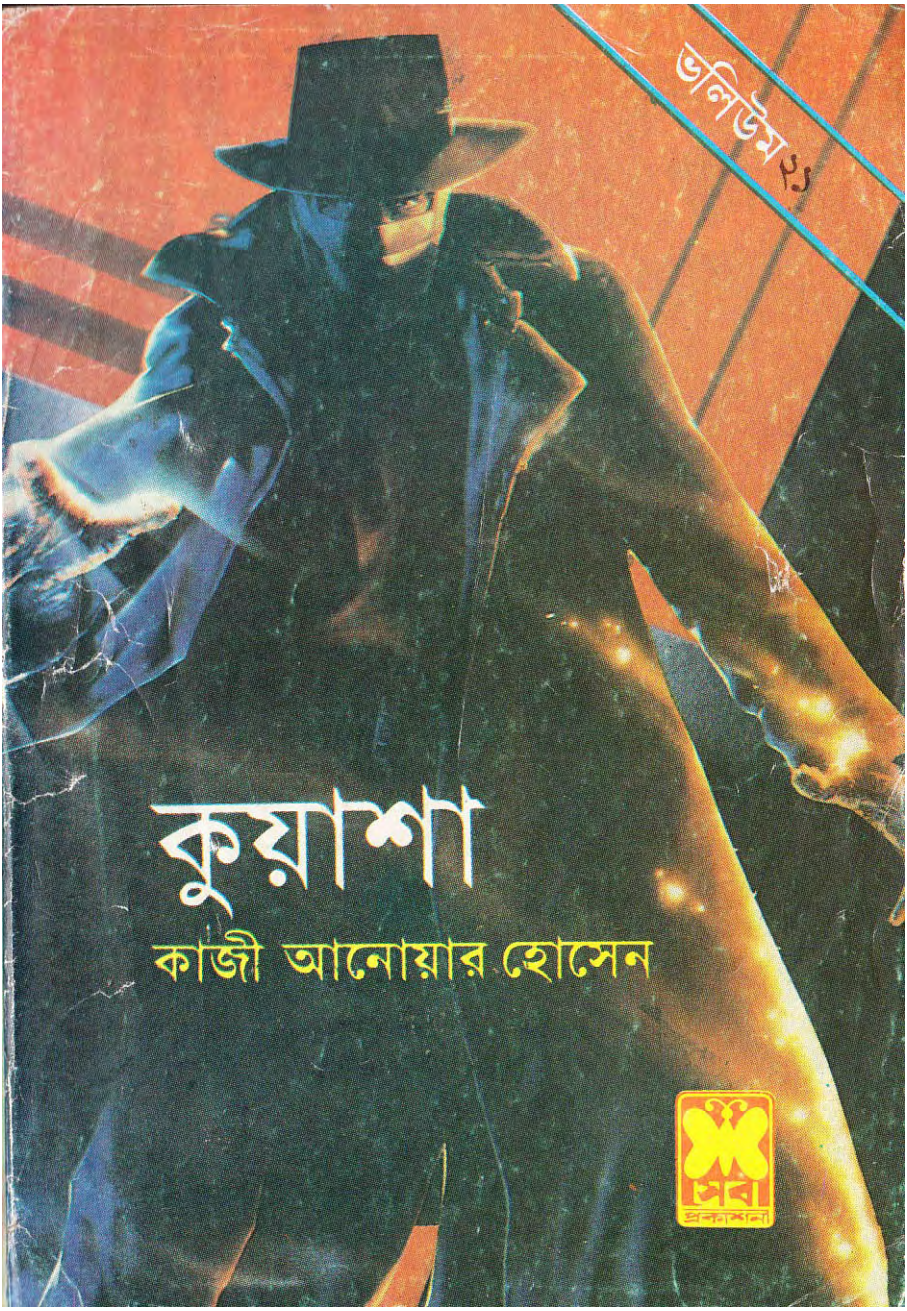
ভলিউম ২১
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ২১

কুয়াশা

৬১, ৬২, ৬৩

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1111-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 21
KUASHA SERIES: 61, 62, 63
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

আটাশ টাকা

কুয়াশা ৬১: ৫—৫৯
কুয়াশা ৬২: ৬০—১০৯
কুয়াশা ৬৩: ১১০—১৬০

কুয়াশা ৬১

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৭

এক

ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশন। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত একটি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান। এটা ব্যবসায়িক কোন প্রতিষ্ঠান নয়। এই প্রতিষ্ঠান তার ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে সাধারণত কোন ফী গ্রহণ করে না।

অফিসটাকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। নিয়োগ করা হয়েছে চারজন নতুন সহকারী। তাদের মধ্যে তিনজন তরুণ, একজন তরুণী। শহীদ খানের ডান হাত কামাল আহমেদ এদের চারজনের বস্।

পার্টেক্সের পার্টিশন দিয়ে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি চারটে রুম। একটি রিসেপশন, সেখানে বসে রিসেপশনিস্ট শিল্পী। বাকি তিনটিতে বসে জামান, আসাদ এবং রহমান। আসাদ এবং রহমানের রুম দুটো এখন খালি। জরুরী কাজে ওদের দু'জনকে কামাল ঢাকার বাইরে পাঠিয়েছে।

কামালের রুমটা সর্বদক্ষিণে। তার পাশে একটি চেম্বার। শহীদের।

সকাল সাড়ে ন'টা।

সবার আগে অফিসে এসেছে শিল্পী। কামাল বা জামান কেউ এখনও এসে পৌঁছায়নি। আসেনি শহীদও। ও আসবে কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। সময়ের এদিক ওদিক হয় না ওর।

ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোনের বেল বেজে উঠল। টাইপ করছিল শিল্পী খটাখট শব্দ তুলে। হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার। মুখ তুলে তাকাল।

ডান হাত লম্বা করে দিয়ে তুলে নিল শিল্পী রিসিভারটা। হাসি হাসি ভাব ফুটল মুখে। মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশন।'

মার্জিত কিন্তু মেঘের ডাকের মত গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. শহীদ খানকে চাই।'

'তিনি এখনও অফিসে আসেননি। আমি তাঁর সহকারী বলছি। আপনি কে বলছেন?'

'মোহাম্মদ তোয়াব খান। শদীদ খানকে দরকার আমার। কখন আসবেন তিনি?'

'দশটায়। আপত্তি না থাকলে আমাকে যা বলার বলুন, আমি···।'

শিল্পীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মোহাম্মদ তোয়াব খান বললেন, 'শহীদ খানকে বলবেন আমি ফোন করেছিলাম। সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমি আসব গুলশানের

বাড়িতে অপেক্ষা করব তাঁর জন্যে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে আলাপ করতে চাই, একমাত্র তাঁর সাথেই।'

'আপনার ঠিকানাটা…?'

'কোন ঠিকানার দরকার নেই। মোহাম্মদ তোয়াব খান—মি. শহীদের কাছে আমার নামই যথেষ্ট।'.

মোহাম্মদ তোয়াব খান বিরক্ত হয়েছেন, বোঝা গেল তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে।

শিল্পীকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি ফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

ধীরে ধীরে ক্রেডলে রিসিভারটা রেখে দিল শিল্পী। মুখটা ম্লান দেখাচ্ছে।

'কি ভাবছ?' কামাল রিসেপশনে ঢুকেই প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল শিল্পী, লক্ষ করল সে।

'না, কিছু ভাবছি না। কামাল ভাই, মোহাম্মদ তোয়াব খান কে বলুন তো? ভদ্রলোক ফোন করে শহীদ ভাইকে চাইছিলেন। বললেন, আমার নাম বললেই হবে, ঠিকানা দরকার নেই। সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে শহীদ ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করবেন তিনি।'

'মোহাম্মদ তোয়াব খান? তুমি ঠিক শুনেছ?' কামাল ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, বসল একটা চেয়ারে। সিগারেট বের করার জন্যে ট্রাউজারের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল, কিন্তু শিল্পীর উত্তর শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল, হাতটা পকেট থেকে বের করতেও যেন ভুলে গেছে সে।

'ঠিক শুনিনি মানে! ভদ্রলোকের প্রতিটি কথা মুখস্থ হয়ে গেছে।'

কামাল পকেট থেকে হাতটা বের করল ধীরে ধীরে। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ। বলল, 'মোহাম্মদ তোয়াব খান। মিলিওনিয়ার। একশো একটা ব্যবসার মালিক। শিল্পী, স্টীলের আলমারি খুলে একত্রিশ নম্বর নীল ফাইলটা বের করো তো।'

'একত্রিশ নম্বর নীল ফাইল!'

'হ্যাঁ। ওটা মোহাম্মদ তোয়াব খানের ফাইল। তুমি নিশ্চয়ই জানো, কিংবা জানা উচিত তোমার যে আমরা দেশের ধনী এবং প্রভাবশালী নাগরিকদের সম্পর্কে সম্ভাব্য সব ইনফরমেশন সংগ্রহ করে রাখি।'

'জানি, কামাল ভাই। কিন্তু এখনও সব ফাইল পড়ে দেখার সময় পাইনি…।'

'ঠিক আছে, ফাইলটা নিয়ে এসো। শহীদ আর পনেরো মিনিট পরই আসবে চেম্বারে। মোহাম্মদ তোয়াব খান ফোন করেছিলেন বললেই ভদ্রলোক সম্পর্কে সব কথা জানতে চাইবে ও।'

শিল্পী চেয়ার ছাড়ল, এগিয়ে গেল চাবির গোছা নিয়ে স্টীল আলমারির দিকে।

এমন সময় দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল তরুণ জামান। কামালকে দেখে দীর্ঘ, দ্রুত পদক্ষেপে পাশে এসে দাঁড়াল সে, ঝুঁকে পড়ল কামালের দিকে। কানে কানে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি বলুন তো, কামাল ভাই? একজন পুলিস ইন্সপেক্টরকে দেখলাম ওদিকের সাইড রোডে ঘুরঘুর করছে। সিভিল ড্রেসে,

আই মীন, ছদ্মবেশ নিয়ে…।'

'ও কিছু না। এসব মি. সিম্পসনের কাণ্ড। কুয়াশা তো শহীদ ও মহুয়াদির খবরাখবর নেবার জন্যে প্রায়ই আসে। তাই নজর রাখার জন্যে পাঠিয়েছেন একজন ইন্সপেক্টরকে।'

'কিন্তু এর আগে তো কখনও দেখিনি…।'

'দেখোনি, দেখার চেষ্টা করোনি বলে। শহীদের বাড়ির আশপাশেও একজন না একজন সব সময়ই ঘুরঘুর করে।'

'কামাল ভাই, কুয়াশাকে আজ পর্যন্ত একবারও দেখার সুযোগ পেলাম না। কিভাবে সাধটা পূরণ করা যায় বলুন তো?'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কামাল। হাসি থামিয়ে বলল, 'একবার নয় জামান, কুয়াশাকে তুমি কমপক্ষে পাঁচবার দেখেছ। মুশকিল কি জানো, কুয়াশাকে যতবারই দেখো, চিনতে পারবে না। প্রতিবারই নতুন ছদ্মবেশ নিয়ে বাইরে বের হয় সে।'

শিল্পী ফাইল নিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এল।

মোহাম্মদ তোয়াব খান। গাড়ি চালাতে চালাতে ভদ্রলোকের কথা ভাবছিল শহীদ। অসংখ্য লঞ্চ, বার্জ, কার্গো, স্টীমার এবং একটি সমুদ্রগামী জাহাজের মালিক ভদ্রলোক। পঞ্চাশের উপর বয়স, কিন্তু চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। বছর দুই আগে স্ত্রীকে হারিয়েছেন। মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন মিসেস তোয়াব। স্ত্রী মারা যাবার পর মোহাম্মদ তোয়াব খান নিজেকে সমাজ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ব্যবসা ছাড়া আর কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি তাঁকে। কিন্তু হঠাৎ করে, মাত্র কিছুদিন আগে, আবার বিয়ে করেছেন। মেয়েটির নাম রাফিয়া। নর্তকী ছিল। কিভাবে যেন পরিচয় হয়, তারপরই বিয়ে। রাফিয়া রূপের ফাঁদ পেতে মোহাম্মদ তোয়াব খানকে মজিয়েছে, এটা কামালের ব্যক্তিগত ধারণা। রাফিয়ার মত সাধারণ একটা নর্তকীকে বিয়ে করা মোহাম্মদ তোয়াব খানের পক্ষে একটু অস্বাভাবিক। ব্যাপারটা ঠিক মানানসই হয়নি, এটা শহীদেরও ধারণা। এ ধরনের বেমানান বিয়ে আরও অনেকে করেছে—এবং ফলাফল কারও ক্ষেত্রেই সুবিধের হয়নি শেষ পর্যন্ত। কামালের অনুমান, নববধূকে নিয়ে কোন সমস্যায় পড়েছেন মোহাম্মদ তোয়াব খান, তাই জরুরী ডাক পড়েছে শহীদের।

মোহাম্মদ তোয়াব খানের প্রথম পক্ষের একটি মেয়েও আছে। ছোট নয়, বিশ-একুশ বছরের সুন্দরী যুবতী মেয়ে। মিসেস তোয়াব দু'বছর আগে মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। সেই একই দুর্ঘটনায় আহত হয় ঋতু। ঋতু, যতদূর জানা যায়, প্রচণ্ড অভিমানী এবং রগচটা ধরনের মেয়ে। কারও সাথেই নাকি সে ভাল ভাবে কথা বলে না। বিষধর নাগিনীর মত সর্বদাই নাকি সে ফণা তুলে থাকে। তার আশপাশে কাউকে দেখলেই নাকি সে ছোবল মারতে উদ্যত হয়। মোটর দুর্ঘটনায় ঋতু পঙ্গু হয়ে গেছে। হাঁটতে-চলতে পারে না সে। শোনা যায়, পঙ্গু মেয়ের জন্য মোহাম্মদ

তোয়াব খানের মন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে।

'মুক্তা নিকেতন' দুই তলা। গেটের কাছ থেকে বিল্ডিংটা দেখা যায় না। খোলা গেট দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ভিতরে ঢুকল শহীদ। গার্ডরুমের ভিতর কেউ নেই। সামনে কংক্রিটের চওড়া টারমাক। ছোট প্লেন নামার জন্যে যথেষ্ট। দু'পাশে উঁচু উঁচু গাছ, সুন্দরভাবে মাথা ছাঁটা ঘাস-জাতীয় ঝোপের কোমর সমান উঁচু বেড়া। ফাঁক দিয়ে দেখা যায় প্রকাণ্ড মাঠ। কংক্রিটের রাস্তাটা শেষ হয়েছে প্রশস্ত গাড়ি বারান্দায়। চার-পাঁচটা ঝকঝকে দামী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা মার্সিডিজ, একটা টয়োটা ডিলাক্স, একটা মরিস, একটা ডাটসন এবং একটা ফোক্সওয়াগেন। দু'জন শোফার ফোক্সওয়াগেনের গায়ে হেলান দিয়ে নিচু গলায় গল্প করছে। শহীদের ক্রিমসন কালারের গাড়িটা পাশে থামতে শোফার দু'জন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। শহীদকে দেখে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কি যেন বলাবলি করতে লাগল তারা।

গাড়ি থেকে নেমে ডান দিকে এগোল শহীদ। আবার কংক্রিটের রাস্তা। দূরে দেখা যাচ্ছে বিল্ডিংয়ের উঁচু দেয়াল। গজ বিশেক এগিয়ে বাঁক নিল শহীদ। গেটটা দেখা যাচ্ছে আরও পঞ্চাশ গজ দূরে। রাস্তার দু'পাশে ফুল গাছ। গেটটা খোলা, ভিতরে দেখা যাচ্ছে বিরাট লন। তারপর মার্বেল পাথরের বারান্দা। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ শহীদের মনে হলো, কেউ যেন লক্ষ করছে ওকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও বাঁ দিকে। চারদিকের ফুল গাছের মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। ফুল গাছগুলোয় লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি হরেক জাতের ফুল ফুটে রয়েছে। মাঝখানে একটা হুইল চেয়ারে ফুলের মতই সুন্দরী একটি মেয়ে বসে রয়েছে। উজ্জ্বল নীল রঙের নাইলনের ম্যাক্সি মেয়েটার পরনে। কোলের উপর একটা বই—খোলা। মাথা নিচু করে বইটার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

মুখ তুলে মেয়েটি দেখল শহীদকে, ভুরু কুঁচকে কথা বলে উঠল। শান্ত, চিকণ, কিন্তু চাবুকের মত মনে দাগ কেটে বসে—এমন কণ্ঠস্বর।

'আপনি ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশন থেকে আসছেন?'

শহীদ মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

ঋতু মুখ তুলে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে কি যেন আছে, শহীদের মনে হলো ওর পকেটের কাগজপত্রে কি লেখা আছে, কত টাকা, কত খুচরো পয়সা আছে সব যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বুঝি একেই বলে।

ঋতু দেখতে খুবই সুন্দরী। ধারাল তলোয়ারের মত। মুখটা একটু লম্বা। একহারা শরীর। সরু, লালচে ঠোঁট দুটো এক দিকে একটু বাঁকা, পরস্পরের সাথে চেপে বসে আছে।

'সামনের গেট দিয়ে আসা উচিত হয়নি আপনার। ব্যবসায়িক কারণে যাঁরা আসেন তাঁদের জন্য লেফট এবং ব্যাক ডোর···।'

শহীদ হঠাৎ অনুভব করল, সময় নষ্ট করছে ও শুধু শুধু। পা বাড়াল অদূরবর্তী গেটের দিকে।

'কোথায় যাচ্ছেন? বললাম না যে···।'

শহীদের পিঠে যেন চাবুকের মত পড়ল কথাগুলো। দাঁড়াল ও। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বলেছ। কিন্তু তাতে কি? কোন্ দরজা দিয়ে ঢুকব সেটা আমিই বুঝব। আমি যেখানেই ঢুকি, নিজের ইচ্ছেমত ঢুকি।'

কথাগুলো বলে জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে পা বাড়াল শহীদ। গেটের কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার, দেখল ঋতু মাথা নিচু করে বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ রেখেছে।

শহীদ মার্বেল পাথরের বারান্দায় উঠতেই কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হলো আধাবয়েসী কিন্তু হাতির মত স্থূল, উর্দি পরা একজন বাটলার। নিজের নামটা শুধু উচ্চারণ করল শহীদ, বাটলার রোবটের মত যান্ত্রিক ভঙ্গিতে জানাল, 'মালিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, স্যার। আসুন আমার সাথে।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল ওরা। সিঁড়ি এবং উপরের করিডর লাল কার্পেটে মোড়া। বাটলারের পিছু পিছু হলরুমে ঢুকল শহীদ। একটা দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল বাটলার। শহীদ ভিতরে প্রবেশ করল।

গোলাকার একটা রুম। চারদিকের দেয়াল জুড়ে কাঁচের শো-কেস। প্রতিটি শো-কেসেই বই। মাঝখানে একটা বড় ডেস্ক। কয়েকটা ডিভান, সোফা এবং চেয়ার দেখল শহীদ। এটা মোহাম্মদ তোয়াব খানের লাইব্রেরী। কিন্তু লাইব্রেরীতে তিনি এখনও উপস্থিত হননি।

ডেস্কের দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসল শহীদ। পকেট থেকে টোবাকোর কৌটা এবং পাইপ বের করল। পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল ও। দশটা বাজতে চল্লিশ সেকেণ্ড বাকি।

পাইপে অগ্নিসংযোগ করে এদিক ওদিক তাকাল ও। সেগুন কাঠের পালিশ করা চারদিকের দেয়ালে চারটে বড় বড় দরজা। সবগুলোই বন্ধ। জানালাগুলোয় ভারি পর্দা ঝুলছে।

নিঃশব্দে খুলে গেল শহীদের মুখোমুখি একটা দরজা। মুহূর্তের জন্যও না থেমে দৃঢ় পায়ে ডেস্কের দিকে এগিয়ে এলেন মোহাম্মদ তোয়াব খান। দাঁড়ালেন ডেস্কের কাছে।

চওড়া, কাঁচাপাকা ভুরু ভদ্রলোকের। নাকটা মুখের আকারের সাথে মানানসই, পিরামিডের মত। ঠোঁটে লটকানো চুরুট থেকে ভুর ভুর করে তীব্র সুগন্ধ বেরুচ্ছে। পরনে হালকা বাদামী রঙের স্যুট। মুখের চেহারায় কাঠিন্যই বেশি। শহীদের মনে হলো, বড়সড় কোন সমস্যায় ভুগছেন ভদ্রলোক। নার্ভাস ফিল করছেন, যদিও তা প্রকাশ করতে চাইছেন না।

'ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশন? মি. শহীদ খান?' প্রশ্ন করলেন মোহাম্মদ তোয়াব খান। বাঘের মত থাবা বাড়িয়ে দিলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করল শহীদ। বলল, 'হ্যাঁ।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ!' সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শহীদের হাতটা ছেড়ে দিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন মোহাম্মদ তোয়াব খান। সিধে একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে বের করলেন একটা রুমাল। কপালের ঘাম মুছলেন ধীরে

ধীরে। জানালার পর্দার দিকে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর কথা বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'আপনার সুনাম সম্পর্কে আমি সব জানি, মি. খান। কিন্তু···।'

ভদ্রলোক কথা শেষ না করে ঘুরে দাঁড়ালেন, ফিরে এলেন ডেস্কের সামনে, রিভলভিং চেয়ারে বসে শহীদের দিকে তাকালেন, বললেন, 'তার আগে বলুন, ড্রিঙ্ক কোন্‌টা পছন্দ আপনার? হুইস্কি অর···!'

শহীদ বলল, 'মাফ করবেন, আমি অ্যালকোহলে অভ্যস্ত নই।'

একটু যেন অবাক হলেন মোহাম্মদ তোয়াব খান। ডেস্কের উপর দুই হাত রেখে কিছু ভাবলেন বলে মনে হলো। এয়ারকুলার চালু থাকা সত্ত্বেও তাঁর কপালে আবার বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে, দেখতে পেল শহীদ।

হঠাৎ, যেন মন স্থির করে সিধে করলেন দেহটা। সরাসরি তাকালেন শহীদের দিকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ওকে।

শহীদ বলে উঠল, 'দ্বিধা করার কিছু নেই, মি. খান। বলে ফেলুন আপনার সমস্যার কথা—হালকা হয়ে যাবে মনটা। হয়তো সাহায্য করতেও পারি আমি।'

মৃদু হাসলেন মোহাম্মদ তোয়াব খান। রুমাল বের করে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলতে শুরু করলেন, বললেন, 'ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য···ইয়েস আই নীড ইট ভেরি ব্যাডলি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি। আবার বললেন, 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। তারপর সব কথা বলব। আসুন।'

উঠল শহীদ। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে দরজা খুলে ফেলেছেন। পিছন পিছন পাশের রুমে ঢুকল শহীদ।

বেডরুমটা বেশ বড়। ড্রেসিং টেবিলের উপর কসমেটিকসের সাজ-সরঞ্জাম দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না কোন ভদ্রমহিলার বেডরুম এটা। চারদিকের দেয়ালে রঙিন নাইলনের পর্দা ঝুলছে। পর্দা সরিয়ে একটা দেয়াল-আলমারির তালা খুলে ভিতর থেকে মাঝারি আকারের একটা লেদার সুটকেস বের করে কার্পেটের উপর নামিয়ে তাকালেন শহীদের দিকে। কিছু যেন বলতে গেলেন, কিন্তু বললেন না। ঝুঁকে পড়ে খুললেন সুটকেসের ডালা। কিন্তু সুটকেসের ভিতর না তাকিয়ে সিধে হয়ে ঘুরে পা বাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার সামনে। পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন।'

সুটকেসটার দিকেই তাকিয়ে ছিল শহীদ। নানা রকম জিনিস-পত্রে সেটা প্রায় ভর্তি হয়ে আছে। এত রকম জিনিস সাধারণত একসাথে দেখা যায় না। প্রথম দর্শনে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কোন বাচ্চা মেয়ের কাণ্ড হবে। টুথপেস্ট, চিরুনি, কয়েকটা সিগারেটের প্যাকেট, কাঁচের চুড়ি, ছয়টা সিগারেট লাইটার, নামকরা কয়েকটা রেস্তোরাঁর চিহ্নবিশিষ্ট কাঁটা চামচ, সিল্কের মোজা তিন জোড়া, দুটো কাঁচি, পকেট ছুরি একটা, দশ-বারোটা ফাউন্টেন পেন, একটা পাথর বসানো সোনার আঙটি, স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল দু'পাটি, দুটো শ্বেত-পাথরের অ্যাশট্রে, একটা পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি—এই রকম আরও অনেক ছোটখাট জিনিস। লক্ষণীয় এই যে, স্যাণ্ডেল দুই

রঙের এবং দুই সাইজের।

তোয়াব খান দরজার দিকে পা বাড়ালেন। বললেন, 'চলুন, লাইব্রেরীতে গিয়ে বসি।'

ফিরে এল ওরা লাইব্রেরীতে। বসল আবার মুখোমুখি।

তোয়াব খান নতুন চুরুট তুললেন ঠোঁটে। লাইটার মুখের সামনে ধরলেন, কিন্তু জ্বাললেন না। হাতটা তাঁর কাঁপছে, লক্ষ্য করল শহীদ। বললেন, 'কিছু বুঝলেন?'

শহীদ বলল, 'স্যাণ্ডেল এবং চামচগুলো দেখে যতটুকু বুঝতে পারছি—একজন ক্লেপটোম্যানিয়াকের সংগ্রহ।'

প্রশংসার দৃষ্টি ফুটল মোহাম্মদ তোয়াব খানের চোখে, শহীদের বুকের দিকে মোটা আঙুল তুলে বললেন, 'রাইট!'

চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামালেন তিনি। ডেস্কে হাতের ভর দিয়ে শহীদের দিকে ঝুঁকলেন একটু, তিক্ত গলায় বললেন, 'মি. শহীদ, আপনার সম্পর্কে সব কথা জানি আমি। তবু, একটা কথা আপনার মুখ থেকে জেনে নিতে চাই। আমি আপনাকে ডেকেছি সাহায্য পাবার আশাতেই। সমস্যাটা কুৎসিত, এবং ব্যক্তিগত। আমি চাই না আপনি ছাড়া কথাটা আর কেউ জানুক। আমি জানি, পুলিসের বড় কর্তাদের সাথে আপনার দহরম-মহরম আছে। বন্ধুত্ব তাদের অনেকের সাথে আমারও রয়েছে। কিন্তু আমি চাই না তারা এ সম্পর্কে কিছু জানুক। আপনি কি আমাকে কথা দিতে পারেন, আমি যা বলব তা আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না?'

শহীদ বলল, 'আপনি কি বলবেন তার উপর নির্ভর করে ব্যাপারটা, মি. তোয়াব। ক্রাইম অনেক রকমের আছে, তাই না? ছোটখাট ব্যাপার হলে আলাদা কথা। কিন্তু আপনি যদি বলেন একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, হত্যাকারীর পরিচয় আপনি জানেন, আমাকে তার পরিচয় জানাবেন কিন্তু আমি তাকে গ্রেফতার করার জন্যে পুলিসকে সাহায্য করতে বা তার খবর পুলিসকে জানাতে পারব না···।'

'না না! তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। সমস্যাটাকে কুৎসিত বলেছি আমি ব্যক্তিগত কারণে। এটা এমন কি ক্রাইমও নয়।'

শহীদ বলল, 'ক্লেপটোম্যানিয়া ক্রাইম নয়। এটা একটা অসুখ। আপনার সমস্যা যদি এই ক্লেপটোম্যানিয়া সংক্রান্ত হয় তাহলে কথা দিতে পারি, পুলিসকে এ সম্পর্কে কিছু জানাব না। তবে, আপনাকে সাহায্য করতে যদি আমি রাজি হই তাহলে আমার সহকারীদের সব কথা জানাতে হবে।'

'তারা নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত, আমি ধরে নিতে পারি?'

শহীদ বলল, 'অবশ্যই।'

তোয়াব খান এতক্ষণে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন। বললেন, 'আপনি তাহলে আমাকে সাহায্য করছেন···।'

শহীদ পাইপ কামড়ে ধরে বলল, 'আগে আমাকে সব কথা শুনতে হবে।'

শহীদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক। কি যেন বলতে গিয়েও বললেন না। বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে ডান দিকের জুলফির নিচেটা চুলকালেন,

বললেন, 'আই সি। ঠিক আছে। আগে বরং সব কথা শুনুন। আমার স্ত্রী এবং আমি, বিয়ের পর নিমন্ত্রিত হয়ে অসংখ্য পার্টিতে গিয়েছি। সুটকেসের জিনিস-পত্রের অধিকাংশই আমাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশরাফুজ্জামান চৌধুরীর ড্রয়িং রুমে ছিল নারী মূর্তিটা। পার্কার কলমটা আমার বন্ধু মি. করিম আখন্দের ছেলে ইগুলুর। আঙটিটা মিসেস সোলায়মানের আঙুলে দেখেছি আমি। যে-সব রেস্তোরাঁয় নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা, চামচগুলো সেই সব রেস্তোরাঁর।'

থামলেন মোহাম্মদ তোয়াব খান। শহীদ চুপ করেই রইল। ভদ্রলোক বক্তব্য গুছিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর অন্যমনস্কতা দেখে বোঝা গেল। একটু পর আবার বলতে শুরু করলেন তিনি। চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত চুরুটের দিকে নিবদ্ধ।

'ব্যাপারটা খুবই নাজুক। সুটকেসটা আবিষ্কার করার পর থেকে সব কিছু তিক্ত লাগছে। মুশকিল হলো, আসলে আমার স্ত্রী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না আমি।'

শেষ কথাটা একেবারে নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে যেন জনান্তিকে উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক। শহীদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, শুরু করলেন আবার, 'চট্টগ্রামের একটা নাইটক্লাবে ওকে মাস পাঁচেক আগে দেখি আমি। আমিই আলাপ করি। নাইটক্লাবের ড্যান্সার ছিল ও। ওর নাচ আমাকে মুগ্ধ করে। পরিচয় হবার তিন সপ্তাহ পর আমরা বিয়ে করি। আমাদের বিয়ে হয়েছে চার মাস হলো। বিয়ে উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠান হয়নি—বলতে পারেন বিয়েটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। খবরটা কিছু দিন হলো প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।'

'বিয়েটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন—কেন?'

'ঋতুর কথা ভেবে। ঋতু আমার মেয়ে। ওর মা ওকে, ও ওর মাকে বড় বেশি ভালবাসত। ওর মা মারা যাবার পর ঋতু সম্পূর্ণ বদলে গেছে। গত ছ'বছর আগে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, কিন্তু এখনও ও আমাকে প্রশ্ন করে—আম্মি একা মারা গেল কেন বুঝলাম না! মি. শহীদ, ঋতু ঠিক সুস্থ হতে পারছে না—সম্ভবত পারবেও না। ওর এই মানসিক অসুস্থতার কথা ভেবেই আমরা—আমি এবং রাফিয়া সিদ্ধান্ত নিই কোন রকম আড়ম্বর ছাড়াই বিয়েটা সারা হবে।'

শহীদ জানতে চাইল, 'ওদের দু'জনের সম্পর্ক কেমন?'

'ভাল নয়। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়। আমি শুধু জানতে চাই আমার স্ত্রী ক্লেপটোম্যানিয়ায় ভুগছে কিনা। পরের জিনিস চুরি করা কুৎসিত একটা অসুখ, তাই না? ও যদি ধরা পড়ে—এবং একদিন না একদিন ধরা পড়বেই···মাইগড!'

শহীদ জানতে চাইল, 'আপনার স্ত্রীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেননি?'

একটু অবাক হলেন যেন মোহাম্মদ তোয়াব খান। স্ত্রীকে প্রশ্ন করার কথাটা যেন তিনি আগে ভাবেননি। বললেন, 'না, কথাটা তুলিনি। তুলতে চাইও না। শি ইজ নট এ পারটিকুলারলি ইজি পারসন টু হ্যাণ্ডেল। ওর সাথে ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয় আমাকে, মি. শহীদ।'

তাই স্বাভাবিক, ভাবল শহীদ। নর্তকী ছিল—দুনিয়ার কিছু দেখতে বুঝতে বাকি না থাকারই কথা। তার উপর রূপ আছে অসাধারণ, বয়সও কম—অথচ দ্বিগুণেরও

বেশি বয়স স্বামীর। স্বামীর সাথে বেপরোয়া ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত সম্ভবত।

শহীদ বলল, 'এমনও তো হতে পারে, মিসেস রাফিয়ার বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র? কেউ হয়তো তার দেয়াল-আলমারি খুলে সুটকেসে জিনিসগুলো রেখে দিয়েছে, বিপদে ফেলার জন্যে?'

তোয়াব খান তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শহীদের দিকে। তারপর, চাপা কণ্ঠে প্রায় আঁৎকে উঠলেন তিনি, 'হোয়াট ডু ইউ মীন? কার প্রতি ইঙ্গিত করছেন আপনি?'

শহীদ শান্তভাবে বলল, 'আপনি স্বীকার করেছেন আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার মেয়ের সম্পর্ক ভাল নয়।'

'ঋতুকে আপনি এসব ব্যাপারে জড়াবেন না!' ভদ্রলোক রাগ সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পারলেন না, কণ্ঠস্বরে উত্তাপ রয়েছে টের পাওয়া গেল।

শহীদ আপনমনে হাসল। বলল, 'দুঃখিত। আপনাকে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা তা জানতে হলে সব দিক বিচার করে সমস্যাটার আসল চেহারা বের করতে হবে আমাকে। তাই, অপ্রিয় হলেও আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে।'

তোয়াব খান গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বললেন, 'আই সি। ঠিক আছে, বলুন কি কি জানতে চান।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'সুটকেসটা আপনি কি হঠাৎ আবিষ্কার করেন? না, আগেই সন্দেহ করে খুঁজতে খুঁজতে ওটা পেয়ে যান?'

'আমার ধারণা রাফিয়াকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে। ওর ব্যাগ-ব্যাগেজ খুলে আমার সন্দেহের স্বপক্ষে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখার চেষ্টা করি আমি। এই দেখার সময়ই সুটকেসটা আবিষ্কার করি।'

'আপনার স্ত্রীকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে—এই সন্দেহের কারণ কি?'

নিভে যাওয়া চুরুটটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রেখে নতুন একটা চুরুট ঠোঁটে তুললেন ভদ্রলোক, লাইটারটা ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে সেটা মুঠোয় ধরে রাখলেন শক্তভাবে। কথা শুরু করলেন চুরুট না ধরিয়েই। প্রতিটি শব্দ যেন আটকে যাচ্ছে, যেন গলায় কাঁটা বিঁধেছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তার, 'ওর ব্যক্তিগত খরচের জন্য মাসিক ভিত্তিতে টাকা দিই ওকে আমি। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই দিই। বেশি টাকা নাড়াচাড়া করতে অভ্যস্ত নয় ও। তাই সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ব্যাঙ্কের সাথে বিশেষ ব্যবস্থা করে ডুপ্লিকেট একটা পাস বই নিজের কাছে রেখেছি আমি। মনে মনে ঠিক করেছি অন্তত বছর খানেক ওর খরচের দিকে নজর রাখব। অস্বাভাবিক বড় অঙ্কের টাকা অজ্ঞাত কারণে খরচ করলে, সন্ধান নিয়ে খরচের কারণটা জানতে পারব—তাই···গত মাসে অস্বাভাবিক অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছে ও। তেমন কিছু কেনেনি, কিনলে আমাকে দেখাত। টাকাটা কিভাবে খরচ করেছে জানার চেষ্টাও করিনি আমি। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি নীচ হতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই টাকাটা কিসে খরচ হয়েছে।'

'মোট কত টাকা তুলেছেন মিসেস রাফিয়া গত মাসে?'

'তিনটে চেকে মোট আড়াই লাখ টাকা। দু'বার পঞ্চাশ হাজার, একবার দেড় লাখ।'

'নির্দিষ্ট কারও নামে?'

'না। বিয়ারার চেকে টাকাগুলো তোলা হয়েছে।'

শহীদ বলল, 'আপনার ধারণা কেউ মিসেস রাফিয়ার চুরি করার কথা জানতে পেরে তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে?'

'সেই রকম সন্দেহ হওয়াই কি স্বাভাবিক নয়? যাই হোক, মি. শহীদ, আমি চাই আপনি আমার স্ত্রীর প্রতি নজর রাখার ব্যবস্থা করুন আমি স্ক্যাণ্ডাল চাই না। যদি প্রমাণ হয় যে ও ক্লেপটোম্যানিয়ায় ভুগছে তাহলে অসুখটা সারাবার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু কোন ক্রমেই যেন ও আর কারও হাতে ধরা পড়ে অপদস্থ বা অ্যারেস্ট না হয়, এদিকটা অবশ্যই দেখতে হবে আপনাকে। আমি চাই রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হোক ওর উপর। মি. শহীদ, আমি কাজের মানুষ। সন্দেহে ভোগার মত সময়ও আমার নেই। আমি আপনার কাছ থেকে পরিষ্কার রিপোর্ট চাই—ইয়েস অর নো! আর, হ্যাঁ, ও যেন বুঝতে না পারে…!'

শহীদ ম্লান হেসে বলল, 'দুঃখিত, মি. তোয়াব। আপনার কেসের দায়িত্ব আপনি অন্য কাউকে দিন--আমি আগ্রহ বোধ করছি না।'

উঠে দাঁড়াল শহীদ।

তোয়াব খান বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে গেছেন। শহীদকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'মি. শহীদ…আপনি…আপনাকে আমি অনেক আশা করে ডেকেছিলাম…আপনার সম্পর্কে সব জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একমাত্র আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে সমস্যাটার সমাধান বের করার দায়িত্ব দিতে পারি।'

শহীদ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার সমস্যা খুবই সাধারণ সমস্যা, মি. তোয়াব। যে কোন একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ আপনার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।'

'আমি সব প্রাইভেট ডিটেকটিভ সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি। কাউকে আমার নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়নি। মি. শহীদ আপনার ফী কত তা আমি জানি না। কিন্তু আমাকে সাহায্য করার জন্যে আপনি যে-কোন অঙ্কের টাকা দাবি করতে পারেন, আমি সানন্দে আপনার সে দাবি পূরণ করব। আপনি চাইলে আমি চেক সই করে দিতে পারি, টাকার অঙ্কটা আপনি বসিয়ে নেবেন…।'

শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'দুঃখিত, মি. তোয়াব। টাকা আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট আছে।'

তোয়াবকে বিচলিত দেখাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। রীতিমত বিনয় প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠে, 'আপনি আমাকে এক মিনিট সময় দিন, মি. শহীদ। প্লীজ! আমি আসছি।'

শহীদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে অর্থাৎ শ্রাগ করে আবার বসল চেয়ারে। কিন্তু কোন কথা বলল না।

তোয়াব খান দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন লাইব্রেরী থেকে। নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তাঁর পিছনে দরজাটা।

মিনিটখানেক নয়, প্রায় সাত মিনিট পর ফিরে এলেন তিনি রুমালে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে। চেয়ারে বসতেই ডেস্কের টেলিফোনের বেল বেজে উঠল—ক্রিং···ক্রিং···।

শহীদের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার ফোন।'

'আমার?'

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিল শহীদ। বলল, 'শহীদ খান স্পীকিং।'

অপর প্রান্তের বক্তার বক্তব্য নিঃশব্দে শুনল শহীদ। ওর মুখের চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। মিনিট দেড়েক পর ফোনটা নিঃশব্দেই নামিয়ে রাখল ও ক্রেডলে। মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'আপনিই জিতলেন, মি. তোয়াব।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়িত্ব চাপাতে হলো বলে দুঃখিত, মি. শহীদ। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আর কোন উপায় ছিল না। সমস্যাটার সাথে আমার সুনাম ও মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত···'

শহীদ বাধা দিয়ে বলল, 'আমার সহকারিণী মিস শিল্পীকে দায়িত্বটা দেব আমি। আজ বিকেল থেকেই কাজে নামবে সে। তার আগে আপনার সাথে শিল্পীর সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। কোথায় দেখা করবে সে আপনার সাথে?'

'এখানে নয়, অবশ্যই। ঢাকা ক্লাবে, সুইমিংপুলের কাছে থাকব। চারটের সময়।'

শহীদ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে। আচ্ছা—আপনার মেয়ে জানে আমাকে আপনি সমস্যাটার ব্যাপারে দায়িত্ব দেবার জন্যে ডেকেছেন, তাই না?'

'বলেন কি! না-না, ঋতু বা রাফিয়ার জানার প্রশ্নই ওঠে না···।'

শহীদ জানতে চাইল, 'আপনার এই ফোনের এক্সটেনশন আছে অন্য কোন রুমে?'

'আছে। কেন বলুন তো?'

শহীদ বলল, 'আপনি আমার অফিসে যখন ফোন করেছিলেন, কেউ এক্সটেনশন থেকে আপনার সব কথা শুনেছে। আমি আপনার মেয়ের কথা বলছি। ও জানে সব।'

দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল তোয়াব খানের কপালে। বললেন, 'ঠিক আছে। এরপর থেকে আমি সাবধান হব। গুডমর্নিং, মি. শহীদ।'

'গুডমর্নিং।'

দরজা ঠেলে বাইরের হলরুমে পা রাখতেই বাটলার এগিয়ে এল, যান্ত্রিক ভঙ্গিতে একটু নত হয়ে ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বরে বলল, 'আসুন, স্যার। মিস ঋতুর হুকুমে আপনার গাড়ি বাড়ির পিছনের গেটে রেখে এসেছি। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে···।'

শহীদ কিছু বলতে গিয়েও বলল না। অনুসরণ করল সে বাটলারকে। নিচে নেমে শহীদ বলল, 'তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি পিছনের গেটটা খুঁজে

নেব।'

দাঁড়িয়ে পড়ে বাটলার সবিনয়ে বলল, 'জো হুকুম, স্যার। এই বাগানের মাঝখান দিয়ে সোজা গেলে সুইমিং পুল পাবেন, ডানদিকে বাঁক নিয়ে সোজা গেলেই দেখতে পাবেন গেটটা···।'

শহীদ এগোতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

খানিকদূর এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শহীদ, বাটলার তার জায়গায় যন্ত্রের মত নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে সরে গেল সে করিডরের আড়ালে।

সুইমিংপুলটা আরও খানিক পর চোখে পড়ল শহীদের। কাছাকাছি যাবার আগেই লোহার সিঁড়ি বেয়ে পাকা চত্বরে উঠে এল পুল থেকে একটি যুবতী। বিকিনি পরা চব্বিশ-পঁচিশ বছরের উদ্ভিন্নযৌবনা। দেখেই শহীদ অনুমান করল, সম্ভবত মিসেস রাফিয়া। চোখাচোখি হতে একটু যেন হাসল মিসেস রাফিয়া। কিন্তু হাসিটা ঠিক ধরতে পারল না শহীদ।

মিসেস রাফিয়ার প্রায় সম্পূর্ণ দেহই উন্মুক্ত। কিন্তু শহীদের সামনে পড়ে যাওয়ায় তাকে এতটুকু অপ্রতিভ হতে দেখা গেল না। ছোট ছোট পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সে। শহীদ এক পাশ দিয়ে হাঁটছিল, হাঁটতেই লাগল। মিসেস রাফিয়া গুনগুন করে গান গাইছে, আরও কাছাকাছি হয়ে শুনতে পেল শহীদ। কিন্তু তাকিয়ে আছে পাশের ফুল গাছগুলোর দিকে।

পাশ দিয়ে চলে গেল মিসেস রাফিয়া, শহীদ তার দিকে তাকাল না। কিন্তু খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। দেখল, মিসেস রাফিয়াও তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হলো আবার। এবার হাসিটা চিনতে ভুল হলো না শহীদের।

সামনে বাঁক। দ্বিতীয়বার পিছন দিকে না তাকিয়েই ঘুরল শহীদ, গেটের দিকে এগিয়ে চলল। ওর গাড়িটা খোলা গেটের বাইরে দেখা যাচ্ছে।

শহীদের চেম্বার। ডাক পড়ল ওদের। কামাল, জামান এবং শিল্পী, একে একে প্রবেশ করল চেম্বারের ভিতর।

শহীদ বলল, 'তোর অনুমানই ঠিক রে, কামাল। তোয়াব খান তাঁর স্ত্রীকে নিয়েই সমস্যায় পড়েছেন।'

সব কথা বলল ওদেরকে শহীদ।

কামাল কাজ ভাগ করে দেবার জন্যে বলল, 'শিল্পী, তুমি সাড়ে চারটের সময় ঢাকা ক্লাবে যাচ্ছ মি. তোয়াব খানের সাথে দেখা করতে। বলার তাঁর নতুন কিছুই নেই—হয়তো স্ত্রীর অভ্যাস অনভ্যাস সম্পর্কে কিছু তথ্য দেবেন তোয়াব খান। মিসেস রাফিয়ার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব তোমার, তার সম্পর্কে যতটা পারো জেনে নিয়ো। একটা কথা, আমার সন্দেহ, ঋতু এর সাথে জড়িত। তার ব্যাপারেও নজর রেখো। আর মিসেস রাফিয়া যদি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তাকে ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার।'

জামান জানতে চাইল, 'আমার কি কাজ?'

'ব্ল্যাকমেইলিংয়ের ব্যাপারটা সত্যি কিনা চেক করব আমরা, আমি আর তুমি। কিন্তু শিল্পীর রিপোর্টের উপর সব কিছু নির্ভর করছে। মিসেস রাফিয়াকে নজরে রাখতে পারলে ব্ল্যাকমেইলিং সম্পর্কে কোন না কোন তথ্য পাওয়া যাবেই। তথ্য পাওয়া গেলে আমরা কাজে নামব।'

কামাল তাকাল এবার শহীদের দিকে, বলল, 'শহীদ, কুয়াশা স্বয়ং এই কেসের সাথে জড়িত নয় তো রে?'

কথা না বলে ঠোঁটে আঙুল রেখে হঠাৎ কামালকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল শহীদ।

সতর্ক সাবধান হয়ে গেল ওরা সবাই। একমুহূর্ত পরই শহীদের রহস্যময় আচরণের কারণ জানা গেল।

ভেজানো দরজা ঠেলে চেম্বারের ভিতর প্রবেশ করলেন সি. আই. ডি.-র জাঁদরেল অফিসার মি. সিম্পসন। দ্রুত সবাইকে একবার দেখে নিয়ে সহাস্যে, সকৌতুকে বললেন তিনি, 'গুডমর্নিং, বয়েজ! সবাই চুপ করে গেলে কেন? তোমাদের মধ্যে কেউ ছদ্মবেশধারী কুয়াশা নেই তো?'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কামাল, জামান এবং শিল্পী। শহীদ মুচকি হাসল। বলল, 'আমাদের মধ্যে হুবহু আপনার চেহারার কেউ আছে কিনা দেখুন। কুয়াশা তো সাধারণত আপনার চেহারাটাকেই ছদ্মবেশ হিসেবে গ্রহণ করে।'

মি. সিম্পসন এগিয়ে এসে একটা খালি চেয়ারে বসতে উদ্যত হলেন, শহীদের দিকে চোখ পড়াতে তিনি দেখলেন শহীদ চেয়ে আছে তাঁর দিকে নয়, তাঁর পিছন দিকে। শহীদের চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময় ফুটে উঠেছে লক্ষ করলেন তিনি।

বসতে গিয়েও বসলেন না মি. সিম্পসন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন পিছন ফিরে। ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন তিনি। চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক। হুবহু তাঁর মত চেহারা!

স্তম্ভিত মি. সিম্পসনের মুখ থেকে একটি শব্দও বের হলো না। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই দ্বিতীয় মি. সিম্পসন দোরগোড়া থেকে বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আজ তোমাকে একেবারে হাতের মুঠোয় পেয়েছি আমি, কুয়াশা! সাবধান, কোন রকম চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না—গুলি করে উড়িয়ে দেব তোমার মাথার খুলি! আমার ছদ্মবেশ নিয়ে তুমি সবাইকে ফাঁকি দিচ্ছ—কিন্তু আজ তোমার রক্ষা নেই।'

প্রথম মি. সিম্পসন স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। শহীদ, কামাল, জামান ও শিল্পী, যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। ঘটনাটা ওদের চোখের সামনে ঘটছে, কেউই তা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। দু'জনের চেহারা হুবহু এক। বাদামী রঙের ট্রপিক্যাল কাপড়ের কমপ্লিট স্যুট পরনে দু'জনেরই। মাথায় হ্যাট। হিটলারের মত গোঁফ। ডোরাকাটা টাই। হাতে ছড়ি। দু'জনের চেহারা, উচ্চতা, গায়ের রঙ, পোশাক, দাঁড়াবার ভঙ্গি—কোন অমিল নেই কোথাও।

মিলছে না শুধু এক জায়গায়। প্রথম মি. সিম্পসনের হাতে রিভলভার নেই, দ্বিতীয় জনের হাতে কালো, চকচকে একটা রিভলভার দেখা যাচ্ছে।

কোনজন যে প্রকৃত মি. সিম্পসন তা বোঝার কোন উপায় নেই। এমনকি শহীদও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু'জনকে পরীক্ষা করে মনে মনে হাল ছেড়ে দিল।

'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, কুয়াশা।' দ্বিতীয় মি. সিম্পসন দাঁতে দাঁত চেপে আদেশ করলেন। বিনাবাক্যব্যয়ে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়ালেন প্রথম মি. সিম্পসন। কিন্তু তাঁর দেহটা কেঁপে উঠল অদম্য ক্রোধে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি, 'আবার আমার ছদ্মবেশ নিয়েছ তুমি? কুয়াশা, এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসন হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে শহীদের দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, 'শুনলে, শহীদ? শয়তান লোকটার কথা শুনলে? আমার ছদ্মবেশ নিয়ে আমাকেই বলছে কুয়াশা।'

শহীদ বলল, 'আপনারা কে যে আসল আর কে যে নকল···।'

প্রথম মি. সিম্পসন বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়লেন, 'আমি! আমিই আসল। তোমরা ওর চালাকিটা ধরতে পারছ না···।'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসনের রিভলভার ধরা হাতটা এতটুকু নড়ল না, বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে হুইসেল বের করে ফুঁ দিলেন তিনি। প্রায় সাথে সাথে দরজা খুলে হুড়মুড় করে চেম্বারের ভিতর প্রবেশ করল চারজন কনস্টেবল, এবং সিভিল ড্রেসে একজন ইন্সপেক্টর।

দ্বিতীয় মি. সিম্পসন বললেন, 'ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ, আমার ছদ্মবেশ নিয়ে ওই যে কুয়াশা, ওকে গ্রেফতার করো।'

'বী কেয়ারফুল। এক পা-ও এগোবে না কেউ! আমি কুয়াশা নই, কুয়াশা ও নিজে···।'

ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবলত্রয় একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাতে লাগল। অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে গেছে সকলের চোখ।

ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ মহা ফাঁপড়ে পড়ে তাকাল শহীদের দিকে, বলল, 'মি. শহীদ, এ কি দেখছি আমি? কাকে গ্রেফতার করব বলুন তো?'

প্রথম মি. সিম্পসন আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন, 'ওকে!'

দ্বিতীয়জন উচ্চকণ্ঠে সাথে সাথে বললেন, 'ওকে! ওই কুয়াশা!'

শহীদ বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার ভূমিকাটা এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত বলে মনে করি। ইন্সপেক্টর, আপনি বরং দু'জনকেই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যান।'

ঘটনার চমক এমনই উভয় সংকটে ফেলেছে সকলকে যে চেম্বারের ভেজানো দরজা নিঃশব্দে আবার খুলে গেছে, ভিতরে নতুন একজন লোক প্রবেশ করছে—তা কারও চোখেই পড়ল না। একমাত্র শহীদ দেখল নবাগত আগন্তুককে।

ইন্সপেক্টর বলল, 'রাইট! আমার কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে। আপনাদের দু'জনের মধ্যে যেই মি. সিম্পসন হোন, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এই সমস্যার সমাধান একা করতে পারব না। আপনাদের দু'জনকেই গ্রেফতার করছি আমি।'

ইন্সপেক্টর কনস্টেবলদেরকে নির্দেশ দিল ইশারায়।

দু'জন কনস্টেবল প্রথম মি. সিম্পসনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল, একজন বলল, 'চলুন, স্যার।'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসনের দিকেও দু'জন কনস্টেবল এগোল। তিনি হঠাৎ বললেন, 'ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ, আমাকে গ্রেফতার করার পরিণাম কি হবে তা ভেবে দেখেছ? থানায় গেলেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমি কুয়াশা নই। তখন কি অবস্থা হবে বুঝতে পেরেছ!'

'কিন্তু, স্যার, আমি এখন কি করব বলুন দেখি! আপনাদের মধ্যে কে আসল কে নকল···!'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসন বললেন, 'মাথায় দেখছি তোমার গোবর ভরা! কেন, আমাদের দু'জনের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেই তো পারো।'

ইন্সপেক্টরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'তা ঠিক। বেশ, আপনারা আপনাদের পরিচয়-পত্র বের করে দিন আমাকে।'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসন পকেটে হাত ভরলেন।

আঁৎকে উঠে প্রথম মি. সিম্পসন বললেন, 'ষড়যন্ত্র! এটা একটা ষড়যন্ত্র! আমার পরিচয়-পত্র পকেট থেকে চুরি করে নিয়েছে কেউ! মাইগড···!'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসন তাঁর পরিচয়-পত্র ইন্সপেক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন আমারটা। পরীক্ষা করে দেখুন ভাল করে।'

ইন্সপেক্টর পরীক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত ধরে পরিচয়-পত্রটা। মুখ তুলে স্যালুট করল সে দ্বিতীয় মি. সিম্পসনকে। বলল, 'মাফ করবেন, স্যার। আমি দুঃখিত···।'

প্রথমজন চিৎকার করে উঠলেন, 'ইউ ব্লাডি ননসেন্স! বলছি না এটা একটা ষড়যন্ত্র! আমার পকেট থেকে পরিচয়-পত্র চুরি করে নিয়েছে কেউ···।'

ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চালাকি করে আর লাভ হবে না, মি. কুয়াশা।'

কনস্টেবলদের কিছু বলতে হলো না, তারা এগিয়ে গেল। তাদের একজনের হাতে একটা হাতকড়া রয়েছে দেখে প্রথম মি. সিম্পসন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'কী স্পর্ধা! আমাকে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যাবে তোমরা! চাকরি একজনেরও থাকবে না বলে দিচ্ছি···।'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসন ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ধন্য আশা কুহকিনী! এখনও অভিনয় করছ—নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করো, না?'

প্রথম মি. সিম্পসন রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বের হলো না আর।

কনস্টেবলরা তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। চেপে রাখা ক্রোধ বিস্ফোরণের মত শব্দ করে ফাটল হঠাৎ, 'এই অপমান আমি ভুলব না, কুয়াশা! আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এরপর তোমাকে দেখা মাত্র গুলি করব আমি···!'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু কুয়াশা, এরপর তোমার সাথে আমার

দেখা হবে বলে মনে হয় না। বিচারে তোমার ফাঁসি হবে নির্ঘাৎ।'

'ফাঁসি আমার নয়—তোমার হবে, কুয়াশা।'

ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ বলল, 'আর কোন কথা নয়। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

দ্বিতীয় মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ আর দেরি করার মানে হয় না। ওর নাম কুয়াশা, যতক্ষণ না ওকে সেলের ভিতর বন্দি করা যায় ততক্ষণ কোন নিশ্চয়তা নেই। ইন্সপেক্টর, থানার পথে যাবার সময় শয়তানটা মরিয়া হয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেই করবে, সুতরাং খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে। আপনারা সবাই ওকে নিয়ে জীপে গিয়ে উঠুন। আমি এবং একজন কনস্টেবল জীপের পিছু পিছু শহীদের প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে এগোব। সকলের প্রতি নির্দেশ রইল, কুয়াশা যদি পালাতে চেষ্টা করে, বিনা দ্বিধায় গুলি করবেন ওকে। এবার যান সবাই।'

প্রথম মি. সিম্পসন রাগে কাঁপছেন তখনও। চোখ দুটো থেকে অগ্নি বর্ষণ হচ্ছে। বিনা বাক্য ব্যয়ে তিনি পা বাড়ালেন। নাভির কাছে হাত দুটো একত্রিত করা, হাতকড়া লাগানো। তাঁর পিছনে ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ। ইন্সপেক্টরের হাতের রিভলভার তাঁর শিরদাঁড়ায় ঠেকে আছে।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওদের পিছন থেকে দ্বিতীয় মি. সিম্পসন বললেন, 'আমি শহীদের কাছ থেকে চাবি নিয়ে গ্যারেজে যাচ্ছি, আপনারা রওনা হয়ে যান।'

চেম্বারে একজন কনস্টেবল তখনও দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র শহীদ ছাড়া বাকি সকলের অজ্ঞাতে চেম্বারে প্রবেশ করেছিল সে খানিক আগে।

'মি. সিম্পসন! আপনি সত্যিই আসল মি. সিম্পসন?' নাকি…!'

মৃদু একটু হাসল শহীদ কামালের কথা শুনে।

ইউনিফর্ম পরিহিত কনস্টেবল বলে উঠল, 'বস্, হামাডের উচিট এই জায়গা হইটে কাটিয়া পড়া! মি. সিম্পসনকে যে ভাবে বোকা বানাইয়াছেন…'

মি. সিম্পসনরূপী কুয়াশা একটা চেয়ারে বসল। বলল, 'থানায় পৌঁছে মি. সিম্পসন প্রমাণ করতে পারবেন তিনি কুয়াশা নন। কিন্তু সময় লাগবে প্রচুর। ভয়ের কিছু নেই, মি. ডি. কস্টা।'

শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসন কিন্তু অপমানটা সহজে ভুলবেন না।'

কুয়াশা বলল, 'জানি। কিন্তু সুযোগটা পেয়ে হাত ছাড়া করতে পারলাম না। ব্যাপার কি জানো, মি. সিম্পসন আমার পিছনে এমন ফেউ-এর মত লেগে আছেন যে বাইরে বেরিয়ে মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি পাই না। চোখে ধুলো দেবার জন্য ওর ছদ্মবেশ নিয়েই কিছুদিন থেকে বাইরে ঘুরছি। দেখলাম মি. সিম্পসন জীপ থেকে নেমে তোমার অফিসে ঢুকলেন। অমনি এসে হাজির হলাম। ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ ঘুর ঘুর করছিল বাইরে, তাকে এবং কনস্টেবলগুলোকে বললাম, কুয়াশা আমার ছদ্মবেশে তোমার চেম্বারে রয়েছে। ওদেরকে চেম্বারের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকি আমি।'

শহীদ বলল, 'বুঝেছি। কিন্তু মি. সিম্পসনের পরিচয়-পত্রটা কি হলো?'

কুয়াশা মুচকি হেসে তাকাল ডি. কস্টার দিকে।

'হামি চেম্বারে ঢুকিলাম কিন্টু কেহই হামাকে ডেকিটে পাইল না। ইন্সপেক্টর সাহেব যখন ড়ইজন মি. সিম্পসনকেই গ্রেফটার করিবার আডেশ ডিলেন হামি টখন আসল মি. সিম্পসনের পাশে গিয়া ডাঁড়াইলাম। সেই সময়ই টাহার পকেট মারি হামি···।'

কুয়াশা বলল, 'মি. ডি. কস্টার পকেটেই সেটা আছে এখনও। আমি যে পরিচয়-পত্রটা ইন্সপেক্টরকে দেখাই সেটা নকল, আমার সাথে সব সময় রাখি, কখন দরকার পড়ে বলা তো যায় না।'

ক্রিং···ক্রিং···!

ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে নিল শহীদ।

ডি. কস্টা দরজার দিকে পা বাড়াল দ্রুত, বলল, 'মি. সিম্পসনের ফোন—মাইগড! টাইম ঠাকিটে কাটিয়া পড়াই ভাল!'

মি. সিম্পসনের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল শহীদ। অপর প্রান্ত থেকে তিনি বলছেন, 'শহীদ, রমনা থানা থেকে আমি মি. সিম্পসন বলছি। শয়তানটা কি এখনও তোমার অফিসে আছে?'

শহীদের দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে প্রত্যেকে। মি. সিম্পসন ফোন করেছেন, বুঝতে পারছে সবাই। কি বলছেন তিনি তা জানার জন্যে সবাই উদগ্রীব।

শহীদ বলল, 'তার মানে? আপনিই···মানে, আপনাকে···মানে ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ যাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল···।'

'হ্যাঁ, আমি মি. সিম্পসনই গ্রেফতার হয়েছিলাম! ইন্সপেক্টর···ওটা একটা গর্দভ, শহীদ! কুয়াশা কি তোমার···'

শহীদ বলল, 'আছে, এখনও আমার চেম্বারে আছে···।'

কথাটা শেষ না করে মুখ তুলে তাকাল শহীদ। দেখল ওর সামনের যে চেয়ারটায় কুয়াশা বসেছিল সেটা খালি পড়ে আছে, চেম্বারের কোথাও কুয়াশার ছায়াও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

'না, মি. সিম্পসন, কুয়াশাকে দেখতে পাচ্ছি না। এই একটু আগেও ছিল সে···'

মি. সিম্পসন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'বুঝেছি! শয়তানটা পালিয়েছে! ঠিক আছে, ওকে আমি দেখে নেব···!'

শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসন, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে নিশ্চয়ই দোষ দিতে পারেন না।'

'না। তা পারি না। ছাড়ি, শহীদ।'

হঠাৎ করেই ফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন মি. সিম্পসন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসন আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

কামাল বলল, 'কুয়াশার ব্যাপারে তোর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মি. সিম্পসন চিরকালই অসন্তুষ্ট। অবশ্য মনে মনে।'

শহীদ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা জানি। কিন্তু এই প্রথম তিনি তাঁর ব্যবহারের

মাধ্যমে প্রকাশ করলেন যে কুয়াশাকে আমি সমর্থন করি, সাহায্য করি তা তিনি পছন্দ করেন না।'

কেউ কোন কথা বলল না।

শহীদই বলল আবার, 'এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে মি. সিম্পসনের সাথে এত দিনকার সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার, কামাল।'

কামাল বলল, 'সম্পর্ক আরও আগেই খারাপ হবার কথা ছিল। কি আর করা—বাস্তবকে মেনে নিতে হবে আমাদের। আমরা তো আর কুয়াশার শত্রুতে পরিণত হতে পারি না। তাকে আমরা সমর্থন করে যাবই।'

শহীদ সংক্ষেপে বলল, 'অবশ্যই।'

দুই

পরের দিন। রাত সাড়ে ন'টা।

অফিসে নেই কেউ। একা শহীদ ওর চেম্বারে বসে শিল্পীর তৈরি করা রিপোর্টটা পরপর দু'বার পড়ে নামিয়ে রাখল ফাইলটা ডেস্কের উপর। পাইপে নতুন করে টোবাকো ভরে অগ্নিসংযোগ করল ও। রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে জুতোসহ পা দুটো তুলে দিল ডেস্কের উপর, তারপর চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে পাইপ টানতে লাগল।

ভাবছে শহীদ।

খেটেছে শিল্পী। গতকাল বিকেল থেকে আজ সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত, গত রাতের কয়েকটা ঘণ্টা বাদ দিয়ে, ছায়ার মত অনুসরণ করেছে মিসেস রাফিয়াকে। আধঘণ্টা সময় নিয়ে বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করেছে সে তার অভিজ্ঞতা এবং আবিষ্কারগুলো। সাড়ে ছয়টায় মিসেস রাফিয়া তাদের গুলশানের বাড়ি থেকে কোন এক হোটেলে যাবে বিশেষ এক পার্টি উপলক্ষে, তাকে গভীর রাত পর্যন্ত অনুসরণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে শিল্পী রিপোর্টে।

সোয়া ছয়টার সময় অফিস থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে শিল্পী। এখন বাজে সাড়ে নয়টা। মিসেস রাফিয়া সম্ভবত পার্টিতেই রয়েছে এখনও। শিল্পীও নিশ্চয়ই তার উপর নজর রেখেছে।

ভাবছে শহীদ।

মিসেস রাফিয়া একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার, সন্দেহ নেই। শিল্পীর রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে মিসেস রাফিয়ার মধ্যে ক্লেপটোম্যানিয়ার কোন লক্ষণই নেই। আজ সকালে সে মার্কেটিংয়ের জন্য নিউমার্কেট, রমনা ভবন এবং বায়তুল মোকাররমে যায়। হাজারখানেক টাকার জিনিসপত্র কেনে সে। কসমেটিকস, বই, ব্লাউজের কাপড়, স্যাণ্ডেল—এই ধরনের ছোটখাট জিনিস কেনে সে। কিন্তু চুরি সে করেনি।

অবশ্য এতে করে বিশেষ কিছু প্রমাণ হয় না। একজন ক্লেপটোম্যানিয়াক সবসময়ই যে চুরি করার তালে থাকবে তেমন কোন কথা নেই। চুরি করার প্রবণতা তার মধ্যে কখনও থাকে, কখনও থাকে না। মিসেস রাফিয়া হয়তো সত্যিই এই

অসুখে ভুগছে, কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়তে কয়দিন সময় লাগবে।

তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে, মিসেস রাফিয়া সাধন সরকার নামে এক যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে। গতকাল এবং আজ, দু'দিনে দু'বার মিসেস রাফিয়া এই যুবকের সাথে গোপনে মিলিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে দু'জনই সচেষ্ট ছিল, শিল্পী রিপোর্ট দিচ্ছে। ওরা ঢাকার বাইরে, নারায়ণগঞ্জের একটা অভিজাত রেস্তোরাঁয় গতরাতে খাওয়াদাওয়া করেছে, সেই একই রেস্তোরাঁয় আজ দুপুরেও লাঞ্চ খেয়েছে ওরা। শিল্পী যুবকের নামধাম, বাড়ির নাম্বার ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ভুল করেনি। পুরানা পল্টনে সাধন সরকারের বাড়ি আছে। সৌখিন, প্লেবয় টাইপের, সিনেমার নায়কের মত চটকদার পোশাক পরতে অভ্যস্ত। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা করে সে। প্রচুর টাকার মালিক।

দ্বিতীয় আবিষ্কারটা আরও অপ্রত্যাশিত। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ফেয়ারভিউ নাইট ক্লাবের মালিক কাজী হানিফের সাথে ক্লাবে দেখা করেছে গতকাল সন্ধ্যার আগে মিসেস রাফিয়া। প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিল সে কাজী হানিফের সাথে। মিসেস রাফিয়া ক্লাবের গেটম্যানকে অনুরোধ করে বলে যে বিশেষ জরুরী একটা ব্যাপারে কাজী হানিফের সাথে সে দেখা করতে চায়, গেটম্যান ভিতরে গিয়ে কাজী হানিফকে ব্যাপারটা জানায়, তারপর ফিরে এসে মিসেস রাফিয়াকে ভিতরে নিয়ে যায়।

কাজী হানিফকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও, লোকটা সম্পর্কে জানা আছে শহীদের। চতুর, কৌশলী লোক। তার নাইটক্লাবে গোপনে জুয়া খেলার আসর বসে এবং খেলায় অংশ গ্রহণ করে ধনী লোকেরা। প্রচুর কালো টাকার মালিক সে। টাকার প্রতি তার লোভ সীমাহীন। টাকার কথা শুনলেই নাকি তার জিভে পানি আসে, চোখ দুটো চকচক করতে থাকে আলোর সামনে ধরা হীরের মত। তার নাইট ক্লাবের উপর থেকে পুলিসের দৃষ্টি সরিয়ে রাখার জন্যে সে নাকি কয়েকজন অসৎ অফিসারকে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে থাকে।

শহীদ ভাবছিল। কামাল এবং জামানকে কাজে লাগাতে হবে। ওরা সাধন সরকার এবং কাজী হানিফের সাথে মিসেস রাফিয়ার সম্পর্ক কি তা জানার চেষ্টা করবে আগামীকাল থেকে···।

চিন্তায় বাধা পড়ল শহীদের। চোখ খুলল না ও, পা দুটোও নামাল না ডেস্কের উপর থেকে। কিন্তু কান দুটো ওর খাড়া হয়ে উঠেছে।

একটা গাড়ি আসার শব্দ হয়েছে।

এক মুহূর্ত পর চোখ মেলল ও। গেট পেরিয়ে হালকা পদশব্দ এগিয়ে আসছে। নাকি ভুল শুনছে ও?

না—ওই তো, করিডরে উঠে এসেছে পদশব্দ। ডেস্কের উপর থেকে পা দুটো নামিয়ে সিধে হয়ে বসল শহীদ। ড্রয়ার খুলে কি মনে করে আড়চোখে দেখে নিল লোডেড রিভলভারটা। খোলাই রইল ড্রয়ারটা, মুখ তুলে তাকাল দরজার দিকে। কে এল? এমন অসময়ে···?

দরজাটা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

চেম্বারের ভিতর পা রাখল মিসেস রাফিয়া। বোম্বাই প্রিন্টের সিল্কের শাড়ি, সেই প্রিন্টেরই ছোট্ট একটা টুকরো দিয়ে তৈরি করা ব্লাউজ পরনে তার। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা প্রকাণ্ড আকারের। দুধে আলতায় গায়ের রং তারই সাথে ম্যাচ করা রঙের লিপস্টিক মাখানো ঠোঁট।

'আপনি একা দেখছি!'

আর কেউ নেই জেনেই এসেছে এ সময় ও, ভাবল শহীদ। বলল, 'মিসেস রাফিয়া, আপনি? এত রাতে!'

পা বাড়াল মিসেস রাফিয়া। ডেস্কের সামনে দাঁড়াল। হাঁটার ভঙ্গি, দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় এই মেয়ে সত্যি নর্তকী। সব কিছুর মধ্যে একটা ছন্দ আছে, তার চেয়েও বেশি আছে দেহ প্রদর্শন করার উগ্র তাড়না। একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ভাব এনে বলল, 'আমার পেছনে স্পাই লাগানো হয়েছে। জানতে চাই—কেন।'

মনে মনে অবাকই হলো শহীদ শিল্পীর অস্তিত্ব মিসেস রাফিয়া টের পেয়ে গেছে বুঝতে পেরে। পাইপ কামড়ে ধরে শহীদ বলল, 'বসুন, মিসেস রাফিয়া। আপনি এই রাতে আমার কাছে এসেছেন—আপনার স্বামী ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারেন।'

মিসেস রাফিয়া বলল, 'না।' উত্তরটা দিল অবশ্য সাথে সাথে এবং উত্তপ্ত কণ্ঠে, 'নেভার মাইণ্ড! এমন হাজার হাজার ব্যাপার আছে যা আমার স্বামী পছন্দ করেন না! সেগুলোর সাথে না হয় আর একটা যোগ হলো। আমি জানতে চাইছি, আমার পিছনে মেয়েটাকে লাগিয়েছেন কেন?'

শহীদ বলল, 'ধরুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নই আমি।'

মিসেস রাফিয়া চেয়ে রইল নিষ্পলক। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল তার সরু ঠোঁটে। বলল, 'ভুল করেছি, মনে হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল আপনি আমাকে দেখে খুশি হবেন। বেশির ভাগ পুরুষই তাই হয়। মি. শহীদ, যদি কিছু মনে না করেন···।'

শহীদ ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'মিসেস রাফিয়া, যদি কিছু মনে না করেন, দয়া করে আপনি বিদায় নিন। আমি এখন খুব ব্যস্ত।'

মিসেস রাফিয়ার মুখের হাসি এতটুকু ম্লান হলো না, বরং তা যেন আরও বিস্তৃত, আরও মাদকতাময় হয়ে উঠল। পিচ্ছিল শাড়িটা বারবার খসে পড়ছে কাঁধ থেকে, দেখা যাচ্ছে পেট-পিঠের উজ্জ্বল ত্বক। ডেস্কের উপর হাত রেখে শহীদের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, দামী সেন্টের গন্ধ ঢুকল শহীদের নাকে। আবার মিসেস রাফিয়ার কাঁধ থেকে খসে পড়েছে শাড়ি।

শহীদ রূঢ় গলায় বলে উঠল, 'মিসেস রাফিয়া, শাড়িটা তুলুন, ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে পারে আপনার।'

মুহূর্তের জন্য হাসিটা উবে গেল মিসেস রাফিয়ার মুখ থেকে। কিন্তু পর মুহূর্তে আবার সেই মায়াময় হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা, বলল, 'আপনি বিবাহিত, সম্ভবত। আপনার স্ত্রী কি আমার চেয়েও সুন্দরী?'

শহীদ জানতে চাইল, 'আপনি আমার অফিসের ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?'

শব্দ করে হাসল মিসেস রাফিয়া। বলল, 'সহজেই জেনে নিয়েছি! আপনার গাড়ির নাম্বার গতকাল দেখেছিলাম আমি সুইমিং পুলে নামার আগে। এবং বাটলার আমাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের এবং আপনার নাম বলেছিল। টেলিফোন গাইড দেখে বাকিটা জেনে নিয়ে মেয়েটার চোখে ধুলো দিয়ে চলে এসেছি…।'

শহীদ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'আমার কাছে না এসে আপনার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারতেন। তাঁর আপত্তি না থাকলে তিনি হয়তো সঠিক উত্তর দিতেন।'

মিসেস রাফিয়া আরও ঝুঁকল শহীদের দিকে, বলল, 'উত্তরটা আমি আপনার কাছ থেকে চাই।'

শহীদ উঠে দাঁড়াল, 'মাফ করবেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অপারগ। রাত হয়েছে অফিস বন্ধ করব আমি…।'

'কত টাকা পাচ্ছেন আপনি এই কাজের জন্য, মি. শহীদ?'

শহীদ বলল, 'এ কথা জানতে চাইবার মানে?'

মিসেস রাফিয়া ডেস্ক ঘুরে শহীদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আমাকে কেউ অনুসরণ করুক, আমার ওপর কেউ নজর রাখুক, এ আমি সহ্য করতে রাজি নই। যে কোন মূল্যে এটা বন্ধ করতে চাই আমি। মি. শহীদ, কি চান আপনি? এন্টারটেইনমেন্ট, অর মানি? দুটোর যে কোন একটা কিংবা দুটোই আপনি আমার কাছ থেকে পেতে পারেন…।'

শান্তকণ্ঠে বলল শহীদ, 'আপনার প্রস্তাবে আমি এতটুকু বিস্মিত হচ্ছি না। আপনি যেমন, আপনার প্রস্তাবগুলোও ঠিক তেমনি।'

'দশ হাজার টাকা পেলে…?'

'দুঃখিত, মিসেস রাফিয়া। আপনি আমাকে দশ লাখ টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন না।'

মিসেস রাফিয়া এতক্ষণে শহীদকে যেন চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো। হাসি অদৃশ্য হবার সাথে সাথে তার সুন্দর মুখে ফুটে উঠল কুটিল রেখা। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। চাপা, হিসহিসে গলায় বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! বুঝতে পারছি আপনি সাধু-পুরুষদের একজন। কিন্তু দয়া করে আপনার ক্লায়েন্টকে যদি একটা কথা আমার হয়ে জানান তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। তাকে বলবেন, সে যদি ডাইভোর্সই চায়—বেশ তো, আমি রাজি আছি। কিন্তু এ-ও বলবেন তাকে, তার টাকার লোভেই তাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। টাকা ছাড়া কেন আমি অমন একটা বুড়োকে বিয়ে করতে যাব—তা, কোন বুদ্ধিমতী মেয়ে করে? তাকে বলে দেবেন, আমার পিছনে স্পাই লাগিয়ে কোনই লাভ হবে না। অত সহজে আমাকে ধরা সম্ভব নয়। বলে দেবেন, ডাইভোর্সে আমি রাজি আছি—কিন্তু প্রচুর, প্রচুর টাকার বিনিময়েই তা সম্ভব!'

রাগে ফর্সা মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেছে মিসেস রাফিয়ার। হাঁপাচ্ছে সে।

'আমার পেছনে কেন, নিজের মেয়ের পেছনে স্পাই লাগাতে পারে না সে?

তাকে বলবেন, নিজের মেয়ের পেছনে স্পাই লাগাতে। আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার জানতে পারবে সে! চললাম!'

শহীদকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল মিসেস রাফিয়া চেম্বার থেকে। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তার পিছনের দরজাটা। শোনা যাচ্ছে হাই হিলের দ্রুত শব্দ—খট্ খট্ খট্…

শহীদ সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ড পর কানে এল একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ।

হাত বাড়িয়ে ডেস্ক থেকে লাইটারটা তুলে নিয়ে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল শহীদ। অন্যমনস্ক, চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে।

গভীর, নিস্তব্ধ রাত্রি। ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনের বেল। ক্রিং…ক্রিং…ক্রিং… ক্রিং…। একই সাথে টুটে গেল ওদের দু'জনের ঘুম।

মহুয়া ডাকল, 'শুনছ?'

বিছানায় উঠে বসল শহীদ। বলল, 'এত রাতে…কার ফোন হতে পারে?'

বেডরুমের দুই প্রান্তে দুটো বিছানা। মহুয়াও তার বিছানায় উঠে বসেছে। হাত বাড়িয়ে বেড সুইচটা অন করে দিতে টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলে উঠল। টেবিলক্লকটার দিকে তাকাল শহীদ। পৌনে তিনটে বাজে।

মহুয়ার কণ্ঠ একটু বেসুরো শোনাল, 'মনটা কেমন যেন দমে গেল—নিশ্চয়ই কোন খারাপ খবর।'

শহীদ ইতিমধ্যে হাত বাড়িয়ে তেপয়ের উপর রাখা ক্রেডল থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছে, 'শহীদ খান স্পীকিং।'

'সিম্পসন, থানা হেড কোয়ার্টার থেকে বলছি। শহীদ, বাধ্য হয়ে এত রাতে ঘুম ভাঙাতে হলো তোমার। একটা ঘটনা ঘটেছে—কিন্তু ঘটনাটার গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারছি না। এই মাত্র…কিছুক্ষণ আগে এক লোক একটা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে এসেছে, ওটা মিস শিল্পীর। যতদূর জানি, শিল্পী তোমার অফিসে কাজ করছে, তাই না?'

'মি. সিম্পসন—কি যেন চেপে রাখছেন আপনি। শিল্পীর ভ্যানিটি ব্যাগ পাওয়া গেছে—শুধু এই খবরটা দেবার জন্যে আপনি ফোন করেননি।'

মি. সিম্পসন চুপ করে রইলেন। কয়েক সেকেণ্ড পর শান্ত স্বরে বললেন, 'হয়তো ব্যাপারটা কিছুই না, শহীদ। ব্যাগটা শিল্পীর বলেই থানা ইনচার্জ সরাসরি আমাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানায়। আমি বাড়ি থেকেই শিল্পীর ফ্ল্যাটে ফোন করেছিলাম, কিন্তু কেউ ফোন ধরেনি। তারপর চলে এসেছি এখানে। ভ্যানিটি ব্যাগটা পরীক্ষা করেছি আমি। ওটা শিল্পীরই। পাওয়া গেছে ধানমণ্ডি লেকের কাছে। সেখানে রক্তের দাগও দেখা গেছে।'

শহীদের বুকের ভিতরটা দুলে উঠল, 'রক্তের দাগ দেখা গেছে?'

'ব্যাগটা যে নিয়ে এসেছে সে অন্তত তাই বলছে। আমি নিজে যাচ্ছি জায়গাটা দেখতে। তুমি যেতে চাইলে…।'

শহীদ বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'আমি তোমার বাড়িতে আসছি—সাত মিনিটের মধ্যে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে লাফ দিয়ে নামল শহীদ বিছানা থেকে কার্পেটের উপর। ওয়ারড্রোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। মহুয়াও বিছানা থেকে নেমে পড়ল। 'কি হয়েছে গো?'

শহীদ ওয়ারড্রোব খুলে কাপড় চোপড় বের করতে করতে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। শিল্পীর হ্যাণ্ড ব্যাগটা পাওয়া গেছে লেকের ধারে, রক্তের দাগও দেখা গেছে সেখানে···মি. সিম্পসন আসছেন, আমি যাব জায়গাটা দেখতে।'

'শিল্পী···?'

শহীদ দ্রুত কাপড়-চোপড় পরে নিল। ড্রয়ার খুলে লোডেড রিভলভারটা ভরল পকেটে। ফোনের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল একবার, চোখ তুলল মহুয়ার দিকে, 'আমি নিচে অপেক্ষা করছি মি. সিম্পসনের জন্যে। তুমি কামালকে ফোন করে জানাবে···।'

'শিল্পী কি···?' ভয়ঙ্কর প্রশ্নটা পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারল না মহুয়া।

'জানি না।'

দ্রুত, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল শহীদ রুম থেকে। শহীদের গমন পথের দিকে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মহুয়া। কয়েক মিনিট পর নিচ থেকে ভেসে এল গাড়ির শব্দ। মহুয়া জানালার দিকে তাকাল। কিন্তু সেদিকে না এগিয়ে পা বাড়াল ফোনের দিকে।

জীপ ছেড়ে দিলেন মি. সিম্পসন। নির্জন, আলো-অন্ধকারে ঢাকা, সরল, প্রশস্ত পথ। তীরবেগে ছুটতে শুরু করেছে জীপ। মি. সিম্পসনের পাশে চুপচাপ বসে আছে শহীদ।

'হয়তো ব্যাপারটা কিছুই নয়, ফলস্ অ্যালার্ম।' বললেন বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল মি. সিম্পসন কথাটা নিজেই বিশ্বাস করছেন না। খারাপ কিছু একটা ঘটেছে, মনে মনে জানেন তিনি। তা না হলে তাঁর মত একজন অফিসার এই রাতে ঘুম থেকে উঠে এমন তৎপর হয়ে উঠতেন না, শহীদেরও ঘুম ভাঙাতেন না।

শহীদ জানতে চাইল, 'লোকটা কে? লেকের ধারে এত রাতে কি করছিল সে?'

'লোকটার মাথায় গোলমাল আছে। এলাকার সব মানুষ চেনে তাকে। বিদঘুটে চরিত্র একটা, কিন্তু নিরীহ টাইপের। বহু বছর ধরে রাতে ঘুমায় না। আমাদের লোকেরাও তাকে চেনে ভাল করে। সারারাত জেগে টেলিস্কোপ দিয়ে বাড়ির ছাদ থেকে নক্ষত্র দেখে। নাম দেলোয়ার মোরশেদ।'

লোকটা সম্পর্কে কোন আগ্রহ বোধ করল না শহীদ।

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'শিল্পীর হাতে কি কোন কাজ ছিল?'

সরাসরি মিথ্যে কথা বলল শহীদ, 'না। আমি অন্তত ওকে কোন কাজ দিইনি।'

মোহাম্মদ তোয়াব খানকে কথা দিয়েছে ও, তাঁর নাম পুলিসের কাছে প্রকাশ

রবে না। তাঁর কাছ থেকে অনুমতি না পেলে কথার মূল্য রাখতে হবে ওকে।

লেকের কাছে থামল জীপ। রাস্তার পাশে নামল ওরা। পিছনের কনস্টেবলের দেশে মি. সিম্পসন বললেন, 'আমরা যেদিকে যাব, জীপ ঘুরিয়ে হেডলাইটের ালো সেদিকে ফেলবার চেষ্টা করো। এসো, শহীদ। সামনে একটা গাছের মোটা াল পড়ে আছে। সেখান থেকে মাত্র হাত বিশেক বাঁয়ে পাওয়া গেছে ব্যাগটা।'

মি. সিম্পসনের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শহীদ বলল, 'দেলোয়ার ারশেদকে সাথে আনেননি কেন?'

'আধ-পাগলা লোক। বেজায় বকবক করে। অসুবিধে হবে না, জায়গাটার াশে ছোট ছোট পাথর জড়ো করে রেখে গেছে সে, যাতে সহজে চেনা যায়।'

টর্চের আলোয় পথ দেখতে দেখতে এগোচ্ছে ওরা। লেকটা দেখা যাচ্ছে। রদিকে, দূরে দূরে, উঁচু উঁচু বাড়ি। মানুষজন নেই কোথাও। শেষ রাতের হিমেল াতাস লাগছে চোখেমুখে। শক্ত, কঠিন আকার ধারণ করেছে শহীদের মুখের চহারা।

'ওই তো!'

গাছের লম্বা ডালটা দেখতে পেলেন মি. সিম্পসন। দিক পরিবর্তন করল ওরা ামান্য, চলার গতি বাড়িয়ে দিল। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে পাথরের একটা ছোট প। জীপের হেডলাইট ঘুরে গেছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে চারদিক।

দাঁড়াল ওরা।

পাথরের স্তূপের পাশেই জমাট বাঁধা রক্ত—কালচে হয়ে গেছে। শক্ত শুকনো াটি। রক্ত ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। পায়ের ছাপ আবিষ্কার করার জন্যে াটু গেড়ে বসে মাথা নত করে চারপাশের মাটি পরীক্ষা করল শহীদ। আশপাশের াটি আলগা হয়ে আছে কয়েক জায়গায়, কিন্তু কোন ছাপ নেই।

মি. সিম্পসন রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে দেখছিলেন শহীদকে। হীদ সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াতে তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই ঝাপটা—চলো দেখে আসি।'

আশপাশে ছোট ছোট অনেক ঝোপ। কিন্তু মি. সিম্পসন যেটার কথা বললেন নটা সবগুলোর চেয়ে বড় এবং উঁচু।

শহীদের দিকে তাকালেন না মি. সিম্পসন। ওর চোখে চোখ রাখতে পারছেন া তিনি।

জীপের হেডলাইট ঘুরছে আবার। কনস্টেবলটি বুঝতে পেরেছে বড়সড় ঝাপটার দিকেই যাচ্ছে ওরা।

মি. সিম্পসনকে অনুসরণ করছিল শহীদ নিঃশব্দে। ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল ও। কসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। পা দুটো চলছে না আর।

মি. সিম্পসন একা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ঝোপের সামনে। হাত দিয়ে ঝাপের সরু সরু ডাল-পালা সরিয়ে ভিতরে তাকালেন তিনি। হেডলাইটের ালোয় তাঁর পিছনটা দেখা যাচ্ছে। দেহটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তাঁর। মানুষ নয়, কটা স্থির, নিষ্প্রাণ মূর্তি বলে মনে হলো তাঁকে মাত্র দশ-বারো হাত পিছন থেকে।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে এলেন তিনি দুই পা। ঘুরে দাঁড়ালেন। শহীদের চোখে চোখ রাখলেন।

কেউ কোন কথা বলল না—অনেকক্ষণ।

তারপর, একসময় শহীদ পা বাড়াল।

শহীদ সামনে গিয়ে দাঁড়াতে মি. সিম্পসন ঘুরে দাঁড়ালেন আবার। শহীদের কাঁধে হাত দিয়ে পরপর দু'বার আলতো ভাবে চাপড় মারলেন। সান্ত্বনা দেবার আর কিই বা উপায় আছে। অপর হাতটা দিয়ে মি. সিম্পসন ঝোপের ডাল-পালা সরালেন।

মরে গেলেও, পুতুলের মত সুন্দর দেখাচ্ছে শিল্পীকে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সে। চুলে, মুখে মাটি লেগে রয়েছে। কপালের একটু উপরে বুলেটের গভীর গর্তটা নির্মম বাস্তব হলেও কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে।

চোখ ফিরিয়ে নিল শহীদ। মুখ মুছতে গিয়ে রুমালটা দিয়ে চেপে ধরল চোখ দুটো। শিল্পীর পরনে কোন কাপড় নেই। না শাড়ি, না ব্লাউজ, না পোটকোট—কিছুই না।

মি. সিম্পসন এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পিছন দিকে আকর্ষণ করলেন শহীদকে। শহীদ ডান হাত দিয়ে মি. সিম্পসনের হাতটা ধরে সরিয়ে দিল, নিজেই ঘুরে দাঁড়াল, পা বাড়াল জীপের দিকে। মি. সিম্পসন নত মস্তকে অনুসরণ করলেন। নিচু গলায় কিছু বলতে গেলেন তিনি, কিন্তু সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলেন না, চুপ করেই রইলেন।

তিন

থানা হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে ফোন করল শহীদ বাড়িতে।

মহুয়া ইতিমধ্যে আঁচ করতে পেরেছে ঘটনাটা, তার কান্না-রুদ্ধ কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল।

'শিল্পীকে···কি খবর, শহীদ?'

শহীদ চেষ্টা করে শান্ত ভাবে বলল, 'খবর খারাপ, মহুয়া। শিল্পী···হ্যাঁ, খুন হয়েছে ও। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরছি।'

মহুয়াকে আর কিছু না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ। খানিক পর মি. সিম্পসন ফিরলেন। মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করার জন্যে গিয়েছিলেন।

চুরুট ধরিয়ে শহীদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। অনেক কথা জানতে চান, অনেক প্রশ্ন মাথা খুঁড়ে মরছে তাঁর মনে। কিন্তু কিভাবে শহীদকে প্রশ্ন করে উত্তর নেবেন ভেবে ঠিক করতে পারছেন না।

শহীদও মনে মনে তৈরি হয়ে আছে। ও জানে, মি. সিম্পসন প্রশ্ন করবেন।

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমি আরও পরে তোমার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করব। তোমার মানসিক অবস্থার কথা আমি বুঝতে পারছি। তুমি বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নাও, শহীদ। শিল্পীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমার। তবে, যাই

না, তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবার আশা করি আমি।'

উত্তরে শহীদ কোন কথাই বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল। মি. পসন পিছন থেকে বললেন, 'এক মিনিট শহীদ।'

শহীদ দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুরল না।

'একটা মাত্র প্রশ্নের উত্তর চাই আমি তোমার কাছ থেকে। তুমি কি ভাবছ তা মি জানি না। তবু, প্রশ্নটা আমি করছি।'

'কি প্রশ্ন, মি. সিম্পসন?'

'আমি জানতে চাই, শিল্পী কারও হয়ে কোন কাজ করছিল কি না।'

'কারও হয়ে?'

মি. সিম্পসনের কণ্ঠস্বর তাঁর নিজেরই অজান্তে কঠিন হয়ে উঠল, 'আমি াশার কথা বলছি, শহীদ।'

'না, মি. সিম্পসন।'

শহীদ পা বাড়াল কথাটা বলে। বেরিয়ে গেল অফিস রুম থেকে।

মি. সিম্পসনও চেয়ার ছাড়লেন। অস্থির, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাঁকে। হ্যাটটা ন টেবিলে রাখলেন। পায়চারি করতে শুরু করলেন। মাথার চুলে আঙুল াতে চালাতে বিড়বিড় করে বললেন, 'রহস্যটা কি? কেন শহীদ সব কথা খুলে ছে না আমাকে···?'

াদ ভেবেছিল মহুয়াকে শোকে ভেঙে পড়া অবস্থায় দেখবে ও। কিন্তু মহুয়া দরজা ন দিতে সে ভুল ভাঙল ওর। নিজেকে সংযত করে নিয়েছে মহুয়া। শহীদের টা হাত ধরে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল সোফার পাশে, বলল, 'বসো মি কফি তৈরি করে রেখেছি, নিয়ে আসি।'

ধীরে ধীরে বসল শহীদ সোফায়। বলল, 'কফির দরকার নেই, মহুয়া। কামাল থায়? ফোন করোনি ওদেরকে তুমি?'

'চুপচাপ এইখানে এক মিনিট বসো তুমি। ওসব কথা তোমাকে ভাবতে হবে। কামালকে পাঠিয়েছি আমি মি. তোয়াব খানের বাড়িতে। আর জামান গেছে ীর ফ্ল্যাটে।'

মহুয়া শহীদের কপালে হাত বুলিয়ে দিল একবার, তারপর ত্রস্ত পদক্ষেপে চলে ন ড্রয়িংরুম থেকে।

খানিক পরই ফিরে এল ও একটা ট্রে নিয়ে। ট্রেটা নামিয়ে কেটলি থেকে কাপে ক ঢালতে ঢালতে স্বামীর দিকে তাকাল।

শহীদ চোখ বুজে বসে আছে।

নিঃশব্দ পায়ে ড্রয়িংরুমের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল কামাল। চোখ দুটো া ফুলের মত লাল, প্যান্টের দুই পকেটে দুটো হাত ঢোকানো, মাথার চুল নামেলো। চোখের কোণে পানি।

'কি বলল তোয়াব খান?' চোখ না খুলেই প্রশ্ন করল শহীদ। ভিতরে ঢুকল াল, চোখের দৃষ্টি কার্পেটের দিকে।

মহুয়া কফির পেয়ালায় চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়ছিল, হাতটা স্থির হয়ে গেছে তার। চেয়ে আছে সে কামালের দিকে।

মুখ না তুলেই কামাল ভারি গলায় ধীরে ধীরে বলল, 'পাগলের মত আচরণ করছেন। প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি। যখন বিশ্বাস হলো, জানতে চাইলেন শিল্পী মিসেস রাফিয়াকে অনুসরণ করছিল তা পুলিসকে জানানো হয়েছে কিনা। শিল্পীর মৃত্যুটাকে তিনি খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁর সম্মান যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে তাঁকে অস্থির দেখলাম।'

মুখ তুলে শহীদের দিকে তাকাল কামাল, 'মি. সিম্পসনকে বলেছিলি তুই, শিল্পী কাজ করছিল তোয়াব খানের হয়ে?'

'না। অস্বীকার করেছি আমি। কিন্তু খবরটা শেষ পর্যন্ত চাপা থাকবে বলে মনে হয় না। মি. সিম্পসন কারও চেয়ে কম বুদ্ধিমান নন। আমি কথা দিয়েছিলাম তোয়াব খানকে···।'

কামাল বসল ধীরে ধীরে শহীদের মুখোমুখি। বলল, 'হ্যাঁ। তুই কথা দিয়েছিস এ ব্যাপারে পুলিসকে কিছুই জানাবি না—কমপক্ষে একশো বার কথাটা উল্লেখ করেছেন তোয়াব খান। শুধু তাই না, একরকম হুমকি দিয়েই বলেছেন, আমরা পুলিসকে জানালেও তিনি গোটা ব্যাপারটা অস্বীকার করে যাবেন। অর্থাৎ তিনি যে আমাদেরকে তাঁর স্ত্রীর পেছনে কাজে লাগিয়েছিলেন তা স্বীকার করবেন না।'

শহীদ চোখ খুলল। মহুয়ার হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে চুমুক দিল ছোট্ট করে, বলল, 'এই রকম বলবেন আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাক, কথা যখন দিয়েছি তখন যতক্ষণ সম্ভব রক্ষা করতে হবে। যদিও, খুন হলেও পুলিসের কাছে মুখ খুলতে পারব না তেমন কথা আমি দিইনি। তবে এটা কোন সমস্যা নয়। আমাদের সামনে একটাই কাজ, খুনীকে খুঁজে বের করা।'

'স্পষ্ট নয় কিছু এখনও। হয়তো মিসেস রাফিয়াকে যে ব্ল্যাকমেইল করছে শিল্পী তাকে চিনে ফেলায় সে শিল্পীর মুখ বন্ধ করার জন্যে খুন করেছে।'

'শিল্পী···মানে, কিভাবে খুন হয়েছে ও?'

'কপালের উপরে, ·৪৫ পিস্তলের গুলি, পনেরো গজ দূর থেকে ছোঁড়া হয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ওর পরনের সব কাপড়চোপড় খুনী খুলে নিয়ে গেছে কেন?'

কামাল বলল, 'পনেরো গজ দূর থেকে—তার মানে, গুলি করতে অভ্যস্ত, খুবই পটু খুনী।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। পাকা হাতের কাজ।'

'আমাদের প্রথম পদক্ষেপ কি হবে তাহলে?'

কামালের প্রশ্নের উত্তরে শহীদ বলল, 'আমি এখুনি মিসেস রাফিয়ার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।'

মহুয়া বলল, 'মাত্র সাড়ে পাঁচটা বাজে···।'

কামাল মহুয়াকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বলে উঠল, 'মিসেস রাফিয়ার সাথে দেখা হবে না, শহীদ। সে নেই।'

'নেই! নেই মানে?'

কামরার ভিতর যেন বোমা ফাটল।

কামাল বলল, 'আমিই দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোয়াব খান প্রত্যাখ্যান করেছেন। বললেন, এই মুহূর্তে শহর থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছেন তিনি মিসেস রাফিয়াকে। এতক্ষণে বোধহয় চলে গেছে সে।'

শহীদ জোর দিয়ে বলল, 'যেখানেই যাক, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। খুনীকে সে চেনে।'

কামাল বলল, 'ঠিক এই কথাই আমি তোয়াব খানকে বলেছি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য, মিসেস রাফিয়া এ সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানে না—এবং তার সাথে আমরা যদি দেখা করার চেষ্টা করি তাহলে তার জন্যে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।'

শান্ত গলায় বলল শহীদ, 'জবাবদিহি আমরা দেব না, নেব। মিসেস রাফিয়াকে খুঁজে বের করব আমরা।'

কামাল বলল, 'ব্ল্যাকমেইলারই যে খুনী তা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায় না, শহীদ। একমাত্র তোয়াব খানের কাছ থেকে ধারণাটা পেয়েছি আমরা যে, একজন ব্ল্যাকমেইলারের অস্তিত্ব আছে। মিসেস রাফিয়া গত মাসে মোটা অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিল—সেটা কোন ব্ল্যাকমেইলারকে দেবার জন্যে নাও হতে পারে। মিসেস রাফিয়া হয়তো কারও সাথে গোপনে প্রেম করছে, তাকে সাহায্য করার জন্যও তো টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারে?'

শহীদ প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'তোয়াব খানের মেয়ে ঋতুর সাথে কথা বলতে হবে। মিসেস রাফিয়াকে মোটেই পছন্দ করে না সে।'

কামাল বলল, 'ঠিক বলেছিস। আর কার কাছে যাচ্ছি আমরা?'

'শিল্পীর ভ্যানিটি ব্যাগটা যে পেয়েছে—লোকটার নাম দেলোয়ার মোরশেদ। ঠিক বুঝতে পারছি না সরাসরি তার সাথে দেখা করে কথা বলব, না মি. সিম্পসনের কাছ থেকে জেনে নেব তার বক্তব্য। আমরা যদি লোকটার সাথে দেখা করি তাহলে মি. সিম্পসনের সন্দেহ ঘনীভূত হবে। অপরদিকে লোকটাই হয়তো মি. সিম্পসনকে এমন সব তথ্য দেবে যা পেয়ে তিনি অনেক কিছু বুঝে ফেলবেন। লোকটা হয়তো যা বলেছে তার চেয়ে বেশি কিছু জানে।'

কামাল বলল, 'আমার তা মনে হয় না।'

শহীদ বলল, 'এদিকে, সাধন সরকারের ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের। শিল্পীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গোপনে প্রেম চলছে সাধন সরকারের সাথে মিসেস রাফিয়ার। সাধন সম্পর্কে খোঁজ নেব আমি।'

কামাল বলল, 'সত্যি যদি কোন ব্ল্যাকমেইলার থেকে থাকে, আমার ধারণা সে কাজী হানিফ ছাড়া আর কেউ নয়। বৈধ কোন কাজ আজ পর্যন্ত করেনি সে। মিসেস রাফিয়া কেন, কি এমন জরুরী ব্যাপারে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল? এই দেখা করার কারণটা জানতে পারলে অনেক রহস্য সমাধান হয়ে যাবে বলে মনে করি আমি।'

শহীদ বলল, 'তুই মিসেস রাফিয়ার অতীত জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবি।

আমি যাচ্ছি ঋতুর সাথে কথা বলতে।'

পদশব্দ কানে ঢুকল ওদের।

জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দিনের প্রথম আলো ঢুকছে। ম্লান, নিষ্প্রভ আলো। সূর্য ওঠেনি এখনও।

জামানকে দেখা গেল দোর-গোড়ায়।

শহীদ বলল, 'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি, জামান।'

এতক্ষণ নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখতে পেরেছিল জামান। কিন্তু শহীদকে দেখে বুক ঠেলে কান্না উঠে এল। ঢোক গিলল ঘন ঘন, ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল।

মহুয়া নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল, 'এসো, জামান, তোমার জন্যে কফি রেখেছি।'

দ্রুত সামলে নিল জামান নিজেকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, ডান হাতটা ঢুকে গেল প্যান্টের পকেটে। শহীদের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাতটা বেরিয়ে এল পকেট থেকে। বলল, 'শিল্পীর রিপোর্ট বুক এবং এই নেকলেসটা ওর ফ্ল্যাট থেকে পেয়েছি। শিল্পীর নয় নেকলেসটা, কিন্তু কার তা জানি না···।'

জামান ঝুলিয়ে ধরেছে দামী পাথর বসানো একটা নেকলেস শহীদের সামনে। দেখেই চিনতে পারল শহীদ। মিসেস রাফিয়ার নেকলেস এটা।

নেকলেসটা হাত বাড়িয়ে নিল শহীদ, পরীক্ষা করতে করতে প্রশ্ন করল, 'ওর ফ্ল্যাটের কোথায় পেয়েছ এটা?'

'কার্পেটের নিচে। ওর বেডরুমের কোন জায়গা পরীক্ষা করতে বাকি রাখিনি। সবশেষে কার্পেট তুলে মেঝেটা দেখতে চেষ্টা করি। অমন তন্ন তন্ন করে কি যে খুঁজছিলাম আমি নিজেই তা জানি না। যাক, কার্পেটটা তুলতেই ওটা দেখতে পেলাম। আর একটু হলেই ইন্সপেক্টর গনির হাতে পড়ে যেত এটা। কয়েক সেকেণ্ড পরই তিনি হাজির হন। সব কথা ওঁর কাছ থেকেই শুনেছি আমি।'

'তোয়াব খান সম্পর্কে ইন্সপেক্টর গনিকে···।'

'না, কিছু বলিনি। তাঁর কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিইনি আমি।'

শহীদ বলল, 'গুড। এটা মিসেস রাফিয়ার নেকলেস, সন্দেহ নেই।'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

শহীদ গত রাত্রের ঘটনাটার কথা বিশদভাবে জানাল ওদেরকে। সবশেষে বলল, 'এই নেকলেসটাই তখন তার গলায় দেখেছিলাম আমি। এটার দাম হবে কমপক্ষে চল্লিশ হাজার টাকা। জামান, শিল্পীর মুভমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব তোমার ওপর। গুলিবিদ্ধ হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, যদি সম্ভব হয়। নেকলেসটা ওর বেডরুমে গেল কিভাবে জানতে হবে আমাদের। ফেয়ার ভিউ নাইট ক্লাবের গেটম্যানের সাথে দেখা করে জানার চেষ্টা করবে শিল্পীকে সে দেখেছিল কিনা। তবে, সাবধান, তোয়াব খান সম্পর্কে কাউকে কিছু বোলো না। ওদের ব্যাপারটা আমরা পুলিসের কাছে চেপে যাচ্ছি। জামান, বলতে পারো শিল্পীর পরনে কি ছিল?'

জামান বসল মহুয়ার পাশে। মহুয়ার হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে তেপয়ের উপর নামিয়ে রাখল, শহীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর ওয়ারড্রোব খুলে যা দেখলাম, তাতে মনে হলো লাল জর্জেটের শাড়িটা ছিল ওর পরনে।'

কামাল বলল, 'ওর পরনের পোশাক নিয়ে গেছে খুনী—এটা সবচেয়ে বড় রহস্য।'

শহীদ বলল, 'কামাল, এতক্ষণ ধরে ভাবনা-চিন্তা করেও একটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না। ব্ল্যাকমেইলার লোকটা, যেই হোক সে, খুন করতে পারে শিল্পীকে—বলেছিলাম। কিন্তু কেন, কেন খুন করবে সে? মিসেস রাফিয়ার চুরি করার বদভ্যাস আছে, কেউ সেটা জানে। এবং সে জানে বলেই মিসেস রাফিয়াকে ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগ পাচ্ছে। ব্ল্যাকমেইলারকে ধরা যাক, শিল্পী চিনে ফেলেছিল। কিন্তু তাতে কি? ব্ল্যাকমেইলার শিল্পীকে ভয় করবে কেন? শিল্পী তার কি ক্ষতি করতে পারত? পুলিসকে খবর দিতে পারত শিল্পী, তোয়াব খানকে জানাতে পারত—কিন্তু ব্ল্যাকমেইলারের কি ক্ষতি হত তাতে? সে মিসেস রাফিয়াকে ব্ল্যাকমেইলিং করছে এর কোন প্রমাণ কারও কাছে নেই। মিসেস রাফিয়া, স্বভাবতই নিজের দুর্বলতার জন্যে, ব্ল্যাকমেইলিংয়ের কথা স্বীকার করবে না কোনদিন। ব্ল্যাকমেইলারের ভয়টা তাহলে কোথায়? কেন সে শিল্পীকে খুন করতে যাবে?'

কামাল বলল, 'তোর কথায় যুক্তি আছে। আমিও তোর সাথে একমত, ব্ল্যাকমেইলার খুন করেনি শিল্পীকে।'

জামান বলল, 'মিসেস রাফিয়া এবং সাধন সরকার গোপনে প্রেম করছে। সাধন সরকার হয়তো টের পেয়ে যায় শিল্পী তাদের সম্পর্কটা জেনে ফেলেছে, তাই সে…।'

শহীদ বলল, 'অসম্ভব! আমিও এমন বোকা হয়ে গিয়েছিলাম যে প্রথমে ওই কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এও সম্ভব নয়। শিল্পীকে খুন করে কি লাভ সাধন সরকারের? প্রচুর টাকার মালিক সে, তাই না? ওরা যদি পরস্পরকে সত্যি ভালবাসে তাহলে মিসেস রাফিয়ার করণীয় মাত্র একটাই, তোয়াব খানকে ডাইভোর্স করে সাধন সরকারকে বিয়ে করা। সাধন সরকার খুন করবে কেন শিল্পীকে?'

কামাল বলল, 'আমরা ড্রয়িংরুমে বসে আলোচনার মাধ্যমে একটা উপসংহারে পৌঁছুতে চাইছি। কোন লাভ হবে না। শিল্পী মিসেস রাফিয়ার উপর নজর রাখছিল, সত্যি কথা, কিন্তু খুন হয়েছে সে মিসেস রাফিয়ার সাথে সম্পর্কিত কোন কারণে—এমন নাও হতে পারে।'

শহীদ বলল, 'একি বলছিস তুই? শিল্পীর কোন শত্রু নেই এ তো আমরা সবাই জানি। তাছাড়া, মিসেস রাফিয়াকে অনুসরণ না করলে অত রাতে শিল্পী কি করছিল লেকের ধারে?'

কামাল পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোর হাতে কোন প্রমাণ আছে, মিসেস রাফিয়াকে সেই সময় অনুসরণ করছিল শিল্পী?'

শহীদ বলল, 'না, তেমন কোন প্রমাণ নেই।'

কামাল উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা! নতুন একটা চিন্তা আসছে মাথায় শহীদ, মিসেস রাফিয়া শিল্পীকে খুন করেছে কিনা ভেবে দেখেছিস?'

শহীদ উৎসাহ দেখাল না। বলল, 'দেখেছি। ·৪৫-এর মত বড় পিস্তল কোন মেয়ে ব্যবহার করে না।'

কামাল বলল, 'আর কোন দিক বিবেচনা করার আছে? নেকলেসটা! ওটা গেল কিভাবে শিল্পীর বেডরুমে?'

শহীদ বলল, 'অনেক ভাবে যেতে পারে। শিল্পীর হত্যাকাণ্ডের সাথে মিসেস রাফিয়াকে জড়াবার জন্যে কেউ ষড়যন্ত্র করে ওটা ওখানে গোপনে রেখে আসতে পারে। ষড়যন্ত্রকারী হয়তো ভেবেছিল ওটা পুলিসের চোখেই পড়বে।'

কামালকে উৎসাহিত হয়ে উঠতে দেখা গেল, 'সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র কে করতে পারে—তুই কি ঋতুর কথা ইঙ্গিত করছিস?'

'ঋতুর সাথে মিসেস রাফিয়ার সম্পর্ক ভাল নয়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।'

'কিন্তু ঋতু হাঁটতে পারে না—সে পঙ্গু! সে শিল্পীর তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠবে কিভাবে?'

'নিজে কেন, লোককে দিয়ে করাতে পারে কাজটা। গতরাত এগারোটা থেকে তিনটের মধ্যে শিল্পীর ফ্ল্যাটে কেউ গিয়েছিল কিনা খোঁজ নিতে হবে, জামান। সাড়ে দশটা পর্যন্ত মিসেস রাফিয়া আমার চেম্বারে ছিল। তখনও নেকলেসটা দেখেছি আমি। সুতরাং এগারোটার আগে ওটা শিল্পীর বেডরুমে যেতে পারে না।'

মিনিট পনেরো আরও আলাপ হলো ওদের মধ্যে। এক সময় শহীদ উঠে দাঁড়াল।

'যাচ্ছিস তুই?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। তোরাও বেরিয়ে পড়। লাঞ্চের সময় সবাই মিলিত হব আমরা অফিসে।'

মহুয়া বলল, 'কিন্তু তোমরা কেউ ব্রেকফাস্ট না করে···।'

শহীদ বলল, 'ব্রেকফাস্ট করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

বেরিয়ে গেল ও ড্রয়িংরুম থেকে।

চার

মুক্তা নিকেতনের প্রধান পথের বাইরে একটা গার্ড গোলপোস্টে গোলকীপারের মত পায়চারি করছিল বিরতিহীন ভাবে।

দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মত প্রকাণ্ড লোহার গেটটা বন্ধ। গাড়িতে বসে দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে বেশ একটু দমেই গেল শহীদের বুক। ওর ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগেনটাকে এগোতে দেখে গার্ড পায়চারি থামিয়ে দেহটাকে টান টান করে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'পা ফাঁক করে, কোমরে হাত রেখে মাথাটা বেশ একটু ডান দিকে

কাত করে চেয়ে আছে সে।

বটলগ্রীন রঙের ইউনিফর্ম পরনে লোকটার, ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি হলুদ রঙের শিরস্ত্রাণ। শিরস্ত্রাণের স্ট্র্যাপটা চিবুকের সাথে জড়ানো। স্ট্র্যাপটা নরম নাইলন দিয়ে তৈরি, সেটা মুখে পুরে দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে অকারণে। লোকটার বয়স হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। দর্শনীয় পেশীবহুল দেহ। নিয়মিত ব্যায়াম করে, বোঝা যায়। অস্বাভাবিক, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ছাপ চোখে মুখে। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। দুঃসাহসের কমতি নেই। যে-কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে এক পায়ে খাড়া। লোকটাকে দেখে পছন্দ হলো না শহীদের।

কয়েক গজ দূরে গাড়ি দাঁড় করাল শহীদ। স্টার্ট বন্ধ করে নিচে নামল। গার্ডটা চেয়ে আছে। হাসি হাসি ভাব তার মুখে। কিন্তু হাসিতে অন্তরঙ্গতার বদলে ব্যঙ্গ ফুটে রয়েছে।

লোকটার নিঃশব্দ আচরণে একটা চ্যালেঞ্জের ভাব উৎকট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। শহীদ পরিস্থিতিটা অনুধাবন করতে পারলেও, পরিবেশটা হালকা করার জন্যে খুবই নরম এবং স্বাভাবিক গলায় বলল, 'গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢোকা যাবে? নাকি হেঁটে যেতে হবে?'

সবুজ ইউনিফর্মের বড় বড় সোনালি বোতামগুলো রোদ লেগে চকচক করছে। দেহটা বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে বলে তার হিপ পকেটে উঁচু হয়ে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রটার অস্তিত্ব টের পেতে অসুবিধে হলো না শহীদের। হাতের কালো তেল-চকচকে একহাত লম্বা রুলটা দিয়ে নিজের উরুতে সশব্দে একটা বাড়ি মারল লোকটা।

'কি বলা হলো? আবার একবার শুনতে চাই!' লোকটা কথা বলল না, ঠিক যেন ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরের মত।

রিপিট করল শহীদ ওর কথাটা।

নাইলনের ফিতেটা চিবুতে চিবুতে শহীদকে আপাদমস্তক দেখতে লাগল গার্ড। বেশ খানিকক্ষণ সময় নিল সে। পকেটে হাত ভরে চোখ সরিয়ে তাকাল শহীদের গাড়িটার দিকে। একটা সিগারেট কেস বের করল ধীরে ধীরে পকেট থেকে। সাথে একটা লাইটার। কেসটা সোনালি রঙের। লক্ষ করে শহীদ বুঝল ওটা সত্যিকার সোনার।

কেসটা খুলে আলতোভাবে একটা ফিলটার টিপড সিগারেট বের করে গ্যাস লাইটার জ্বালাল গার্ড। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে লাইটার বন্ধ করে ছুঁড়ে দিল আকাশের দিকে, মুখ তুলে দেখতে লাগল সেটাকে, কিন্তু একেবারে মাথার কাছে নেমে না আসা পর্যন্ত সেটাকে লুফে নেবার জন্য হাত তুলল না।

লাইটারটা খপ্ করে শূন্য থেকে ধরে সরাসরি শহীদের দিকে তাকাল সে। বলল, 'কেটে পড়ো—কারও সাথে দেখা হবে না!'

এ লোক গার্ড নয়, গার্ডের ভূমিকায় অভিনয় করছে। শহীদ দ্রুত ভেবে নিল কয়েকটা কথা। পকেটে সোনার সিগারেট কেস, গ্যাস লাইটার, চোখেমুখে ড্যাম-

কেয়ার ভাব, কথায়-বার্তায় অভদ্র—এ লোক দারোয়ান হতে পারে না। এ লোককে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বাড়ির ভিতরে কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

তবু চেষ্টা করতে হবে। শহীদ বলল, 'তোমার মালিককে গিয়ে বলো শহীদ খান এসেছেন। জরুরী ব্যাপার। নাম শুনলেই দেখা করবেন তিনি।'

'না। কেটে পড়তে বলেছি, কেটে পড়ো। বাড়িতে কেউ নেই।' কথাগুলো বলে একটা পাথরের টুকরোয় লাথি মারল আস্তে করে। পাথরের টুকরোটা গড়াতে গড়াতে শহীদের পায়ের কয়েক ইঞ্চি দূরে এসে থামল। চোখ তুলে তাকাল সে শহীদের দিকে।

শহীদ ভাব দেখাল ব্যাপারটা যেন লক্ষই করেনি সে। বলল, 'সময় নষ্ট করলে তোমার মালিকই বিপদে পড়বেন। তাঁকে গিয়ে বলো হয় আমার সাথে দেখা করতে হবে, নয়তো পুলিসের সাথে। এমনই জরুরী ব্যাপার।'

'প্যাচাল বন্ধ করো! যাও ভাগো! বললাম না, কেউ নেই? মি. তোয়াব খান ঘন্টাখানেক আগে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন তাও জানি না। হয়তো বিদেশে গেছেন। মোটকথা—সুবিধে হবে না, ভাগো।'

আর কোন কথা বলল না শহীদ। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল ও। চলতে শুরু করল গাড়ি। ভিউ মিররে তাকিয়ে দেখল, গার্ডটা দাঁত বের করে কুৎসিত ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে। সর্ব শরীরে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করল শহীদ।

মুক্তা নিকেতনের পাঁচিল ঘেঁষে পঞ্চাশ গজের মত যাবার পর বাঁক নিল শহীদের ফোক্সওয়াগেন। শেষবার ভিউ মিররে তাকাতে শহীদ দেখল গার্ডটা গেট খুলে ভিতরে ঢুকছে। ভিতরে ঢুকে তালা লাগিয়ে দিল আবার। অদৃশ্য হয়ে গেল গার্ডরুমের ভিতর।

বাঁক নিয়ে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্টার্ট বন্ধ করল শহীদ। নিচে নেমে মুক্তা নিকেতনের উঁচু পাঁচিলের দিকে তাকাল। আট ফুট উঁচু পাঁচিল। লাফ দিয়ে পাঁচিলের মাথা ধরে ফেলল ও। পাঁচিলে পা ঠেকিয়ে অনায়াসে উঠে পড়ল উপরে।

বিস্তীর্ণ মাঠ দেখা যাচ্ছে। মাঠের পর গাছপালা, বাগান। প্রধান প্রবেশ পথ, রানওয়ের মত চওড়া সড়ক, পুল বিল্ডিংটা বা গার্ড রুম কিছুই চোখে পড়ল না।

লাফ দিয়ে নেমে দ্রুত এগোল শহীদ বাগানের দিকে।

মিনিট তিনেক পর বাগানে ঢুকল ও। কোথাও জনমনিষ্যির সাড়া নেই। নিঃশব্দ পায়ে এগোতে এগোতে কংক্রিটের রাস্তায় উঠে থামল ও। ডান পাশে দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত চত্বরটা। গত পরশুদিন সকালে এই চত্বরে কয়েকটা গাড়ি এবং দু'জন শোফারকে দেখেছিল ও। এখন গাড়ি বা শোফার কিছু নেই, কেউ নেই।

বিল্ডিংটার দরজাটা দেখা যাচ্ছে দূরে। পা বাড়াল শহীদ। কাঁচের শার্সিগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েও প্রাণের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না ও। হাঁটতে হাঁটতে ঋতুর কথা মনে পড়ল। কংক্রিটের চওড়া পথের পাশে বাগানের ভিতর ফাঁকা একটা জায়গায় প্রথমদিন বসে থাকতে দেখেছিল তাকে। কিন্তু আজ তাকে

দেখতে পাবার আশা কম। ধনী লোকের মেয়ে, এত সকালে ঘুমই ভাঙে না।

তা ছাড়া, বাড়িতে হয়তো সত্যিই কেউ নেই। মিসেস রাফিয়াও সম্ভবত নেই। তবে বলা যায় না, আত্মগোপনের নিরাপদ জায়গা এই বাড়ির চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে?

বাগানের ফাঁকা জায়গাটার কাছে পৌঁছে গেল শহীদ।

গাঢ় নীল রঙের জাপানীদের জাতীয় পোশাক কিমানোয় ভারি মানিয়েছে। যদিও, মুখের সর্বত্র বিষাদের একটা করুণ ছায়া লক্ষ করল শহীদ। হুইল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, চোখের দৃষ্টি নিজেরই পায়ের কাছে ঘাসের উপর। পাশে একটা ট্রলি, তার ওপর ব্রেকফাস্টের ট্রে। হাতে একটা বাটারটোস্ট। কিন্তু সেটা ধরেই রেখেছে শুধু, খেতে যেন ভুলে গেছে।

শহীদের ছায়াটা তার পায়ের কাছে গিয়ে পড়তে অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া হলো তার মধ্যে। মুচকি একটা হাসি ফুটল ঠোঁটে। কিন্তু মাথা তুলল না। শুধু চোখের পাতা দুটো উপরে উঠল।

ছোঁ মেরে কেউ যেন কেড়ে নিল ঋতুর ঠোঁটের হাসিটা। একই সাথে তার হাতের বাটারটোস্টটা পড়ে গেল পায়ের কাছে। কেউ যেন ধাক্কা দিল পিছন থেকে, সিধে হয়ে গেল পিঠটা।

'কেমন আছ, ঋতু? চিনতে পারো আমাকে?'

'কে! কে আপনাকে ঢুকতে দিল এখানে?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ঋতু।

শহীদ বলল, 'তোমার বাবার সাথে জরুরী একটা ব্যাপারে দেখা করতে এসেছি। বাড়িতে আছেন তিনি?'

'ইয়াকুব কোথায়! কে ঢুকতে দিল আপনাকে?' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ছে শহীদের। এতটুকু মেয়ে তার এত রাগ!

'ইয়াকুব কে, ঋতু? ও তো গার্ড নয়। কে ও?'

ঋতু চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমি জানতে চাইছি কিভাবে আপনি ঢুকেছেন?'

'পাঁচিল টপকে। উপায় ছিল না, ঋতু। তোমাদেরই স্বার্থে কাজটা করতে হয়েছে। হয় তোমার বাবার সাথে নয়তো মিসেস রাফিয়ার সাথে দেখা করতে হবে আমাকে। মিসেস রাফিয়ার ডায়মণ্ড বসানো নেকলেসটা ফেরত দিতে এসেছি আমি।'

'যান আপনি!' অন্যদিকে ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিল ঋতু।

শহীদ শান্ত ভাবেই কথা বলছে, 'কিন্তু নেকলেসটার কি হবে? গুরুত্বটা বুঝতে পারছ না? তোমার বাবা মিসেস রাফিয়ার মুভমেন্টের উপর নজর রাখার জন্য আমার এক সহকারিণীকে নিয়োগ করেছিলেন। আমার সহকারিণী গতরাতে খুন হয়েছে। মিসেস রাফিয়ার নেকলেসটা পাওয়া গেছে তার রুমে।'

বিরক্তি এবং ক্রোধের চিহ্ন দূর হয়ে গেল ঋতুর চোখ মুখ থেকে। নির্বিকার দেখাল তাকে। কিন্তু মনের ভিতর তীব্র ঝড় বইতে শুরু করেছে, আঁচ করতে পারল শহীদ।

'আমি রাফিয়া সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড নই। আপনি যান।' আগের চেয়ে অনেক সংযত কণ্ঠস্বর।

'পুলিস নেকলেসটা পায়নি, পেয়েছি আমরা। আমি ভেবেছিলাম এ খবরটা তোমাকে আলোড়িত করবে। সে যাই হোক, মিসেস রাফিয়াকে পাব কোথায় বলো তো? খবরটা পেলে তিনি স্বস্তি পেতেন।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল শহীদ, কিন্তু ঋতুর নির্বিকার মুখ দেখে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারল না ও।

'আপনি যান!'

'কিন্তু···।'

কর্কশ শোনাল সরু কণ্ঠস্বর, 'বলছি আপনি যান!'

শহীদ বলল, 'কি আশ্চর্য, তুমি দেখছি কাঁপছ! এত রেগে উঠছ কেন বলো তো···?'

'এখনও সরে যান বলছি!'

শহীদ শ্রাগ করল। বলল, 'আমি তোমাদের বাড়িতে ঢুকছি, ঋতু। তুমি বা তোমার—কি যেন নাম···ইয়াকুব, আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না।'

'ভাল করছেন না! এই শেষবার বলছি, বেরিয়ে যান!'

পিছন থেকে দাঁতে দাঁত চেপে কে যেন বলে উঠল, 'ওরে আমার শালা! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!'

ঝট্ করে পিছন দিকে তাকিয়ে শহীদ দেখল, ইয়াকুব অর্থাৎ ইউনিফর্ম পরা গার্ডটা দুই হাতের মুঠি পাকিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি চলে এসেছিল সে শহীদ ঘুরে তাকাতেই ডান হাত তুলে শহীদের নাক বরাবর প্রচণ্ড একটা ঘুসি ছুঁড়ল সে।

আশ্চর্য শান্ত নিপুণ ভঙ্গিতে পরিস্থিতির মোকাবেলা করল শহীদ। অল্প, মাত্র এক সেকেণ্ড সময় পেল ও। ঘুসিটা বিদ্যুৎবেগে মুখের দিকে ছুটে আসছে দেখে ডান হাত তুলে খপ্ করে ইয়াকুবের হাতটা কব্জির কাছে ধরে ফেলল ও। ডান পা ইতিমধ্যেই তুলে ফেলেছিল, সেটা বাঁকা করে ইয়াকুবের হাঁটুর পিছনে ধাক্কা মারল।

বাঁ পা-টা ভাঁজ হয়ে গেল ইয়াকুবের হাঁটুর কাছে, শহীদ সেই সময় তার হাতটা মুচড়ে ধরল দুই হাত দিয়ে। তারপর ছেড়ে দিয়ে এক লাফে সরে গেল একপাশে।

তাল হারিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল ইয়াকুব কংক্রিটের উপর। ঘটনাটা চোখের পলকে, অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল। ব্যথা খুব একটা পায়নি ইয়াকুব, কিন্তু ধরাশায়ী হয়ে বোকা বনে গেছে সে।

মুখ ফিরিয়ে ঋতুর দিকে তাকাল শহীদ। একটু হাসল কি হাসল না, বলল, 'তোমার ব্যাপারটা কি? অসুস্থ নাকি? বিপদের গুরুত্ব বোঝো না, তেমন ছোট তো নও তুমি। এই শেষবার বলছি, মিসেস রাফিয়া কোথায় আছেন বলো আমাকে। বিপদটা তোমাদের, সুতরাং···।'

ঋতু শহীদের শেষের দিকের কথাগুলো শুনছিল না, সে তাকিয়ে ছিল

ইয়াকুবের দিকে। তার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে শহীদ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

উঠে দাঁড়িয়েছে ইয়াকুব। ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে গেছে, সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে ভিতরে। হাঁপাচ্ছে সে, শব্দ পাচ্ছে শহীদ। ইয়াকুবের হাতের উদ্যত নীল রঙের রিভলভারটার দিকে আড়চোখে তাকাল ও একবার।

·৪৫, কোন সন্দেহ নেই।

ঋতু বলে উঠল, 'না।'

ইয়াকুব হুঙ্কার ছাড়ল, 'এবার? বল্ শালা…'

ঋতুর গলায় কঠিন আদেশের স্বর প্রকাশ পেল, 'ইয়াকুব, স্টপ ইট! ওকে বাড়ির বাইরে দিয়ে এসো—তার বেশি কিছু চাই না আমি।'

'আয় শালা…!' রিভলভার নেড়ে এগোবার নির্দেশ দিল ইয়াকুব।

একটা কথাও বলল না শহীদ। অশ্লীল ভাষায় কেউ ওকে গালিগালাজ করবে আর ও তা সহ্য করবে তা ভাবাই যায় না। কিন্তু ইয়াকুবের মধ্যে কোথাও কোন গোলমাল আছে, তার পদ এবং আচরণে ঠিক মিলছে না—তাছাড়া, লোকটার লালচে চোখ দুটো রক্তের পিপাসায় চকচক করছে। সুযোগ পেলেই গুলি করবে সে। এইসব কথা ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলভারটা কেড়ে নেবার উগ্র ইচ্ছেটাকে গলা টিপে হত্যা করল শহীদ।

বিনাবাক্যব্যয়ে পা বাড়াল সে। নিজেকে ক্ষান্ত রাখতে সমর্থ হলেও শরীরের প্রতিটি লোমকূপ জ্বালা করতে শুরু করেছে ওর। এই কুকুরটাকে উপযুক্ত সাজা দেবে ও। সময় আসুক।

ইয়াকুব বোকা নয়। শহীদকে অনুসরণ করছে সে, কিন্তু যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। গেট পর্যন্ত এসে দাঁড়াল শহীদ। তালার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরেই দাঁড়াল। চাবি দিয়ে তালা খোলার সময় শহীদের দিকে চেয়ে রইল ইয়াকুব।

গেট খোলা হতে শহীদ পা বাড়াল। ইয়াকুব পা তুলে সবেগে লাথি চালাল পিছন থেকে।

তৈরিই ছিল শহীদ। জানত মনে মনে, এই রকম একটা কিছু ঘটবে। ইয়াকুব পা তুলতেই বিদ্যুৎচালিত চরকির মত ঘুরে গেল ওর গোটা দেহটা।

ইয়াকুবের লাথি লাগল শহীদের উরুর উপর, একই সময়ে শহীদের আড়াইমন ওজনের ঘুসিটা লাগল ইয়াকুবের মুখের উপর, নাকের পাশে।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। ইয়াকুব টলছে। সেই সুযোগে শহীদ তার তলপেট লক্ষ্য করে লাথি মারল।

দুই হাত দিয়ে তলপেট চেপে ধরল ইয়াকুব, বাঁকা হয়ে গেল দেহটা। সশব্দে পড়ল তিন হাত পিছনের পাকা চত্বরের উপর।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ইয়াকুবের রিভলভার ধরা হাতটায় লাথি মারল আবার শহীদ। রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল বাগানের ভিতর।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল শহীদ। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে ফিরে এল শহীদ। দরজা খুলে চড়ে বসল সীটে।

পকেট থেকে পাইপ এবং টোবাকোর কৌটা বের করল। আড়চোখে তাকাল একবার ভিউ মিররের দিকে। চোখে মুখে উত্তাপ অনুভব করছে ও। দেখল, মুখটা লাল হয়ে রয়েছে।

পাইপে টোবাকো ভরে অগ্নিসংযোগ করল ধীরে ধীরে। চিন্তা করল খানিকক্ষণ ধূমপান করতে করতে। তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে।

প্রায় ফাঁকা রাস্তা। স্পীড বাড়িয়ে দিল শহীদ। স্পীডমিটারের কাঁটা পঞ্চান্নর ঘরে পৌঁছেছে। এমন সময়, কিছু বোঝার আগেই, যাদুমন্ত্রের মত, একটা মার্সিডিজ গাড়ি পিছন থেকে চোখের পলকে ওর ফোক্সওয়াগেনের পাশে চলে এল।

পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে ফেলেছে শহীদ। মার্সিডিজের জার্মান চালক একা তার গাড়িতে, শহীদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

চেহারাটা সম্পূর্ণ অচেনা বলে মনে হলেও হাসিটা দেখে কুয়াশাকে চিনতে পারল শহীদ।

ব্রেক কষে ধীরে ধীরে দাঁড় করাল ও ফোক্সওয়াগেনকে। মার্সিডিজও দাঁড়াল পাশে।

'দুঃসংবাদটা শুনেছি, শহীদ। কোথাও মারাত্মক একটা ভুল করেছিল শিল্পী।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। তা না হলে…।'

কুয়াশা বলল, 'কে দায়ী?'

'তদন্ত শুরু করেছি মাত্র, এখনও বুঝতে পারছি না।'

কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, 'আমার সাহায্য দরকার বলে মনে করো?'

শহীদ বলল, 'এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধহয় দরকার হবে না। আচ্ছা, তোয়াব খানের বাড়ির গার্ড ইয়াকুব, ওর সম্পর্কে জানো কিছু?'

'ইয়াকুব? তুমি শান্তিনগরের রয়েল জিমনেশিয়ামের সেক্রেটারি ইমদাদুল হকের সাথে যোগাযোগ করলেই ওর সম্পর্কে জানতে পারবে। আর কিছু?'

শহীদ বলল, 'না। কিন্তু একটা ব্যাপার, তুমি কি মনে করে তোয়াব খানের কেসটা নিতে বলেছিলে বলো তো আমাকে?'

কুয়াশা বলল, 'আমার এক বন্ধুকে ধরেছিল তোয়াব খান। সে তোয়াব খানেরও বন্ধু। সেই বন্ধু ফোন করে তোমাকে রাজি করাবার জন্যে অনুরোধ করে আমাকে। কিন্তু—দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রয়োজন নেই, শহীদ। কেউ যদি অপরাধী হয়, সে তোয়াব খান হোক বা আর কেউ, ছেড়ে কথা বলবার দরকার নেই। তবে, নিরপরাধ হলে, তার সম্মানটা যাতে রক্ষা পায় সে ব্যবস্থা কোরো। আর সাহায্যের দরকার হলে আমাকে শুধু জানিয়ো, কেমন?'

শহীদ মাথা একটু কাত করে জানাল, 'আচ্ছা।'

গাড়ি ছেড়ে দিল কুয়াশা, সাঁ করে নিক্ষিপ্ত রকেটের মত ছুটে গেল মার্সিডিজ। দেখতে দেখতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

রয়েল জিমনেশিয়ামের সেক্রেটারি ইমদাদুল হকের সাথে পরিচয় নেই শহীদের। কামালের সাথে পরিচয় আছে। শহীদ ঠিক করল, কামালকেই পাঠাবে ও ইয়াকুব

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে।

অফিসে ফিরে এল ও। কামাল আগেই পৌঁছেছে। বলল, 'দেলোয়ার মোরশেদ লোকটা…।'

শহীদ বলল, 'পরে শুনব। আগে আমার কথা শোন। মুক্তা নিকেতনের গার্ড লোকটা…'

শহীদ ঘটনাটা বর্ণনা করল।

'বলিস কি!'

শহীদ বলল, 'ইয়াকুবের আসল পরিচয় কি তাই আমি জানতে চাই। এখুনি বেরিয়ে পড় তুই। ইমদাদুল হক তোর বন্ধু, সে লোকটা সম্পর্কে সব জানে।'

কামাল বলল, 'এখুনি যাচ্ছি আমি।'

পাঁচ

চারদিক কাঁপিয়ে দিয়ে ছুটল কামালের মটর সাইকেল। পাঁচ মিনিট পর রয়েল জিমন্যাসিয়ামের গেটের সামনে থামল সেটা।

স্টার্ট বন্ধ করে নামল কামাল। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল। সবুজ ঘাস বিছানো মাঝারি একটা উঠান, দক্ষিণ দিকে লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা পঞ্চাশ গজ লম্বা ব্যায়ামাগার। উত্তরে বাগান। পশ্চিমে দোতলা, ছোট বিল্ডিং। বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে ফাঁকা খানিকটা জায়গা।

ব্যায়ামাগারের ভিতর একদল যুবক রয়েছে, কিন্তু সংখ্যায় কম। সাধারণত বিকেলের পর ভিড় জমে। ছেলেদেরকেই দেখল কামাল, কোন মেয়ের ছায়া পর্যন্ত নেই।

অথচ শুনেছিল, মেয়েরাও ইদানীং চর্চা করছে।

বিল্ডিংটার এক তলার কয়েকটা কামরা ব্যবহার করা হয় ইন-ডোর স্পোর্টসের জন্যে। রয়েল জিমনেশিয়াম আসলে এই এলাকার একটা সাধারণ ক্লাব। টেবিল-টেনিস, ক্যারাম, কার্ড, দাবা—সবই চলে।

কয়েকটা রুমে উঁকি দিয়ে তাকাল কামাল। রীটা গোমেজকে কোথাও দেখল না ও। রীটা গোমেজ—আশ্চর্য একটি মেয়ে। জিমনেশিয়ামের প্রতি প্রবল আগ্রহ তার। যেমন সুন্দরী, তেমনি সপ্রতিভ। কামালের সাথে ভাল পরিচয় আছে। এখানে প্রায়ই আসে রীটা গোমেজ।

দোতলায় উঠে সেক্রেটারি লেখা দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল ইমদাদুল হক ট্রাউজার এবং স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে টেবিলের উপর বসে খবরের কাগজ পড়ছে। পদশব্দে চোখ তুলল সে। কামালকে দেখে দশাসই দেহটা সটান খাড়া হয়ে গেল।

বাঁশির মত মিহি, মেয়েলি গলায় কথা বলে উঠল ইমদাদুল হক। প্রকাণ্ড দেহের উপর ছোট্ট একটা মাথা। গোলাকার, ছোট্ট, কালো চকচকে মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল।

'এইমাত্র দুঃসংবাদটা শুনলাম। আহা-হা! আহা-হা! বড্ড ভাল ছিলেন মহিলা…! খুনীকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ?'

কামাল বলল, 'না, তদন্ত শুরু করেছি মাত্র।'

'খুনী যেই হোক, ব্যাটাকে ধরা পড়তেই হবে। হুঁ, হু, কার লেজে পা দিয়েছে তা তো জানে না—বসো দোস্ত, বসো।'

কামাল বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। বলল, 'তোমার সাথে আমার কথা আছে হক।'

'কথা আছে?' একটু যেন নার্ভাস দেখাল ইমদাদুলকে। বলল, 'তা বেশ। তা বেশ! দেখো দোস্ত, খারাপ কোন খবর দিয়ে আবার ঝপাৎ করে পানিতে ফেলে দিয়ো না যেন।'

বসল সে কামালের মুখোমুখি, টেবিলের ওধারে, 'তা কি কথা, দোস্ত?'

কামাল সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, 'বলো তো, ইয়াকুব নামে কাউকে চেনো কিনা?'

ইমদাদুল ঘাড় কাত করে তির্যক দৃষ্টিতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল ক'সেকেণ্ড, স্মরণ করার চেষ্টা করছে। তারপর বলল, 'অনেক ইয়াকুবকে চিনি। ঠিক কোন…?'

'পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, হ্যাণ্ডসাম, বিদ্যুতের গতি, বেপরোয়া এবং অভদ্র।'

'ওহ্-হো! চিনেছি, স্যার, চিনেছি। লেডিকিলার ইয়াকুব—ভোম্বল!'

কামাল বলল, 'ভোম্বল মানে?'

ইমদাদুল হক ধবধবে সাদা দাঁত বের করে হাসল, 'ভোম্বল বলে ডাকতাম ওকে আমি। কেন তা আমি নিজেই জানি না। মেয়েরা ওর জন্যে পাগল। মৌমাছির মত ওর পিছনে উড়ে বেড়ায়। তবে—হ্যাঁ, ওস্তাদ বটে ছোকরা। এখান থেকেই শুরু করেছিল। কেউ ঘেঁষতে সাহস পেত না ওর কাছে। ছোকরার ওপর খুব আশা করেছিলাম। কিন্তু টিকল না। মাস কয়েক আগে হঠাৎ করে কেটে পড়েছে। তা, ভোম্বলকে কেন খুঁজছ, দোস্ত?'

'খুঁজছি না। ওর কথা জানতে চাইছি। আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে…।'

'ভোম্বল? তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে? শালার পাখা গজিয়েছে রে!'

ইমদাদুল ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল, 'এইবার! এইবার ব্যাটা উচিত শিক্ষা পাবে! হায়, হায়, এত লোক থাকতে সে তোমার সাথে টক্কর দিতে গেল—সর্বনাশ! ঝপাৎ করে পড়বে ব্যাটা এবার পানিতে…কিন্তু ব্যাপার কি জানো, বড্ড গোঁয়ার প্রকৃতির ওই ভোম্বল। দূরে দূরে থাকাই ভাল। ব্যাটা পয়জন! তবে, তোমার সাথে—স্রেফ প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলবে, জানি আমি! তা কোথায় দেখলে ছোকরাকে?'

কামাল বলল, 'মোহাম্মদ তোয়াব খানের নাম শুনেছ তো? কোটিপতি। তাঁর বাড়ি মুক্তা নিকেতনে গার্ড হিসেবে কাজ করছে…।'

ইমদাদুলের মুখের চেহারা দুমড়ে মুচড়ে বাঁকা হয়ে গেল, 'গার্ড? ভোম্বল গার্ড?

দোস্ত এ লোক সে নয়। ভুল হয়েছে আমার। ইয়াকুব ভোম্বল, যার কথা বলছি
মি, সে অগাধ টাকার মালিক।'
কামাল বলল, 'তোমার ইয়াকুব ভোম্বলের কপালে কাটা দাগ আছে?'
'তা আছে…।'
কামাল বলল, 'তবে এ ছোকরা তোমার ভোম্বলই। টাকা আছে জানো
াবে?'
ইমদাদুল বলল, 'স্টাইল দেখে। এখনও তো মাঝে সাজে দেখা করতে আসে।
া দামী কাপড় পরে, ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট খায়, ঝকঝকে ডাটসন গাড়ি
ায়, নিউ ইস্কাটনে দোতলা বাড়ি আছে—না দোস্ত, গার্ড সে হতেই পারে না।'
কামাল বলল, 'কোন সন্দেহ নেই, মিলন। মেয়েদের প্রতি খুব দুর্বলতা আছে,
,'
মিলন চোখ বুজে বলল, 'খু-উ-ব। মাই গড দোস্ত, তুমি তোমার বান্ধবীকে
জ্ঞস করলেই তো পারো। সে ভোম্বলের আসল খবর দিতে পারবে তোমাকে।'
'আমার বান্ধবী? কার কথা বলছ তুমি?'
'রীটা গোমেজ।'
কামাল অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'রীটার সাথে ভোম্বলের কি সম্পর্ক?'
ইমদাদুল হক আকাশ থেকে পড়ল, 'বলো কি দোস্ত! রীটা তোমার
াবী—তুমিই জানো না? তাহলে, শোনো। ভোম্বলের প্রেমে পড়েছিল রীটা
মেজ। ভোম্বলও রীটার কথায় উঠত বসত। তারপর কি যে হলো, ভোম্বল চর্চা
া ছেড়ে দিল। আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল তার। রীটা অবশ্য আসা-যাওয়া
ত। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা ভেঙে গেছে সেই থেকে। কারণটা অবশ্য আমি জানি
। রীটা আসা-যাওয়া করে দেখে আমিই তাকে মেয়েদের চর্চার দায়িত্ব নিতে
।। রাজি হয়ে যায় সে।'
'রীটা এখানে কাজ করছে তাহলে?'
ইমদাদুল হক বলল, 'করছে বৈকি। কথা বলবে ওর সাথে? ডেকে পাঠাব?
ড়ির পিছনে মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছি। ওখানে আছে সে।'
'ডেকে পাঠাও তো। দেখি ওর সাথে কথা বলে।'
কলিংবেলের বোতামে থাবা মারল ইমদাদুল হক। বলল, 'এক্ষুণি, দোস্ত!'

ারণ মেয়েদের চেয়ে একটু বেশিই লম্বা রীটা গোমেজ। দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটে।
য়েটার মধ্যে একটা পুরুষালি ভাব আছে। শাড়ি-ব্লাউজ পরনে। পায়ে হাইহিল।
খে সান গ্লাস। মুখটা বড় আকারের। লাবণ্য কম, তবে চোখ, নাক, ভুরু,
াল—সবই নিখুঁত। গায়ের রঙটিও ফর্সা।
কামালের সাথে এই জিমনেশিয়ামেই পরিচয় রীটা গোমেজের। মাত্র মাস
য়ক হয়েছে, এখানে যাওয়া-আসা ছেড়ে দিয়েছে কামাল। সময়ের অভাব বলে
য়াম চর্চা সে বাড়িতেই করে।
অফিস রুমে ঢুকেই রীটা কামালকে দেখে সহাস্যে বলে উঠল, 'হাই! কামাল!

কী ভাগ্য, তোমার দেখা পেলাম!'

কামাল রীটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'এসো, রীটা। কেমন আছ?'

'আছি।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল রীটা, এগিয়ে এসে বসল কামালের পাশের চেয়ারে।

ইমদাদুল হক বলল, 'মেয়েরা ঠিক মত চর্চা করছে তো, মিস রীটা?'

'করছে।' রীটা সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে তাকাল কামালের দিকে। বলল, 'তোমাকে এত করে বললাম আমাকে তোমাদের ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশনে একটা চাকরি দাও—কথাটা রাখলে না, না?'

ইমদাদুল হক বলল, 'মিস রীটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতে চান। তোমাকে অনুরোধ করার জন্যে আমাকে অমন হাজার বার বলেছেন।'

কামাল বলল, 'এতদিন তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমার বন্ধুর সাথে আলোচনা করিনি। এবার করব। একজন সহকারিণী হয়তো দরকার হতে পারে আমাদের, রীটা। আমাদের একজন সহকারিণী, শিল্পী, গতরাতে খুন হয়েছে।'

'কি বললে? তোমাদের একজন···?'

কামাল বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু সে আলোচনা এখন থাক। রীটা, আমি তোমার কাছ থেকে ইয়াকুব সম্পর্কে কিছু তথ্য চাই।'

ইমদাদুল হক বলল, 'ইয়াকুব, মানে, ভোম্বল সম্পর্কে জানতে চাইছে কামাল।'

হাস্যোজ্জ্বল মুখটা কেন যেন থমথমে হয়ে গেল রীটার। কামালের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ওই ইডিয়েটটা সম্পর্কে তোমার কৌতূহলের কারণ কি? তুমি কি খুনটার ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করো?'

কামাল বলল, 'না, ঠিক তা নয়। ছোকরাকে আমার বন্ধু মুক্তা নিকেতনে দেখেছে। গার্ড হিসেবে। তাই ওর সন্দেহ হয়েছে।'

ইমদাদুল একটা সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিতে রীটা ধন্যবাদ দিয়ে একটা ফিল্টার টিপড গোল্ড ফ্লেক টেনে নিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল সেটা ইমদাদুলই। রীটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, 'ইয়াকুবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। খুবই ইন্টারেস্টেড ছিলাম একসময়। কারণ সম্ভাবনাময় বক্সার ছিল ও। জানোই তো, আমি আবার এই সব ব্যাপারে কারও মধ্যে সম্ভাবনা দেখলে দারুণ আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু ও একটা ইঁচড়ে পাকা বদমাশ। মেয়েদের পিছু ছুটবে, না ট্রেনিং নেবে?'

কামাল বলল, 'গাড়ি-বাড়ির মালিক, অথচ গার্ডের চাকরি নিয়েছে···!'

'গাড়ি-বাড়ির মালিক? কে বলল তোমাকে?'

ইমদাদুল হক বলল, 'কেন, আপনি জানেন না এসব? নিউ ইস্কাটনে বাড়ি আছে ওর। ডাটসন গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে আসে!'

রীটা যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'গড! এসব তো জানা ছিল না।'

কামাল বলল, 'আজকাল কোন খবরই তার রাখো না?'

'কি লাভ? ও ভেবেছিল আমি ওর প্রেমে পড়েছি।' খিল খিল করে হেসে উঠল

ীটা, ববড্ চুল দুলিয়ে সরাসরি তাকাল কামালের দিকে। বলল, 'আসলে ও একটা ছাটলোক। আমার সাথে বিশ্রী একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার দুরাশা ছিল। চরম অপমান করেছিলাম আমি। ওকে আমি নরকের কীট মনে করি। সত্যি কথা বলতে ক, এখনও খেপে আছি ওর ওপর। সুযোগ পেলে উচিত শিক্ষা দিতে ছাড়ব না।'

সিগারেটে টান মারার জন্যে বিরতি নিল রীটা, তারপর বলল, 'তোমার বন্ধু হীদ খানের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে? আমি না হয় নিজেই প্রস্তাবটা দব।'

কামাল বলল, 'তার দরকার নেই। সময় মত ওকে আমিই বলব।'

রীটা বলল, 'ইয়াকুবের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারি, ামাল। দরকার হলে, ওর সাথে মেলামেশা শুরু করব আবার। মোট কথা, ামাকে একটা সুযোগ দাও। ডিটেকটিভগিরি করার সাধটা মিটুক আমার।'

কামাল বলল, 'ঠিক আছে চলো তুমি আমার সাথে আমাদের অফিসে।'

রীটা বলল, 'সত্যি নিয়ে যাবে?'

কামাল বলল, 'বন্ধু হিসেবে—চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। সেটা নির্ভর করবে আমার বন্ধুর ওপর।'

'চাকরি চাইছি তা নয়। কাজ করতে চাই। থ্রিল চাই, রোমাঞ্চ চাই।'

ইমদাদুল বলল, 'কামাল, দোস্ত, মিস রীটা আমার জিমনেশিয়ামের সম্পদ বিশেষ। ওকে আবার সহকারিণীর পদ দিয়ে গেঁথে ফেলো না—ঝপাৎ করে পানিতে ড়ব একেবারে। জানোই তো, মহিলা ট্রেনার পাওয়া কি মুশকিলের ব্যাপার...'

রীটা বলল, 'ডিটেকটিভ হবার শখ আমার ছোটবেলা থেকে, হক সাহেব। ুযোগ যখন পেয়েছি, ছাড়ছি না। তবে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি চাকরি ছাড়ছি া। মেয়েদেরকে চর্চা করতে সাহায্য করাটাও আমার একটা শখ।'

ইমদাদুল হক এক গাল হেসে বলল, 'ভেরি গুড, মিস রীটা।'

ছয়

বলা সাড়ে বারোটার মধ্যে কাজটা শেষ হলো।

কবরস্থান থেকে বেরুবার পর মি. সিম্পসন একটা হাত রাখলেন শহীদের কাঁধে, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত করতে দেখা গেল তাঁকে।

শহীদ মুখ খুলল, 'আপনাদের ডাক্তার মৃত্যুর সময় সম্পর্কে কি বললেন?'

'ডেফিনিট কিছু বলতে না পারলেও, সময় বারোটা থেকে একটার মধ্যে হবে লে তাঁর বিশ্বাস।'

শহীদ কথা বলল না।

মি. সিম্পসন বললেন, 'শহীদ, কি ধরনের হত্যা এটা? কিছু বুঝতে পারছ? ৪৫—কিন্তু পিস্তলটা পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা খুনী ফেলে যায়নি। ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই। অত রাতে লেকের ধারে কেন গিয়েছিল শিল্পী? কামাল এবং জামান লছে—ওর কোন শত্রু ছিল না। তাহলে কে? কেন?'

শহীদ বলল, 'এই সব প্রশ্নের উত্তর আমিও চাই, মি. সিম্পসন।'

মি. সিম্পসনের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, 'গতরাতে সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ি পরে শিল্পীর ফ্ল্যাটে একজন ভদ্রমহিলা গিয়েছিল—কে সে শহীদ?'

শহীদ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'প্রিন্টেড সিল্কের শাড়ি পরে···কে হতে পারে ঠিক বুঝতে পারছি না, মি. সিম্পসন।'

চমকে উঠেছে শহীদ। এটা একটা তথ্য বটে। গতরাতে মিসেস রাফিয়া ওর অফিসে এসেছিল ওই শাড়ি পরে, তার মানে শিল্পীর ফ্ল্যাটেও গিয়েছিল সে রাতে!

'ভদ্রমহিলার গলায় হীরে বসানো একটা দামী নেকলেস ছিল,' মি. সিম্পসন বললেন।

শহীদ বলল, 'ভদ্রমহিলার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তুমি তাহলে সত্যিই চিনতে পারছ না ভদ্রমহিলাকে? আমি ভেবেছিলাম এই মহিলা তোমার ক্লায়েন্ট, তার পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করছ তুমি।'

শহীদ বলল, 'আমি যদি কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করি তাহলে তা গোপনই থাকবে, মি. সিম্পসন।'

মি. সিম্পসন শ্রাগ করে বললেন, 'তোমাদের এই বিপদে আমি সাহায্য করতে চাইছি, শহীদ। প্রয়োজন হলেই যোগাযোগ কোরো। ভাল কথা, শহীদ, এই কেসের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইন্সপেক্টর গনির ওপর। তিনি তোমার সাথে যোগাযোগ করবেন।'

আর কিছু বললেন না তিনি। জীপে গিয়ে চড়লেন। শহীদও গম্ভীর মুখে ফোক্সওয়াগেনে উঠল। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে শহীদের। ইন্সপেক্টর গনি লোকটা অসম্ভব খুঁতখুঁতে। শহীদ বা কামালকে ভাল চোখে দেখে না সে। তার ধারণা, শহীদ ও কামাল বড়লোকের ছেলে, কোন কাজ নেই তাই পুলিসের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্যে শখের গোয়েন্দা সেজে বসেছে।

কামাল আর জামান আগেই উঠে বসেছে গাড়ির ব্যাকসীটে। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল শহীদ। ওরা তিনজন প্রায় একসাথেই দেখতে পেল নীল রঙের একটা মার্সিডিজকে। ধীরে ধীরে কবরস্থানের গেটের সামনে দাঁড়াচ্ছে সেটা। ডি. কস্টাকে দেখা যাচ্ছে। তার হাতে ফুলের তোড়া এবং আগরবাতি। পাশের চালক স্বয়ং কুয়াশা। চেনবার উপায় নেই, আফগান যুবকের ছদ্মবেশ নিয়েছে সে।

শিল্পীর সমাধি চিনে নিতে পারবে কুয়াশা। সুতরাং গাড়ি দাঁড় করাল না শহীদ।

অত্যন্ত মিশুক মেয়ে এই রীটা গোমেজ। শহীদ কথাটা মনে মনে স্বীকার না করে পারল না।

কিছুক্ষণের আলাপেই সে ওদের একজন হয়ে উঠেছে। কথায় বার্তায়, আচরণে, সহজ-সরল ভাব-ভঙ্গিতে সবাইকে আপন করে নেবার দুর্লভ একটা গুণ রয়েছে ওর।

কামাল পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলেছে, 'রীটা ক্রিমিনোলজি সম্পর্কে

ইন্টারেস্টেড। আমাদের হয়ে কাজ করতে চায়। ওর সামনে আমরা সব ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি।'

শহীদের চেম্বারে বসেছে ওরা। শহীদ মুক্তা নিকেতনের ঘটনাটা আর একবার শোনাল ওদেরকে।

কামাল শুধু বলল, 'হাত-পা ভেঙে দিয়ে আসতে পারলি না!'

রীটা গোমেজ বুদ্ধিমতীর মত মন্তব্য করল, 'হাত-পা ভেঙে দিলেও শয়তানটার উচিত শিক্ষা হবে না। ও কি কি অপরাধ করেছে তার একটা তথ্য সমৃদ্ধ তালিকা সংগ্রহ করে আইনের মাধ্যমে প্যাঁচে জড়াতে হবে—যাতে সেই প্যাঁচ থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে না পারে।'

শহীদ বলল, 'কামাল, দেলোয়ার মোরশেদ সম্পর্কে কি জানতে পেরেছিস বল।'

কামাল মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছিল, শহীদের প্রশ্ন শুনতে পেলেও মুখ তুলল না। পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট বের করে নতুন একটা সিগারেট ধরাল, তারপর বলল, 'লোকটা উদ্ভট টাইপের, বুঝলি? লেকের ধারে একতলা বাড়ি আছে একটা। বাড়িটার ছাদেই বেশির ভাগ সময় কাটায় সে। ছাদের ওপর মাঝারি আকারের একটা টেলিস্কোপ আছে, সেটায় চোখ রেখে লেকের ধারে যে সব মেয়েরা আসে তাদেরকে দেখে। কুৎসিত একটা বদভ্যাস বলেই মনে হলো ব্যাপারটাকে। তার বক্তব্য, রাতে সে নক্ষত্ররাজি দেখার জন্যে টেলিস্কোপটা কিনেছিল। কিন্তু অত রাতে লেকের ধারে কি দেখছিল জিজ্ঞেস করতে পরিষ্কার কোন উত্তর দিতে পারেনি সে। আমার ধারণা, ছাদ থেকেই শিল্পীকে এবং শিল্পীর খুনীকে, টেলিস্কোপ দিয়ে দেখেছিল সে। কিন্তু তা স্বীকার করেনি। বলছে, শুধু ভ্যানিটি ব্যাগটাই তার চোখে পড়েছিল।'

'টাকার লোভ দেখিয়েও কথা আদায় করতে পারলি না?'

কামাল বলল, 'টাকার কথা আভাসে বলতে লোকটা কি বলল জানিস? বলল, স্মরণশক্তি খুব দুর্বল কিনা আমার, তাই ঠিক স্মরণ করতে পারছি না কোন মানুষকে দেখেছি কিনা। চিন্তা ভাবনা করে দেখার সময় দিন আমাকে, চেষ্টা করে দেখি মনে করতে পারি কিনা।'

শহীদ বলল, 'সুবিধের লোক নয়। কোন সন্দেহ নেই, অনেক কিছুই দেখেছে সে। হয়তো খুনীও ওর চোখে ধরা পড়েছিল। সন্দেহ হচ্ছে, ব্ল্যাকমেইল করে খুনীর কাছ থেকে মোটা টাকা পাবার ফন্দি আছে ওর।'

'সেই টাইপেরই লোক।'

শহীদ বলল, 'ইন্সপেক্টর গনিকে কতটুকু বলেছে জানতে পেরেছিস?'

কামাল বলল, 'ইন্সপেক্টর জানে লোকটা পাগলাটে, তাই তাকে বোকা বানাতে অসুবিধে হয়নি ওর।'

শহীদ চিন্তিতভাবে বলল, 'লোকটার কাছে আমাকে যেতে হবে। ঠিক আছে, আর কি কি জানতে পারলি?'

'মুক্তা নিকেতনের সবচেয়ে কাছের পেট্রল পাম্প স্টেশনে গিয়েছিলাম। মিসেস

রাফিয়ার গাড়ি ক'টার সময় বাড়িতে ফিরেছে জানার জন্যে। স্টেশনের ম্যানেজার আমার পরিচিত। কিন্তু সে কোন তথ্য দিতে পারল না। তার সাথে কথা বলছি, এমন সময় পেট্রল নেবার জন্যে একটা ফোক্সওয়াগেন এল। ম্যানেজার ড্রাইভারকে দেখিয়ে আমাকে বলল, তোয়াব খানের শোফার ওই লোক। আমার অনুরোধে ডেকে পাঠাল ম্যানেজার লোকটাকে। বেশ খাতির দেখলাম লোকটার সাথে ম্যানেজারের। চা আনাল সে। গল্প-গুজব শুরু হলো। আমিও যোগ দিলাম। সিগারেট দিলাম শোফারকে। তারপর মিসেস রাফিয়া সম্পর্কে দু'একটা প্রশ্ন করলাম। লোকটা গল্পবাজ। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে দশটা কথা বলে ফেলে। মিসেস রাফিয়া যে তোয়াব খানের উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারেনি, একথা সে বার বার উল্লেখ করল। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস রাফিয়া কোথায়? লোকটা কোন রকম সন্দেহ না করে গল গল করে কথা বলতে শুরু করল।'

'কি বলল?'

'বলল, মিসেস রাফিয়া তাকে বলেছিল রাত দশটায় মার্সিডিজ গাড়িটা গেটের সামনে থাকবে, সেটাকে গ্যারেজে তুলে রাখতে হবে। কিন্তু দশটা কেন, রাত দুটো অবধি অপেক্ষা করার পরও মিসেস রাফিয়া বা মার্সিডিজের দেখা পায়নি সে। দুটোর পর সে শুতে চলে যায়। রাতে মিসেস রাফিয়া বাড়িতে ফিরে যায়নি।'

'ফিরে যায়নি?' শহীদকে বিস্মিত দেখাল।

'না। সকালে তোয়াব খানকে কথাটা জানায় সে। তোয়াব খান বলেন, মিসেস রাফিয়া যে রাতে ফিরবেন না তা তিনি জানতেন, এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

শহীদকে গম্ভীর দেখাচ্ছে।

'মার্সিডিজের সন্ধানে গোটা শহরটা চষে ফেলেছি আমি—পাইনি।'

শহীদ বলল, 'পেতেই হবে। অতবড় গাড়ি—বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। মিসেস রাফিয়াকে আমরা চাই। তাকে পেতে হলে তার গাড়ির সন্ধান পেতে হবে। হোটেলগুলোতে বিশেষভাবে খোঁজ নিবি তুই...'

কামাল বলল, 'এখান থেকে বেরিয়ে আবার আমি খুঁজতে শুরু করব।'

রীটা গোমেজ বলল, 'ধনী লোকদের স্ত্রীরা কেউ কেউ নাইটক্লাবে রাত কাটাতে অভ্যস্ত—সুতরাং নাইটক্লাবগুলোতেও খোঁজ নিতে হবে।'

কামাল বলল, 'কাজী হানিফের ফেয়ারভিউয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারল না। কাজী হানিফকে দেখেছি, যদিও সে আমাকে দেখেনি—কথা বলতে চেষ্টা করিনি আমি। সে হয়তো কোন না কোন ভাবে এই কেসে জড়িত, তাই দেখা দিলে সাবধান হয়ে যাবে ভেবে...'

শহীদ তাকাল জামানের দিকে।

জামান বলল, 'শহীদ ভাই, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য সংগ্রহ করেছি আমি।'

শহীদ বলল, 'জানি। মিসেস রাফিয়া গতরাতে শিল্পীর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল—এই তো?'

'আপনি কিভাবে জানেন?'

'মি. সিম্পসন বলেছেন। কিন্তু ক'টার সময় গিয়েছিল তা তিনি বলেননি।'

জামান বলল, 'সোয়া এগারোটার সময়।'

শহীদ সিধে হয়ে বসল, 'তার মানে আমার কাছ থেকে বেরিয়ে সোজা মিসেস রাফিয়া শিল্পীর ফ্ল্যাটে যায়। পৌনে এগারোটার সময় এখান থেকে বিদায় নেয় মিসেস রাফিয়া। আর কি জানতে পেরেছ, জামান?'

জামান বলল, 'শিল্পীর ফ্ল্যাটের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটেই এক বুড়ো ভদ্রলোক থাকেন। রসিক মানুষ, অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করেন। তাঁর কাছ থেকে তথ্য পেয়েছি আমি। সোয়া এগারোটার সময় তিনি পায়ের শব্দ পান। জানালার পর্দা সরিয়ে করিডরের অল্প আলোয় তিনি দেখেন শিল্পীকে। শিল্পীর সাথে বোম্বাই প্রিন্টের শাড়ি পরা আর এক যুবতীকে দেখেন তিনি।'

'মিসেস রাফিয়া! সে কি শিল্পীর সাথেই ওর ফ্ল্যাটে যায়?'

জামান বলল, 'মিসেস রাফিয়ার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেননি ভদ্রলোক। তবে শাড়ি এবং নেকলেসটা দেখতে পান। আধঘণ্টা পর শিল্পীর ফ্ল্যাট থেকে মিসেস রাফিয়া বেরিয়ে যান। জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেও, এবারও চেহারাটা দেখতে পাননি বৃদ্ধ। যাক, এরপর তিনি শুতে যান। ঘুম খুব পাতলা তাঁর, অনেক রাতে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন—রাত তখন দেড়টা। ফোনের বেল বাজছিল শিল্পীর ফ্ল্যাটে। এর পাঁচ মিনিট পর বৃদ্ধ ভদ্রলোক শিল্পীর ফ্ল্যাটের দরজা খোলার এবং বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পান। এত রাতে শিল্পী কোথায় যাচ্ছে এ প্রশ্ন মনে দেখা দিলেও তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননি, ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল বলে।'

জামান থামল। একমুহূর্ত পর আবার বলল সে, 'বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ধারণা, খুনী যে-ই হোক, শিল্পীকে সে-ই ফোন করে। ফোনে এমন কিছু বলেছিল সে শিল্পীকে, যার ফলে শিল্পী অত রাতে বাইরে বেরুতে বাধ্য হয়। খুনি হয়তো মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিল নিজের। যাই হোক, লেকের ধারেই হয়তো যেতে বলে সে শিল্পীকে। শিল্পী যায়—এবং খুনী তাকে গুলি করে। ভদ্রলোক পুলিসকেও একথা বলেছেন।'

শহীদ বলে উঠল, 'কিন্তু মিলছে না, জামান। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলছে বারোটা থেকে একটার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে শিল্পীর। শিল্পী যদি দেড়টার সময় ওর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে থাকে···অসম্ভব!'

রীটা গোমেজ বলল, 'কেউ কোথাও ভুল করছে। হয় পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট, নয়তো বৃদ্ধ ভদ্রলোক···।'

জামান বলে উঠল, 'বৃদ্ধ ভুল করেননি। তিনি ফোনের শব্দ পেয়েই ঘড়ি দেখেন। ঘড়িটা সকালে আমিও দেখেছি, ঠিক চলছে, আমার ঘড়ির সাথে মিলিয়ে দেখেছি।'

শহীদ বলল, 'পোস্টমর্টেমের রিপোর্টও ভুল হতে পারে না।'

কামাল বলল, 'সে যাই হোক, কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে। শিল্পীর সাথেই ওর ফ্ল্যাটে মিসেস রাফিয়া গিয়েছিল—তার মানে, শিল্পীর সাথে কথা হয় তার, শিল্পী হয়তো তাকে অনুসরণ করার কারণ সম্পর্কেও

সব কথা বলেছিল।'

'কামাল! কি বলছিস তুই?'

কামাল নয় জামান কথা বলে উঠল, 'যা সত্যি, তা মেনে নিতে হবে, শহীদ ভাই। মিসেস রাফিয়া দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল আপনাকে। আপনার তরফ থেকে অনুকূল সাড়া পেলে সে হয়তো টাকার অঙ্ক আরও বাড়াত। আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবার মাত্র আধঘণ্টা পর তাকে দেখা যায় শিল্পীর সাথে শিল্পীর ফ্ল্যাটে ঢুকতে। আজ সকালে শিল্পীর ফ্ল্যাটে পাওয়া গেছে মিসেস রাফিয়ার চল্লিশ হাজার টাকা দামের নেকলেসটা। দুয়ে দুয়ে চার-এর মতই সরল বলে মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা? এতে কি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না যে মিসেস রাফিয়া অনুসরণ করা থেকে ক্ষান্ত করার জন্য শিল্পীকে ঘুষ হিসেবে নেকলেসটা দিয়েছিল?'

শহীদ চিন্তা করছিল। বলল, 'অন্যরকম কিছু ঘটেছিল, জামান। মিসেস রাফিয়ার কাছ থেকে শিল্পী নেকলেসটা নিয়েছিল—কারণ হয়তো এই যে, শিল্পী চেয়েছিল মিসেস রাফিয়া ঘুষ দিতে চায়, তার প্রমাণ হাতে রাখতে। আবার, এমনও তো হতে পারে যে নেকলেসটা মিসেস রাফিয়া শিল্পীকে দেয়নি, আর কেউ সেটা শিল্পীর বেডরূমের কার্পেটের নিচে গোপনে রেখে এসেছিল, মিসেস রাফিয়াকে ফাঁসাবার জন্যে।'

কামাল বলল, 'অসম্ভব নয়।'

জামান বলল, 'একেবারে যে অসম্ভব তা বলছি না। বৃদ্ধ ভদ্রলোক পরে ঘুমিয়ে পড়েন। শিল্পী বেরিয়ে যাবার পর ফ্ল্যাটে আর কেউ ঢুকেছিল কিনা তা তিনি জানতে পারেননি। তবু, আমি মনে করি···শহীদ ভাই, জানি শিল্পীর প্রচুর টাকা ছিল, কিন্তু গহনা জাতীয় জিনিসের প্রতি মেয়েদের প্রচণ্ড লোভ থাকে।'

শহীদ বলল, 'এ প্রসঙ্গের আলোচনাটা এখানেই বন্ধ হোক।'

নিস্তব্ধতা নামল চেম্বারের ভিতর।

লাইটার জ্বেলে নিস্তব্ধতা ভাঙল শহীদ, ধোঁয়া ছাড়ল ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে, 'মিসেস রাফিয়াকে দুই জায়গার যে কোন এক জায়গায় পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এক, কাজী হানিফের নাইট ক্লাব ফেয়ারভিউয়ে। দুই, সাধন সরকারের বাড়িতে। তবে, শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জামান, তুমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে আবার দেখা করো। জানতে চেষ্টা করো মিসেস রাফিয়া যখন শিল্পীর ফ্ল্যাট থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন তার গলায় নেকলেসটা ছিল কিনা? তারপর তুমি লেকের দিকে যাবে। আশ-পাশের বাড়ির লোকদের প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করো, কেউ শিল্পীকে দেখেছিল কিনা। শিল্পী যেখানে খুন হয়েছে সেখানে যেতে হলে অনেকগুলো বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হয়—কারও চোখে পড়া অসম্ভব নয়, রাত যতই গভীর হোক।'

'ঠিক আছে।'

শহীদ কামালের দিকে তাকাল, 'মিসেস রাফিয়ার মার্সিডিজটাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব তোর ওপর। তারপর, ফেয়ারভিউয়েও যাবি আর একবার।'

রীটা গোমেজ বলে উঠল, 'আর আমি? আমিও তো একজন মেম্বার এখন, তাই

না? আমাকেও কাজ দিন…।'

শহীদ বলল, 'সত্যি কাজ করতে চান নাকি?'

'চাই না মানে! ও, বুঝেছি, আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারছেন না…'

শহীদ বলল, 'তা নয়…। ঠিক আছে। আপনাকে…।'

'ফেয়ারভিউয়ে বরং আমি যাই। এমনিতেও ওখানে আমি সাঁতার কাটতে যাব আজ একবার। গাড়ির নাম্বার, রঙ ইত্যাদি সম্পর্কে বলুন আমাকে।'

শহীদ বলল, 'তাই যান। কিন্তু খুব সাবধান, কাজী হানিফ যেন টের না পায় আপনি আমাদের হয়ে…'

'সে-কথা আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না।'

রীটা গোমেজ রিস্টওয়াচের দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি তাহলে রওনা হয়ে যাই। বাড়ি হয়ে চলে যাব সোজা।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। গাড়ির নাম্বার…'

সাত

রীটা গোমেজ চলে যাবার খানিক পর কামাল এবং জামানও যে যার দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য বিদায় নিল।

একা চেম্বারে বসে ডেস্কের উপর জুতোসহ পা দুটো তুলে দিয়ে পাইপ ধরাল শহীদ। মুখের চেহারা বদলে গেছে ওর, সকলে বিদায় নেবার পর। নির্মমভাবে নিজের বিবেককে চাবুক মারছে শহীদ। শিল্পী খুন হয়েছে। খুন হবার পর পেরিয়ে গেছে বারো-তেরোটি ঘণ্টা। এই বারো-তেরো ঘণ্টায় খুনীকে চেনার ব্যাপারে কি কি সূত্র পেয়েছে ও?

সময় বয়ে চলেছে। যা যা ঘটেছে, রোমন্থন করছে ও। হঠাৎ খেয়াল হলো আগুন ধরাচ্ছে গ্যাস লাইটার জ্বেলে পাইপে, ঘনঘন টান মারছে কয়েকবার, নীলাভ ধোঁয়া ছাড়ছে গলগল করে, পরমুহূর্তে ভুলে যাচ্ছে পাইপের অস্তিত্বের কথা, গভীর চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে নিজেরই অজ্ঞাতে।

আহত, ব্যথিত একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে শহীদকে। আর কেউ নয়, শিল্পী খুন হয়েছে। শিল্পী—ওর একজন সহকারিণী। এই খুনের রহস্য উন্মোচন করতে হবে। কিন্তু সূত্র কোথায়?

কোথায় মিসেস রাফিয়া? কোথায় তোয়াব খান?

একটার পর একটা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে মনের ভিতর। তোয়াব খানের মেয়ে ঋতু অমন অস্বাভাবিক ব্যবহার কেন করল আজ সকালে তার সাথে?

ইয়াকুব। কে ওই ছোকরা? সোনার সিগারেট কেস থাকে তার পকেটে। নিউ ইস্কাটনে আধুনিক বাড়ি আছে তার। ডাটসন গাড়ি চালায়। প্রচুর টাকার মালিক, বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও কেন তোয়াব খানের প্রাসাদোপম বাড়ির গেটে গার্ড হিসেবে কাজ করছে সে?

পা দুটো নামাল শহীদ। ফোন গাইডটা টেনে নিল সামনে। পাতা ওল্টাতে শুরু করল ব্যস্ততার সাথে।

মিনিট তিনেক চেষ্টার পরই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল শহীদ। কেন যেন দাঁতে দাঁত চাপল শহীদ।

ফোন গাইডে ইয়াকুবের নাম রয়েছে।

ইয়াকুব আলী খান—২০১/১৪, নিউ ইস্কাটন—ফোন নং···।

গাইড বন্ধ করে পাইপে আগুন ধরাল ও। কার্পেট মোড়া মেঝেতে পায়চারি শুরু করল। ও কি ইয়াকুবের পেছনে অকারণে অমূল্য সময় নষ্ট করছে?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। শিল্পীর খুন হওয়ার সাথে কি সম্পর্ক থাকতে পারে ইয়াকুবের?

তবু, কেন যেন ইয়াকুবের ব্যাপারে সম্ভাব্য সব তথ্য পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মন।

মনের দাবি মেনে নিয়ে কাজ করতেই অভ্যস্ত ও। পায়চারি থামাল ডেস্কের সামনে, তুলে নিল ফোনের রিসিভার। ডায়াল করল বন্ধুর কাছে।

মোহাম্মদ এখলাস উদ্দিন ল্যাণ্ড রেকর্ড অফিসের বড় কর্তা, ওর বন্ধু।

এখলাস সাহেবের কণ্ঠস্বর শহীদের কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার মত অবস্থা করল, 'দোস্ত! এইমাত্র যাচ্ছিলাম তোর কাছে। ফোনটা খারাপ, শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা?···হ্যাঁ, শুনেছি···ভেরি স্যাড নিউজ···নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে জানতে পেরেছিস কে···।'

শহীদ বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখলাস, শিল্পীর খুনীকে ধরার ব্যাপারেই একটা ইনফরমেশন দরকার আমার। এক্ষুণি। আমি নিউ ইস্কাটনের একটা বাড়ির নাম্বার দিচ্ছি। তুই দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে জানাবি বাড়িটা কার—পারবি?'

'চোখ বুজে পারব···ওয়েট অ্যাণ্ড সি!'

বাড়ির নাম্বারটা দিয়ে ফোন রেখে দিল শহীদ।

ঠিক দশ মিনিট পর ফোন করল এখলাস সাহেব। বলল, 'শহীদ, বাড়িটা মোহাম্মদ তোয়াব খানের মেয়ে মিস ঋতুর। বছর খানেক আগে সে কিনেছে ওটা।'

শহীদ বলল, 'এখলাস, ভাল করে দেখেছিস কাগজপত্র? বাড়িটার সাথে ইয়াকুব আলী খান নামে কোন লোক জড়িত কিনা? ঋতু কি একাই বাড়িটার মালিক?'

'কোন ভুল হবার নয়, শহীদ। আমি নিজে দেখেছি কাগজপত্র। ইয়াকুব বা আর কোন নামের লোক এ বাড়ির সাথে কোন ভাবে জড়িত নয়।'

শহীদ বলল, 'ধন্যবাদ, এখলাস। খুব কাজ দেবে তোর এই ইনফরমেশন।'

আরও এক মিনিট অন্যান্য প্রসঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ।

কি দাঁড়াল ব্যাপারটা?

বাড়িটা তোয়াব খানের মেয়ে ঋতুর।

গাড়িটা? ·৪৫ পিস্তলটা?

আবার রিসিভার তুলল ও। ডায়াল করল ট্রাফিক কন্ট্রোল ইন্সপেক্টর সালাহ

উদ্দিন আহমেদের নাম্বারে।

উত্তর পেতে দশ মিনিটও লাগল না।

হ্যাঁ, গাড়িটাও ইয়াকুবের নয়। ডাটসনটার মালিক তোয়াব খান।

·৪৫ পিস্তলটা? আর্মস লাইসেন্স রিনিউ-এর মেজিস্ট্রেটের কাছে ফোন করতে পনেরো মিনিটের মধ্যে জবাব পেয়ে গেল শহীদ।

·৪৫ পিস্তলটাও তোয়াব খানের।

তাহলে, কি দাঁড়াল ব্যাপারটা?

তথ্যগুলো পাওয়ায় একটা সম্ভাব্য ছবি ফুটে উঠব উঠব করছে। হয়তো, শিল্পীর খুন হওয়ার সাথে এসব তথ্যের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু সেট-আপটা চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই। একজন মানুষকে কৌতূহলী করে তোলার জন্যে যথেষ্ট।

ইয়াকুবের কিছুই নেই অথচ সবই আছে তার। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, পকেটে পিস্তল এবং সোনার সিগারেট কেস আছে। কেন এই সব জিনিস ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে সে? মুক্তা নিকেতনের গার্ড সে—গার্ডকে কেউ এমন জামাই আদর করে?

কারণ আছে। কি কারণ?

পায়চারি শুরু করল শহীদ আবার। জলবৎ তরলং, নিতান্তই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কারণটা। ইয়াকুবের বয়স খুব বেশি নয়। এরই মধ্যে সে অনেক কিছু অর্জন করেছে। সম্ভাব্য পন্থাটা কি? অল্পসময়ে প্রচুর সুযোগ এবং প্রচুর টাকার মালিক হবার একমাত্র উপায়—ব্ল্যাকমেইলিং। ইয়াকুব সম্ভবত তোয়াব খানের গোটা পরিবারটিকেই ব্ল্যাকমেইল করছে। মিসেস রাফিয়া ক্লেপটোম্যানিয়ায় ভুগছে এটা আবিষ্কার করা মোটেই কঠিন কিছু নয়। থাক, মিসেস রাফিয়াকে ব্ল্যাকমেইল করার কারণ না হয় রয়েছে। কিন্তু ঋতু? তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে কি কারণে ইয়াকুব?

জানতে হবে।

অপরদিকে ইয়াকুব যদি ব্ল্যাকমেইলার হয়, শিল্পীকে খুন করা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়।

বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু, স্বীকার না করে উপায় নেই, ইয়াকুবের ব্যাপার নিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করেছে সে। ইয়াকুব সন্দেহজনক চরিত্র হলেও, শিল্পীর খুন হওয়ার সাথে সরাসরি তার যোগাযোগ না থাকারই কথা। সরাসরি যোগাযোগ থাকতে পারে সাধন সরকারের। এই লোক সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা হয়নি।

চেম্বার লকআপ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহীদ। মুখের চেহারা আবার বদলে গেছে ওর। আহত বা ব্যথিত বলে মনে হচ্ছে না ওকে। আত্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে উঠেছে চেহারায়।

শিল্পীর রিপোর্টে উল্লিখিত নাম্বার মিলিয়ে বাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। দোতলা, ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির গেট বন্ধ দেখে খুশি হলো ও। কিন্তু গাড়ি না থামিয়ে এগিয়ে গেল সোজা, বাঁক নিল ডান দিকে। পনেরো গজ আরও এগিয়ে গাড়ি থামাল ও।

স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পাইপে আগুন ধরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল—কেউ নেই কোথাও। থাকার কথাও নয়। রাস্তাটা খোয়া বিছানো। দু'পাশের বাড়িগুলোর পেছন দিক পড়েছে এই রাস্তার দিকে।

পাঁচিলটা খুব বেশি উঁচু নয়। অনায়াসে উঠল শহীদ। লাফ দিয়ে নামার আগে দেখে নিল বাড়ির ভেতরটা।

বাড়ির সামনের দিকে পৌঁছে গেটের দিকে একবার তাকাল। তারপর তিনটে ধাপ টপকে করিডরে উঠে এগোল বন্ধ একটা দরজার দিকে।

দরজার কী-হোলটার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল শহীদ এক মুহূর্ত। হংকং-এর বার্ড কোম্পানীর তালা। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে একটা চাবি বেছে নিল ও। তারপর চাবিটা ঢুকিয়ে দিল কী-হোলে।

বিনা বাধায় ঢুকে গেল কী-হোলে চাবিটা। চাবি ঘোরাতেই শব্দ হলো—ক্লিক! খুলে গেল তালা।

কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকল শহীদ। কবাট দুটো ভিড়িয়ে দেয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল ড্রয়িংরুমটা।

সুইচ বোর্ডটা খুঁজে বের করল ও। একটা বোতাম টিপতেই সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রুচিশীল লোক সাধন সরকার। ছবির মত সুন্দর একটা ড্রয়িংরুম। আসবাবপত্রগুলো দামী তো বটেই, অত্যাধুনিকতার ছোঁয়াও লক্ষণীয়।

পাশের কামরায় যাবার দরজাটা ভেজানো। পা বাড়াবার আগে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল শহীদ। উপরতলা থেকে শব্দ এল যেন? কেউ আছে নাকি? সাধন সরকার বুঝি বাড়িতেই রয়েছে…।

কিন্তু আর কোন শব্দ না পেয়ে শহীদ ভাবল, ভুল শুনেছে ও। নরম কার্পেটের উপর দিয়ে অপর দরজার দিকে যাবার সময় শো-কেসের উপর দাঁড় করানো মিসেস রাফিয়ার ছবিটার দিকে আর একবার তাকাল ও। বিকিনি পরা ছবি। দেহের অধিকাংশই প্রদর্শিত হচ্ছে ফটোয়। গতি পরিবর্তন করে শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফ্রেমটা তুলে পরীক্ষা করার জন্যে চোখের সামনে ধরতেই ছবির কোণায় ছোট ছোট অক্ষরে লেখা দুটো লাইন দেখতে পেল ও।

কত্‌তো যে ভালবাসি তোমাকে, সাধন, বলে বোঝাতে নারি।
সে ভাষা আমার নেই—রাফিয়া।

ফ্রেম থেকে ছবিটা খুলে নিয়ে সেটা পকেটে রাখল শহীদ।

পাশের রুমটা লম্বা আকৃতির—বিরাট একটা হলরুম বলা চলে। প্রথম দর্শনে হলরুমটাকে একটা মিউজিয়াম বলে মনে হলো। মিউজিয়াম না হলেও, কম নয় কোন অংশে। চারদিকের দেয়ালে প্রাচীন যুগের যুদ্ধাস্ত্র লটকে রাখা হয়েছে। তলোয়ার, বর্শা, রাম দা, ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ, ছোরা। সাধন সরকার পুরানো যুদ্ধাস্ত্রের সংগ্রাহক। আবছাভাবে কার কাছ থেকে কথাটা যেন শুনেছিল বলে বিস্মিত হলো না শহীদ সংগ্রহগুলো দেখে। হলরুমের এক প্রান্তে একটা সিঁড়ি। উঠে গেছে উপর দিকে। পা বাড়াল শহীদ।

দুটো মাত্র রুম উপরতলায়। একটা বেডরুম। অপরটি সুসজ্জিত সীটিংরুম। সেখানে ওয়ারড্রোব, স্টীল আলমারি, দুটো বুক সেলফ, একটা শো-কেস, টিভি, সোফা এবং ড্রেসিং টেবিল রয়েছে।

কি মনে করে ওয়ারড্রোবের কবাট দুটো উন্মুক্ত করল শহীদ। শিল্পী তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল সাধন সরকার প্লেবয় টাইপের যুবক, সিনেমার নায়কদের মত পোশাক পরে। অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ওযারড্রোবের ভিতরটা দেখে ব্যাপারটা বোঝা গেল। সারি সারি ঝুলছে দামী কাপড়ের স্যুট। নিচের সেলফে জুতো হবে কম করেও পঁচিশ জোড়া। দম বন্ধ করে চেয়ে রইল শহীদ লাল শিফন এবং সেই কাপড়েরই ব্লাউজটার দিকে। মাঝখানের একটা হ্যাঙ্গারে সুন্দর ভাবে ভাঁজ করা অবস্থায় ঝুলছে জরির কাজ করা লাল শিফনটা। পাশেই ব্লাউজ এবং লাল পেটিকোট ঝুলছে।

মর্মর পাথরের মূর্তির মত নিঃসাড় কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা হিম একটা অনুভূতি উঠে আসছে উপর দিকে। হাত বাড়াল ও, মৃদু মৃদু কাঁপছে ওর হাত দুটো।

শিল্পীর পরনের শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট এগুলো। জানালা খুলে দিনের আলোয় পরীক্ষা করল, রক্তের কোন দাগ কোথাও নেই।

জানালার কাছ থেকে সরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই চমকে উঠল শহীদ। নিচের বাগানে কি যেন নড়ে উঠেছে। তাকাতেই ইয়াকুবকে দেখতে পেল ও।

বাড়ির গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেছে ইয়াকুব। গার্ডের ইউনিফর্ম নেই তার পরনে, ট্রাউজার এবং টেট্রনের চেক শার্ট। বুক ফুলিয়ে হাঁটছে সে। কিন্তু চোখে সর্তক, সাবধানী দৃষ্টি। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে। কয়েক সেকেণ্ড পর করিডরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

চিন্তা করার অবকাশ নেই। যদিও শিল্পীর ব্রেসিয়ারটা শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোটের সাথে নেই দেখে মনটা খুঁত খুঁত করছে ভারি; কিন্তু ইয়াকুব যে-কোন মুহূর্তে উঠে আসতে পারে উপরে। ইয়াকুবের চোখে পড়ে গেলে ফেঁসে যাবে ব্যাপারটা। সাবধান হয়ে যাবে ইয়াকুব স্বয়ং। সাধন সরকারের কানেও যেতে পারে সে কথাটা।

জানালার শার্সি তুলে ফেলল শহীদ। ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে। পানির পাইপটা দুই হাত মাত্র তফাতে।

শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট—তিনটে এক সাথে করে একটা কাগজ নিয়ে মুড়ে প্যাকেট মত করল, বগলে প্যাকেটটাকে চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল জানালার উপর।

পাইপ বেয়ে অনায়াসে নিচে নেমে এল শহীদ। করিডরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার খোলা দরজাটার দিকে। ইয়াকুব পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে শো-কেসটার সামনে। ছবি শূন্য ফ্রেমটা রয়েছে তার হাতে—মনে হলো কি যেন ভাবছে সে গভীরভাবে। ছবিটা নিতেই এসেছে নাকি ও?

পা বাড়াল শহীদ পাঁচিলের দিকে।

কামালের সান্ধ্য পত্রিকা যোগফলের অফিসে গিয়ে কামালকে না পেয়ে বাড়িতে ফোন করল শহীদ। জামান ছিল বাড়িতে।

'শহীদ ভাই, শিল্পীকে গত রাতে লেকের ধারে কেউ দেখেনি। কিন্তু দু'জন লোকের সন্ধান পেয়েছি আমি যারা বোম্বাই প্রিন্টের শাড়ি পরা একটি যুবতীকে লেকের দিকে যেতে দেখেছে।'

'বোম্বাই প্রিন্টের শাড়ি, তার মানে মিসেস রাফিয়া।'

শহীদ হোঁচট খেলো যেন। আবার বলল, 'মিসেস রাফিয়া···মাই গড, জামান, ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে? এদিকে, আমি সাধন সরকারের অর্থাৎ মিসেস রাফিয়ার গোপন প্রেমিকের বাড়ি থেকে শিল্পীর শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট উদ্ধার করেছি।'

জামান বলল, 'রহস্য পরিষ্কার হয়ে আসছে, তাই না, শহীদ ভাই? ওরা দু'জনই শিল্পীর খুনের সাথে জড়িত।'

শহীদ বলল, 'লোক দু'জন কে কে?'

জামান বলল, 'একজন বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভার। অনেক কষ্টে অবশ্য ভাগ্য গুণেই বলা ভাল, লোকটার সন্ধান পেয়েছি। সে তার বেবী-ট্যাক্সি করে মিসেস রাফিয়াকে লেকের কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। লোকটার একটা কথা হাস্যকর বলে মনে হয়েছে।'

'কি কথা?'

'মিসেস রাফিয়া ঘোমটা পরে ছিল।'

শহীদ বলল, 'খুবই স্বাভাবিক। অত রাতে একা বেবী-ট্যাক্সি করে নির্জন লেকের দিকে যেতে হলে ঘোমটা পরার দরকার আছে। যাতে কেউ অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে না ওঠে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছিলে, সামনে কোন গাড়ি ছিল কিনা? কিংবা মিসেস রাফিয়া কোন গাড়িকে অনুসরণ করতে বলেছিল কিনা?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। তেমন কিছু বলেনি, রাস্তায় আর কোন গাড়িও ছিল না।'

'সময়টা?'

'মাঝরাতের খানিক পর।'

শহীদ জানতে চাইল, 'আর একজন কে?'

'এই ভদ্রলোক একজন মাছ শিকারী। বিকেলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। মাছ পাননি। জেদের বশে সন্ধ্যার পর অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকেন ছিপ নিয়ে। রাত বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে একটা মাছ টোপ খায়। বড়সড় মাছ। প্রকাণ্ড একটা কাতলা পেলেন তিনি। সাড়ে বারোটার মত বাজে তখন। সময় সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন। যাক, ছিপ গুটিয়ে ফেরার সময় তিনি বোম্বাই প্রিন্টের শাড়ি পরা মিসেস রাফিয়াকে দেখতে পান। বেশ খানিকটা দূর থেকে দেখেন তিনি। দেখে ভয় পেয়ে যান। অলৌকিক ব্যাপার স্যাপারে বিশ্বাস রাখেন তিনি। মাছ ধরার সাথে পেত্নীদের একটা সম্পর্ক আছে, অনেকে বিশ্বাস করেন। এই ভদ্রলোক মিসেস রাফিয়াকে

দেখে নির্ঘাত পেত্নী বলে সন্দেহ করেন। তাড়াহুড়ো করে স্থান ত্যাগ করেন তিনি।'

শহীদ বলল, 'শিল্পীকে মিসেস রাফিয়া খুন করেছে একথা আমি এখনও বিশ্বাস করি না। তবে, শিল্পী যদি লেকের ধারে খুন হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হয় মিসেস রাফিয়া ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। কেন যে সে লুকিয়ে পড়েছে তা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠছে।'

জামান বলল, 'আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে মিসেস রাফিয়া দু'জন লোকের চোখে পড়েছে কিন্তু শিল্পীকে কেউ দেখেনি। রহস্য, তাই না?'

'সবটাই রহস্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন রহস্যই রহস্য থাকবে না। জামান, আমাদের হাতে নেই নেই করেও এখন অনেক সূত্র এবং মালমশলা এসে গেছে। অফিসে বসতে হবে আজ আবার। সূত্রগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা দরকার। শোনো, আমি দেলোয়ার মোরশেদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ফিরব খানিক পরই। কামালকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলবে তুমি।'

জামান বলল, 'শহীদ ভাই, রহমান আর আসাদ ফোনে কথা বলেছে আমার সাথে। শিল্পীর ব্যাপারটা জানে ওরা। ফিরে আসতে চাইছে ঢাকায়। আপনার অনুমতি চেয়েছে।'

শহীদ বলল, 'যে কেসের তদন্তের দায়িত্ব নিয়ে গেছে তার খবর কি?'

'তদন্ত শেষ হয়নি।'

'তাহলে ঢাকায় আসার দরকার নেই। কাজ শেষ করে ফিরতে বলে দাও।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে কামালের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল শহীদ।

গতরাতে সার্চলাইটের মত জ্যোৎস্না ছিল। দেলোয়ার মোরশেদ যদি টেলিস্কোপে চোখ রেখে লেকের দিকে তাকিয়ে থাকে শিল্পীকে নিশ্চয়ই সে দেখেছে। শুধু শিল্পীকে নয়, শিল্পীর খুনীকেও দেখে থাকতে পারে সে। কামালের সন্দেহ, লোকটা পাগলাটে হলেও, গতরাতের ঘটনার অনেকটাই সে চাক্ষুষ করেছে কিন্তু প্রকাশ করছে না। খুনীর কাছ থেকে টাকা আদায় করার তালে আছে লোকটা, কামালের ধারণা।

গাড়ি ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে এগোল শহীদ। আশপাশে বাড়ি আরও থাকলেও, খানিকটা দূরে দূরে।

একতলা বাড়ি। বাউণ্ডারি ওয়াল নেই। বেড়ার সীমানা এককালে ছিল, দু'একটা মাথা ভাঙা বাঁশ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে বোঝা যায়। বাড়ির সামনে ঝোপ-ঝাড় আর আগাছার জঙ্গল।

শোচনীয় চেহারা বাড়িটার। নির্জন, পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হয় প্রথম দর্শনে। প্লাস্টার খসে পড়েছে। লালচে ইঁটগুলো উৎকটভাবে ভেঙচাচ্ছে যেন।

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে শহীদ দেখল বাড়িটার ঢোকার দরজা বন্ধ। দরজার পাশেই একটা কাঠের পুরানো, নড়বড়ে মই। সিঁড়ি নেই নাকি? থাকলে মই কেন?

পেছন থেকে একটা হাত শহীদের কাঁধ খামচে ধরল। তৈরি ছিল না ও। কিন্তু

কাঁধে স্পর্শ পাওয়া মাত্র পকেট থেকে লোডেড রিভলভারটা বেরিয়ে এল। বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একই সাথে।

গম্ভীর মুখে ঘন ঘন মাথা নাড়ছে ডি. কস্টা।

'ব্যাড নিউজ, মি. শহীদ।'

শহীদ পকেটে রিভলভারটা রেখে দিয়ে বলল, 'একটুর জন্যে বেঁচে গেছেন। আপনি হতে পারেন ভেবেই আমি কনুই চালাইনি। দুটো পাঁজর নির্ঘাত ভাঙত।'

ডি. কস্টা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, 'পাঁজর নহে, মি. শহীদ, হামার মন ভাঙিয়া গিয়াছে। অনেক হোপ করিয়া আসিয়াছিলাম এখানে, চুরমার হইয়া গিয়াছে সকল আশা। কি যেন বলে, ঢন্য আশা কুহকিনী! টাই হইয়াছে হামার ভাগ্যে!'

'কেন কি হয়েছে? কিসের আশায় এসেছিলেন আপনি?'

ডি. কস্টা বলল, 'হাপনি হামার বন্ধু। হাপনার এই বিপডে যডি হেলপ করিটে না পারিলাম টো কবে করিব? ভাবিয়াছিলাম ডেলোয়ার মোরশেডের নিকট হইটে মূল্যবান কিছু টথ্য কালেকশন করিয়া হাপনাকে ডিব—কিন্তু কপালে আগুন—মানে, কপাল পোড়া হামার।'

'কেন, দেলোয়ার মোরশেদ বাড়িতে নেই বুঝি।'

ডি. কস্টা কথা বলল না। চেয়ে রইল শহীদের দিকে। কেন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল শহীদের বুক।

ডি. কস্টাকে মইটার দিকে ঘনঘন তাকাতে দেখে পা বাড়াল ও। মই বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল।

নিচে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ডি. কস্টা।

উপরে উঠে গেল শহীদ। যা সন্দেহ করেছিল তাই, টেলিস্কোপের কাছে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে দেলোয়ার মোরশেদ। রোগা-পাতলা একহারা চেহারার লোক, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স হবে। ফুটো হয়ে যাওয়া পরনের প্যান্টটা পুরানো। কিন্তু কপালের ফুটোটা একেবারে নতুন।

রক্ত এখনও জমাট বাঁধেনি।

খুনী কিভাবে খুন করেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কোন। মই বেয়ে উঠেছিল সে। মোরশেদ টেলিস্কোপে চোখ রেখে দূরের কোনও দৃশ্য দেখছিল। টেলিস্কোপের সামনে খুনীকে দেখে মাথা তোলে সে।

ঠিক সেই সময় গুলি করে খুনী।

কপালের ফুটোটা দেখে শহীদ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল গুলিটা বেরিয়েছে ·৪৫ পিস্তল থেকে।

কুয়াশা ৬২

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৭৭

এক

কারও মুখে কোন কথা নেই। অস্থিরভাবে ড্রয়িংরুমে পায়চারি করছে শহীদ।

মহুয়া নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'ইন্সপেক্টর গনির সাথে তোমাদের এই লুকোচুরি খেলা—আমি প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়েছি। পুলিসকে সব কথা যদি খুলে বলা হত, লোকটা হয়তো এভাবে মরত না।'

শহীদ পায়চারি থামিয়ে বলে উঠল, 'না। অনেক দূর এগিয়ে গেছি আমরা, এখন আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। জানি, দেলোয়ার মোরশেদের লাশ পাবার পর তিনি আমার মুখোমুখি হয়ে ব্যাখ্যা দাবি করবেন। কিন্তু···একবার যা বলেছি, বার বার তাই বলতে হবে। আমরা পুলিসের সাথে সহযোগিতা করছি না এটা সত্যি, কিন্তু আমরা কোন অন্যায়কে চাপা দিতে বা কোন অপরাধীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি না। ভুলে যেয়ো না, আমি মোহাম্মদ তোয়াব খানকে কথা দিয়েছিলাম তার কেস সম্পর্কে পুলিসকে কিছু জানাব না। যতক্ষণ না জানতে পারছি শিল্পী এবং দেলোয়ারের খুনের সাথে তোয়াব খান জড়িত ততক্ষণ আমি আমার কথা রক্ষা করব। কি বলছিলে তুমি, মহুয়া? পুলিসকে সব কথা জানালে মোরশেদ খুন হত না? না, তা নয়। দেলোয়ার বড্ড বেশি লোভ করেছিল, তাই মরতে হয়েছে তাকে। কেন সে সব কথা জানায়নি পুলিসকে? এখন তো আর কোন সন্দেহ নেই যে সে গতরাতের সব ঘটনাই চাক্ষুষ করেছিল। খুনীকেও সে চিনতে পেরেছিল। শুধু চিনতেই পারেনি, খুনীকে সে ইতিমধ্যে, যেভাবে হোক, জানিয়েও ছিল যে সে তাকে চিনতে পেরেছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে খুবই সোজা। খুনীর কাছ থেকে টাকা আদায় করার পরিকল্পনা করেছিল সে। যার ফলে খুনী খুন করে তার মুখ বন্ধ করে রেখে গেছে।'

পকেট থেকে একটা ফটো বের করল শহীদ।

'দেখ, কামাল, ফটোটা দেখ। এটার কথাই বলেছি তোদেরকে। সাধন সরকারের ড্রয়িংরুম থেকে পেয়েছি।'

কামাল ছবিটা নিল হাত বাড়িয়ে।

শহীদ বলল, 'প্রায় নগ্ন অবস্থায় ছবিটা তুলেছে মিসেস রাফিয়া। তোলা হয়েছে চট্টগ্রামের একটা স্টুডিও থেকে। ফটোর পেছনে ঠিকানা আছে।'

কামাল ফটোর পেছন দিকটা দেখতে দেখতে বলল, 'হ্যাঁ—জোয়ারদার ফটোগ্রাফার, চট্টগ্রাম।'

শহীদ পাইপে আগুন ধরাল, 'জামান, আজকে সন্ধ্যার ফ্লাইটেই তুমি চট্টগ্রাম যাচ্ছ। ফটোটা বছরখানেক আগে তোলা। যে ফটোটা তুলেছে সে নিশ্চয়ই মিসেস রাফিয়ার ঘনিষ্ঠ কেউ। এই রকম অর্ধ-নগ্ন ছবি একেবারে অপরিচিত কোন লোককে দিয়ে কেউ তোলায় না।'

কামাল বলল, 'কিন্তু জামানের কাজটা কি চট্টগ্রামে?'

শহীদ পায়চারি শুরু করল আবার। বলল, 'আমি মিসেস রাফিয়ার অতীত জীবন সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই। চট্টগ্রামে ছিল সে বিয়ের আগে। তার সম্পর্কে জানতে হলে চট্টগ্রামে গিয়েই জানতে হবে। আমার অনুমান জোয়ারদার স্টুডিওর মালিকের কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। জামান, টিকেটের জন্যে ফোন করো তুমি বিমানের অফিসে। যেভাবে হোক আজকের ফ্লাইটের টিকেট চাই একটা।'

সবাই দেখল শহীদ ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

শহীদ না থেমে উত্তর দিল, 'ল্যাবরেটরিতে। শিল্পীর কাপড়গুলো পরীক্ষা করব।'

বেরিয়ে গেল শহীদ।

আধঘণ্টা পর ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকল শহীদ। মুখের চেহারা একটু যেন বিমূঢ়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাল সবাই।

'রক্তের ছিটে ফোঁটাও নেই কাপড়গুলোয়। শিল্পীকে যখন গুলি করা হয়, তার পরনে এই কাপড়গুলো ছিল না—এটাই একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।'

মহুয়া প্রশ্ন করল, 'কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে খুনী কেন গুলি করবে?'

শহীদ বলল, 'জানি না। আমি সাধন সরকারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। কামাল, তুই আমার সাথে যাবি? সাধন সরকারকে কোণঠাসা করার জন্যে দরকার হলে উত্তম-মধ্যম কিছু দিতে হবে।'

কামাল বলল, 'সাধন সরকারের ওয়ারড্রোব থেকে ওগুলো নিয়ে এসে কি ভুল করিসনি তুই, শহীদ? যতক্ষণ ওগুলো তার বাড়িতে ছিল ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেত ওগুলো। আমাদের কাছে থাকায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারছি না আমরা।'

'তা ঠিক। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় ছিল না। রেখেই হয়তো আসতাম, কিন্তু ইয়াকুব এসে পড়ায় তা পারিনি। যাক, ব্যবস্থা করা যাবে একটা। সাধন সরকারের অজ্ঞাতে আবার ওয়ারড্রোবে রেখে আসব ওগুলো।'

'তারমানে আবার একটা রিস্ক নিতে হচ্ছে। তবু, এছাড়া উপায় নেই। আচ্ছা শিল্পীর জুতো আর ব্রেসিয়ার কোথায়?'

শহীদ বলল, 'সম্ভবত সাধন সরকারের বাড়িতেই কোথাও আছে। ইয়াকুবকে দেখে খোঁজার সময় পাইনি।'

বেরিয়ে গেল ওরা।

মাত্র দশ সেকেণ্ড পর দ্রুত পায়ে শহীদ এবং কামাল ড্রয়িংরুমে ঢুকল। ঢুকে

দাঁড়াল না ওরা। মহুয়ার বিস্মিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে ড্রয়িংরুমের অপর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শহীদ বলল, 'ইন্সপেক্টর গনি আসছেন, মহুয়া। হাতে এখন সময় নেই। ওঁকে বলবে, আমরা কোথায় গেছি, কখন ফিরব—কিছুই তুমি জানো না।'

অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা দু'জন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় এসে বসল মহুয়া। একটা বই তুলে নিয়ে মাথা নিচু করে পড়ার ভান করতে শুরু করল সে, একমুহূর্ত পরই বিরাট বপু নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল ইন্সপেক্টর গনি।

মুখ তুলে মিষ্টি করে হাসল মহুয়া, 'আসুন, মি. গনি। অনেকদিন পর আপনি তিনতলায় উঠলেন...'

'শহীদ সাহেব কোথায়?' একটু যেন বেসুরো লাগল মহুয়ার কানে ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বর। সোফায় বসল সে। টুপি নামিয়ে হাঁটুর উপর রাখল। তারপর বলল, 'অফিস বন্ধ দেখলাম। গোয়েন্দারা নিশ্চয়ই বাড়িতে আছেন?'

মহুয়া বলল, 'শহীদ আর কামাল এই খানিক আগে বাইরে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেছে বলে যায়নি। কখন ফিরবে তাও আমি জানি না।'

ইন্সপেক্টর গনি চেয়ে রইল মহুয়ার দিকে। মিথ্যে কথা বলতে অভ্যস্ত নয় মহুয়া, তা বুঝতে পারল সে। একটা প্রশ্ন করেছে সে, অথচ উত্তর দিল মহুয়া তিনটে প্রশ্নের। সত্য কথা যে বলছে না এ থেকেই পরিষ্কার ধরা যায়।

'হুঁ।' উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর।

'সে কি! উঠছেন যে! এক কাপ চা না খাইয়ে ছাড়ছি না আপনাকে।'

তেতো কুইনাইন খাবার সময় মানুষ যেমন মুখ বিকৃত করে তেমনি মুখ বিকৃত করে ইন্সপেক্টর গনি বলল, 'দম ফেলবার ফুরসত নেই, মিসেস শহীদ। চা আর একদিন খাব।'

'শহীদ ফিরলে কিছু বলতে হবে?'

'হ্যাঁ। বলবেন...না, কিছু বলবার দরকার নেই। আমি যা বলতে এসেছিলাম তা তিনি জানেন। আমার মনে হয় আপনিও জানেন, মিসেস শহীদ।'

'আমি! আমি কি জানি!' মহুয়া আকাশ থেকে পড়বার ভান করল।

'দেলোয়ার মোরশেদ খুন হয়েছে। জানেন না?'

ঘন ঘন চোখের পাতা খুলে আর বন্ধ করে ইন্সপেক্টর গনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মহুয়া নিভাঁজ মুখে, অস্ফুটে বলল, 'দেলোয়ার...কি যেন বললেন...মোরশেদ? কে? আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'শখের গোয়েন্দা মি. শহীদ খানের উপযুক্ত স্ত্রী আপনি। আজ আর একবার কথাটা স্বীকার করে যাচ্ছি।'

বেরিয়ে গেল ইন্সপেক্টর দ্রুত পায়ে।

মৃদু হাসি ফুটল মহুয়ার ঠোঁটে।

ঠিক হলো শহীদ পাঁচিল টপকে বাড়ির ভিতর ঢুকবে। লুকিয়ে থাকবে ও বাগানের ভিতর। কামাল দরজার কলিং বেল বাজাবে। আগেই জেনেছে ওরা, সাধন সরকারের বাড়িতে চাকর-বাকর বা আর কোন লোক থাকে না। প্লেবয় টাইপের

যুবক, খাওয়া-দাওয়া সে হোটেলেই সারে। বাড়িতে থাকে ও খুব কম। যাই হোক, কলিং বেলের শব্দ শুনে সে গেটের কাছে আসবে।

সেই ফাঁকে শহীদ বাগান থেকে চুপিসারে উঠে যাবে করিডরে, সেখান থেকে ড্রয়িংরুম হয়ে হলরুমে, হলরুম থেকে দোতলার সীটিংরুমে। ওয়ারড্রোবে কাপড়-চোপড়গুলো রেখে জানালা গলে পাইপ বেয়ে নিচে নেমে আসবে ও। ইতিমধ্যে কামাল সাধন সরকারের সাথে কথা বলার জন্যে তার ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসবে। শহীদ নিচে নেমে ওদের সাথে যোগ দেবে।

অসুবিধে হলো না। পাঁচিল টপকাল শহীদ। বাগানটা বেশ বড়। ভিতরে ঢুকে এক জায়গায় দাঁড়াল ও। কামাল কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল।

ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে করিডরে কেউ বেরুচ্ছে না দেখে কামাল আবার বোতামে চাপ দিল। কিন্তু কাজ হলো না এবারও। আবার চেষ্টা করল কামাল। বেশ শোনা যাচ্ছে বেলের শব্দ। কিন্তু সাধন সরকারের দেখা নেই।

কামাল হাত ইশারায় জানতে চাইল—কি করা যায় এখন? শহীদ ইশারা করে বলল, 'আবার কলিং বেলের বোতামে চাপ দিতে।'

তাই করল কামাল।

'কিসের রিহার্সেল হচ্ছে শুনি? পোশাক-আশাক দেখে তো বোঝবার উপায় নেই যে চোর-ছ্যাঁচোড়।'

চমকে গিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল শহীদ। সবেগে ঘাড় ফেরাতে স্যুট পরা একজন যুবককে মাত্র সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। বলে দিতে হলো না এই যুবকই সাধন সরকার। ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে নায়কোচিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। ভয় বা ভাবনার এতটুকু ছায়া নেই মুখের চেহারায়। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় নিজের উপর আস্থার অভাব নেই কোন। ব্যাকব্রাশ করা চুল, লম্বা জুলফি, ক্লিন শেভ।

'আপনিই সাধন সরকার?'

সাধন সরকার শহীদের সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুটটা দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দামী পোশাক দেখে শহীদের সাথে ঠিক কি রকম ব্যবহার করতে হবে বুঝতে পারছে না সে।

'সাধন সরকার হই বা না হই—আমার প্রশ্নের উত্তর দিন আগে। উদ্দেশ্য কি? চোরের মত ঢুকেছেন কেন বাড়ির ভিতর?'

শহীদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে পকেটে হাত দিল। একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল ও।

কার্ডটা নেবে কি নেবে না ভেবে কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সাধন সরকার। তারপর প্রায় ছোঁ মেরে নিল সেটা শহীদের হাত থেকে। পড়ল কি পড়ল না, ফিরিয়ে দেবার জন্যে হাতটা লম্বা করে দিল শহীদের দিকে। বলল, 'শহীদ খান। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তাতে কি?'

শহীদ বলল, 'ডিটেকটিভদের অনেক সময় অপ্রীতিকর পদ্ধতিতে কাজ করতে হয়। আমরা এসেছি আপনার সাথে একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে। পুলিস

পাঠাতে পারতাম, কিন্তু মুশকিল কি জানেন, যে ব্যাপারে আপনাকে আমরা সন্দেহ করছি সে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা নিজেরাই মাথা ঘামাতে চাই।'

কামালের উপস্থিতি টের পেল শহীদ ওর পিছনে।

সাধন সরকার ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমাকে সন্দেহ করছেন? কি ব্যাপারে?'

কামাল শহীদের পাশে চলে এল, বলল, 'মি. সরকার, আলোচনাটা আপনার ড্রয়িংরুমে বসে হওয়া উচিত।'

কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল সাধন সরকার কামালের দিকে। 'আপনি?'

শহীদ বলল, 'আমার সহকারী, কামাল আহমেদ।'

সাধন সরকার শহীদের দিকে তাকাল, 'মাফ করবেন, আপনাদের সাথে আলোচনা করার সময় আমার নেই।'

কামাল বলল, 'পুলিস এলে কি এই কথাই বলবেন তাদেরকে?'

সাধন সরকার দুই হাত পকেট থেকে বের করে কোমরে রাখল। বলল, 'দেখুন, মিছে চেষ্টা করছেন আমাকে ভয় দেখাবার। আপনারা যে উদ্দেশ্যেই এসে থাকুন, উদ্দেশ্যটা যে সৎ নয় তা বোঝা গেছে বাড়িতে ঢোকার কৌশল দেখেই। এবার, সোজা বেরিয়ে যান গেট দিয়ে।'

শহীদ বলল, 'উত্তেজিত হবেন না, মি. সরকার। আমরা আপনার সাথে আলোচনা করতে এসেছি। আলোচনা করেই যাব।'

'আমি রাজি নই।'

কামাল মৃদু শব্দে হেসে উঠল। বলল, 'কিন্তু আমরা আপনাকে যেভাবে হোক রাজি করাব।'

ফুঁসে উঠল সাধন সরকার, 'তার মানে! কি বলতে চান আপনি?'

কামাল বলল, 'আলোচনা করতেই হবে, শুধু এই কথাই বলতে চাই।'

'আমি আলোচনা করব না। আপনাদেরকে আমি চিনি না। চেনার দরকারও নেই। তাছাড়া, আপনাদের উদ্দেশ্য সৎ নয়।'

কামাল বলল, 'শহীদ?'

শহীদ একটু বিনয়ের সাথেই বলল, 'মি. সরকার, তর্ক করছেন কেন খামোখা। সত্যি কথা, আলোচনা আমরা না করে ফিরতে পারি না।'

কামাল বলল, 'দরকার হলে…'

তেড়ে এল সাধন সরকার, 'দরকার হলে কি? গায়ের জোর খাটাবেন নাকি? খাটান তো, দেখি কত বড় সাহস!'

কামালের একেবারে বুকের সামনে বুক এনে দাঁড়াল সাধন সরকার।

মুচকি হেসে কামাল তাকাল শহীদের দিকে, 'কি রে?'

শহীদ বলল, 'এখনই না। দাঁড়া, চেষ্টা করে দেখি বোঝানো যায় কিনা। মি. সরকার, আপনাকে এই শেষবার বলছি, চিন্তা করে দেখুন।'

'বুঝেছি, সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না।' কথাটা বলেই সাধন সরকার ঘুসি ছুঁড়ল কামালের মুখ লক্ষ্য করে।

শহীদ এক পাশে সরে গেল ধীরে সুস্থে, মারামারিটা যেন বিনা বাধায় চলতে

পারে।

কিন্তু লড়াইটা জমল না। কামাল তৈরিই ছিল। সাধন সরকারের মুঠি পাকানো ঘুসিটা মুখের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সাঁৎ করে এক পাশে সরে গিয়ে সাধন সরকারের তলপেটে জুতসই একটা আধমণ ওজনের ঘুসি মেরেই সব পণ্ড করে দিল সে। সাধন সরকার চিৎ হয়ে পড়ে গেল ঘাসের উপর। তলপেট চেপে ধরে কাতরাতে শুরু করল সে, 'বাবা রে, মা রে!'

মনোক্ষুণ্ণ দেখাল কামালকে। শুরু হতে না হতেই ফাইটটা এভাবে শেষ হয়ে যাবে তা সে ভাবেনি।

শহীদের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'আমার মনে হয় আর কোন ঝামেলার সৃষ্টি হবে না।'

শহীদ এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল সাধন সরকারের মুখের উপর। বলল, 'তখনই বলেছিলাম, কিন্তু শুনলেন না আমার কথা। খুব লেগেছে বুঝি? উঠতে পারবেন, নাকি ধরে তুলব?'

সাধন সরকার ব্যথা খুব একটা পায়নি। লজ্জায় এবং রাগে লাল হয়ে উঠেছে গোলগাল ফর্সা মুখটা। নিজেই উঠল। কাঁপছে থরথর করে, 'এর ফল কি হবে দেখবেন?'

কামাল বলল, 'আচ্ছা, দেখব'খন। দেখাদেখির ব্যাপারটা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা থাক। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত আগে আগে হাঁটুন ড্রয়িংরুমের দিকে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সাধন সরকার। হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। কামাল পা বাড়াল। শহীদও। চেষ্টা করে হাসি দমন করছে ও।

কিন্তু ড্রয়িংরুমে ঢোকার পর সিরিয়াস হয়ে উঠল শহীদ! মুখের চেহারায় কাঠিন্য ফুটে উঠল ওর।

সোফায় বসল সাধন সরকারের মুখোমুখি। হাতের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল। সেটা সাধন সরকারের কোলে গিয়ে পড়ল।

আঁতকে উঠল সাধন সরকার, যেন সাপ পড়েছে কোলের উপর, 'কি! কি এটা?'

শহীদের দুই চোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, 'খুলে দেখুন।'

প্যাকেটটা খুলল সাধন সরকার, 'এযে দেখছি শাড়ি, ব্লাউজ—কার? আমাকে দেখাবার কারণ? এ কি ধরনের ঠাট্টা?'

শহীদ মনের অস্থিরতা চেপে রাখার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। উঠে দাঁড়াল ও। দু'পা এগিয়ে সোফায় বসা সাধন সরকারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার ওয়ারড্রোবে ওগুলো ছিল। জানতে চাই কিভাবে, কোত্থেকে এল ওগুলো আপনার ওয়ারড্রোবে?'

'পাগল। বদ্ধ পাগল!'

শহীদ নিজেকে শান্ত রাখার জন্যে পকেট থেকে পাইপ বের করল। গ্যাস লাইটার জ্বেলে পাইপ ধরাল ও। অস্থির হয়ো না, শহীদ, নিজেকে বলল মনে মনে। উত্তেজিত হলে কাজ এগোবে না।

'মি. সরকার, মন দিয়ে শুনুন। আমি শহীদ খান, প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কয়েক ঘণ্টা আগে এই বাড়িতে আর একবার এসেছিলাম আমি। বাড়িতে কেউ ছিল না। আমি এসেছিলাম একজনের খোঁজে। তাকে পাইনি। কিন্তু এটা সেটা দেখতে দেখতে আপনার ওয়ারড্রোবে ওই শাড়ি, ব্লাউজ এবং পেটিকোটটা পাই। ওগুলো সাথে করে নিয়ে যাই আমি।'

'বাহ! চমৎকার। সাথে করে নিয়ে যান এবং তারপর—আবার ফেরত এনেছেন—খুব বুদ্ধিমান লোক আপনি, স্বীকার করতেই হবে!' ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল সাধন সরকার।

'সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার কারণ, কাপড়গুলোয় রক্তের দাগ পাওয়া যায় কিনা ল্যাবরেটরিতে তা পরীক্ষা করে দেখার দরকার ছিল।'

'কি···কি বললেন? রক্তের দাগ?'

শহীদ বলল, 'ওই কাপড়গুলো শিল্পীর। শিল্পী, গত রাতে ধানমণ্ডি লেকের ধারে খুন হয়েছে।'

সিধে হয়ে বসল সাধন সরকার। চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল, অসহায় বোধ করছে সে। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এসব কথা আপনি আমাকে শোনাচ্ছেন কেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কি?'

শহীদ বলল, 'জানার জন্যে এসেছি আমরা। জানতে চাই শিল্পী, যাকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে, তার পরনের কাপড়-চোপড় আপনার বাড়িতে এল কোত্থেকে?'

সাধন সরকার কিছুক্ষণ সময় নিল নিজেকে শান্ত করার জন্যে। শহীদের চোখে চোখ রেখে অবিচলিত কণ্ঠে সে বলল, 'দেখুন, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারি বা না পারি, আপনার কথা বিশ্বাস করার কোন কারণও নেই। দয়া করে এই সব কাপড়-চোপড় নিয়ে চলে যান, আর কাউকে গিয়ে শোনান আপনার গাঁজাখুরি গল্প।'

শহীদ বলল, 'আমার হাতে প্রমাণ আছে আপনি শিল্পীর খুন হওয়ার সাথে জড়িত। শিল্পী আমার সহকারিণী ছিল। মিসেস রাফিয়ার ওপর নজর রাখছিল সে···।'

'বুঝেছি! ডিটেকটিভ না ছাই! আপনারা ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছেন আমাকে।'

শহীদ বলল, 'ব্ল্যাকমেইল তো ছোটখাট ব্যাপার। টাকা দিয়েই মুক্তি পাওয়া যায়। আমরা আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছি না, মি. সরকার, আসলে আমরা আপনাকে শিল্পীর হত্যাকারী প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। আমাদের হাতে কিছু প্রমাণও আছে।'

শহীদের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সাধন সরকার। কি বলতে গিয়েও বলল না. হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

কামাল এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। এবার তার দেহটা নড়ে উঠল। ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সাধন সরকারের ফর্সা গালে আঘাত করল সে।

সোফায় কাত্ হয়ে শুয়ে পড়ল সাধন সরকার।

শহীদ বলল, 'কামাল, ভদ্রলোককে একটু উচিত শাস্তি দে তো।'

'আমি···আমি চিৎকার করব! আমি পুলিস ডাকব! ডাকাত···আপনারা ডাকাতি করতে এসেছেন!' মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে সাধন সরকার। কাত্ হয়ে শুয়ে শুয়েই গলা ছেড়ে চিৎকার করতে শুরু করেছে।

চাপা গলায় শহীদ বলল, 'ইন্সপেক্টর গনির পদার্পণ ঘটতে পারে কিন্তু! তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের।'

'দু'চার ঘা না খেলে লাইনে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

শহীদ বলল, 'না।'

ওদেরকে চাপা স্বরে কথা বলতে দেখে চিৎকার থামিয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সাধন সরকার। 'কি···! কি আলোচনা করছেন? আমাকে খুন করবেন? আমাকে খুন করে···'

ধড়মড় করে সোফায় উঠে বসল সে। পাগলের মত হাত ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠল, 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! এখনও যদি ভাল চান, কেটে পড়ুন। আমি···।'

শহীদ এক পা এগিয়ে সাধন সরকারের পিঠে হাত রাখল। 'উত্তেজিত হবেন না, উত্তেজিত হবেন না। আমরা ডাকাত নই। আপনার কোন ক্ষতি করতেও আসিনি। আপনি যদি কোন অপরাধ করে না থাকেন, তাহলে আমাদের তরফ থেকে কোন ভয় নেই। আমাদের সন্দেহ হয়েছে আপনি শিল্পীকে খুন করেছেন। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিন—তাহলেই জানতে পারব আমাদের সন্দেহ অমূলক কিনা। আপনি নিরপরাধ হলে আমরা জানতে পারব আপনার উত্তর থেকে।'

একটু শান্ত হলো সাধন সরকার। বলল, 'ঠিক তো? আমি নিরপরাধ হলে আমার কোন ক্ষতি করবেন না? ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করবেন না?'

'ঠিক।'

সাধন সরকার রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। কামালের দিকে ভুলেও তাকাল না সে। বলল, 'বলুন, কি প্রশ্ন আপনার?'

মুখে যাই বলুক, শহীদ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে শিল্পীর খুনের সাথে এ লোক জড়িত নয়। কিন্তু দ্রুত যেভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে এক পায়ে খাড়া হয়ে উঠল, সন্দেহ জাগল নতুন করে—লোকটার আচরণের সবটাই নিপুণ অভিনয় নয় তো?

শহীদ পাইপে আগুন ধরাল নতুন করে। বলল, 'আগে ঘটনাটা শুনুন। তিন দিন আগে মোহাম্মদ তোয়াব খান আমাদেরকে একটা কেসের দায়িত্ব দেন। কারণটা চাপা থাক। শিল্পীকে আমরা দায়িত্বটা দেই। সে মিসেস রাফিয়ার উপর নজর রাখতে শুরু করে। কেসটা পাবার দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সে রিপোর্ট দেয় আমাকে। রিপোর্টে সে জানায় মিসেস রাফিয়া আপনার সাথে গোপনে দেখা করেছে দুই দিনে দু'বার। আপনারা গোপনে প্রেম করছেন তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারে। এই তথ্যটা তোয়াব খানকে জানানো হয়নি সাথে সাথে। যাক, সেই রাতে, একটার দিকে শিল্পী ফোন পায় একটা। কার ফোন পেয়েছিল সে জানা যায়নি।

ফোন পেয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় সে। তারপর, রাত তিনটের সময় তার লাশ আবিষ্কৃত হয় লেকের ধারে।'

শহীদ থামল। পাইপের দিকে একবার তাকাল, তারপর মুখ তুলল আবার, চোখ রাখল সাধন সরকারের বিস্ফারিত চোখে, 'শিল্পীর খুনী আমাদেরকে উভয় সংকটে ফেলেছে, স্বীকার করছি। আমরা তোয়াব খানকে কথা দিয়েছিলাম তার স্ত্রীর উপর নজর রাখার কারণটা পুলিসকে জানাব না। কথা দিয়ে কথার মূল্য রাখি আমরা, তাই কোন কথাই পুলিসকে জানাতে পারছি না। জানাতে পারি বা না পারি, আমাদের একজন সহকারিণী খুন হয়েছে, আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না, তাই না?'

স্তম্ভিত সাধন সরকার চেয়ে আছে শহীদের দিকে। চোখ মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কি ভাবছে সে, কিংবা আদৌ কিছু ভাবছে কিনা।

আবার বলতে শুরু করল শহীদ। 'মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার পরপরই আমরা তদন্তের কাজ শুরু করি। ইতিমধ্যে অনেক সূত্র হাতে এসেছে আমাদের। তার মধ্যে একটি, আপনার ওয়ারড্রোবে শিল্পীর কাপড়-চোপড় পাবার ব্যাপারটা। এটা একটা মূল্যবান সূত্র। আপনার দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করবে—আপনি খুনী। যাক, এ প্রসঙ্গে পরে আসছি আমি। এই মুহূর্তে আমরা দুটো প্রশ্নের উত্তর চাই। এক, কাপড়-চোপড়গুলো কিভাবে এল আপনার ওয়ারড্রোবে? দুই, মিসেস রাফিয়া কোথায়? তাকে আমরা পাচ্ছি না। তাকে পাব আশা করেই কয়েক ঘণ্টা আগে আমি এই বাড়িতে গোপনে অনুপ্রবেশ করেছিলাম। যাক, মিসেস রাফিয়াকে না পেলেও, শিল্পীর কাপড়গুলো আপনার ওয়ারড্রোবে পেয়েছি। এখন—হয় আপনি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন, নয়তো চলুন, থানায় যাওয়া যাক। পুলিসকে সব কথা না বললেও চলবে। তাদেরকে শুধু বলব আপনি খুন করেছেন শিল্পীকে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে তারা লুফে নেবে।'

'আপনি···আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনাদের সহকারিণী, মিস শিল্পীকে আমি জীবনে কখনও চোখেই দেখিনি। তাকে খুন করব কেন আমি? আমার মোটিভ কি?'

'মোটিভ আছে বইকি। গোপনে প্রেম করেছেন মিসেস রাফিয়ার সাথে—শিল্পী তা জেনে ফেলেছিল। এ খবর তোয়াব খানের কানে গেলে নির্ঘাৎ গলায় ছুরি চালিয়ে কোরবানি দিত আপনাকে।'

সাধন সরকার বলল, 'কিন্তু গত রাতে আমি ঢাকাতেই ছিলাম না। খুন করব কিভাবে? আমি প্রমাণ করতে পারি আমি ঢাকায় ছিলাম না গত রাতে···'

'প্রমাণ করতে পারবেন?'

সাধন সরকার সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'বিশ্বাস করুন, মি. শহীদ, আমি কাউকে খুন করিনি। আমি গত রাতে নারায়ণগঞ্জে ছিলাম, আমি ফোন নাম্বার দিচ্ছি···।'

'দিন।'

চিন্তিত হয়ে উঠল শহীদ মনে মনে। তবে কে? কে খুন করেছে শিল্পীকে?

বোঝাই যাচ্ছে সাধন সরকার নয়।

কামাল পকেট থেকে কাগজ কলম বের করল, 'ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিন।'

সাধন সরকার বলল, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে। ঠিকানাটা কাউকে বলবেন না। বলবেন না যে আমি সেখানে রাত কাটিয়েছিলাম।'

কামাল বলল, 'ঠিক আছে।'

'একটা মেয়ের বাড়িতে ছিলাম আমি। ঠিকানাটা…'

বাড়ির ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার লিখে নিল কামাল।

শহীদ বলল, 'আপনি শিল্পীকে খুন করেননি তা কিন্তু প্রমাণ হবে না আপনার গার্ল ফ্রেণ্ড যদি বলেও যে আপনি তার কাছে রাত কাটিয়েছেন। আপনি হয়তো তাকে শিখিয়ে রেখেছেন কেউ প্রশ্ন করলে কি উত্তর দিতে হবে।'

সাধন সরকারকে বিচলিত বলে মনে হলো না। বলল, 'তা ছাড়া, আমার ওই গার্ল ফ্রেণ্ডের সাথে আমি ডিনার খেয়েছি চকমক বারে, রাত সাড়ে এগারোটায় গেছি স্টার নাইট ক্লাবে, ওখান থেকে বেরিয়েছি রাত দেড়টায়। নাইট ক্লাবে অন্তত পনেরো-বিশজনকে পাওয়া যাবে যারা আমাকে দেড়টা পর্যন্ত দেখেছে সেখানে।'

শহীদ বলল, 'বুঝলাম। এত কথার পরও কিন্তু আপনি ব্যাখ্যা করতে পারছেন না কাপড়গুলো কিভাবে আপনার ওয়ারড্রোবে এল।'

'বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

শহীদ বলল, 'দোতলাটা একবার ভাল করে সার্চ করতে চাই আমরা। জুতো আর ব্রেসিয়ার পাওয়া যায়নি। ওগুলোও সম্ভবত আপনার এখানেই আছে…।'

সাধন সরকার প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল, বলল, 'দেখুন, আবার আপনারা আমাকে প্যাঁচে জড়াবার চেষ্টা করছেন।'

কামাল বলল, 'দোতলাটা সার্চ করতে দিতে আপত্তি করবেন নাকি?'

'না, না—কিন্তু…আমি কিছু বুঝতে পারছি না!…আমার বাড়িতে ওসব আসবে কেন? এ নিশ্চয়ই কারও ষড়যন্ত্র!'

'ষড়যন্ত্র, না? কার ষড়যন্ত্র, মি. সরকার? কে আপনার শত্রু?'

'আমার শত্রু নেই।'

'তবে কেউ ষড়যন্ত্র করবে কেন?'

সাধন সরকার চট করে বলে বসল, 'আমার এখনও সন্দেহ হচ্ছে, আপনাদের উদ্দেশ্য সৎ নয়। ষড়যন্ত্র আপনারাই যে করেননি তা বুঝব কিভাবে…।'

কামাল উঠল, 'দোতলায় যাচ্ছি আমরা।'

শহীদ পা বাড়াল।

সাধন সরকার অনুসরণ করল ওকে ভিজে বেড়ালের মত।

উপরে উঠে শহীদ দেখল ওয়ারড্রোবের ভিতর, শো-কেসের মাথা, সোফার তলায় সন্ধান করছে কামাল।

তেমন উৎসাহ দেখা গেল না শহীদের মধ্যে। জুতো এবং ব্রেসিয়ার পাওয়া গেলেই বা কি? এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে সাধন সরকার এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। কেউ তাকে ফাঁসাবার জন্যে কাপড়-চোপড়গুলো এখানে রেখে গেছে।

কেউ মানে খুনী।

খুনী কে? সেটাই একমাত্র প্রশ্ন।

জুতো জোড়া পাওয়া গেল সোফার নিচে।

সাধন সরকার কেমন যেন বোবা হয়ে গেল। ঘন ঘন তাকাল কামালের দিকে। কিন্তু কথা বলল না একটাও।

কামাল বলল, 'কি বলবার আছে আপনার?'

সাধন সরকার শহীদের দিকে তাকাল অসহায় ভাবে।

শহীদ বলল, 'কামাল, ব্রেসিয়ারটা না পাবার কোন কারণ নেই। আরও খোঁজ করো। মি. সরকার, আমার সাথে এসে বসুন।'

সোফায় বসল শহীদ। মুখোমুখি জড়সড় হয়ে বসল সাধন সরকার।

'বোঝা যাচ্ছে, কেউ ষড়যন্ত্রই করেছে আপনার বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই সে আপনার শত্রু। শত্রু আপনার যেই হোক, সে-ই খুনী। সে চেয়েছিল কাপড়গুলো পুলিসের হাতে পড়বে অর্থাৎ পুলিস আবিষ্কার করবে এখান থেকে—তারপর কি ঘটবে? আপনাকে পুলিস গ্রেফতার করবে, তাই না?'

বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল সাধন সরকার।

শহীদ বলল, 'চিন্তা করে দেখুন এবার, আপনার শত্রু কে?'

'শত্রু নেই আমার।'

শহীদ বলল, 'মিসেস রাফিয়ার শত্রু হতে পারে খুনী। মিসেস রাফিয়া—কোথায় সে?'

'গতকাল একবার দেখা হয়েছে। তারপরের খবর আমি জানি না।'

'তার সাথে কত দিনের পরিচয় আপনার?'

সাধন সরকার বলল, 'মাত্র মাস খানেক কিংবা তার চেয়েও কম হবে। একটা ক্লাবে পরিচয় হয় আমাদের। আমি নই, রাফিয়াই যেচে পড়ে পরিচয় করে।'

শহীদ জানতে চাইল, 'মিসেস রাফিয়াকে নিয়ে কখনও কোন ঝামেলায় বা বিপদে পড়েছেন?'

'মানে?'

শহীদ বলল, 'ধরুন, কোন দোকানে কেনা-কাটার জন্যে ঢুকেছেন, অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছেন মিসেস রাফিয়ার আচরণের মধ্যে?'

'না তো!'

সতর্ক, হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে সাধন সরকার।

'কোন জিনিস হারিয়েছেন আপনি মিসেস রাফিয়ার সাথে পরিচয় হবার পর?'

সাধন সরকার চোখ বড় বড় করে বলে উঠল, 'বুঝেছি! রাফিয়া তাহলে ক্লেপটোম্যানিয়ায় ভুগছে! ওর স্বামী সে কারণেই ওর ওপর নজর রাখার জন্যে আপনাদেরকে নিয়োগ করেছে, তাই না?'

শহীদ বিরক্তির সাথে বলল, 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'না, আমার কোন জিনিস হারায়নি।'

'সে জানত তাকে আমরা অনুসরণ করছি? কিছু বলেছিল আপনাকে?'

'জানত। বলেছিল একটি মেয়ে ওকে অনুসরণ করছে। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, ওর ওই কথা শুনে আমি সিদ্ধান্ত নিই ওকে এড়িয়ে চলব। আপনার সহকারিণী রিপোর্টে যা বলেছে তা সত্যি নয়, মি. শহীদ। আমি প্রেমে পড়িনি রাফিয়ার। আজ যা ঘটল তারপর তো আর রাফিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখার কোন ইচ্ছাই নেই। না, শেষ হয়ে গেছে ওর সাথে আমার সম্পর্ক।'

শহীদ বলল, 'আমাদের সন্দেহ হবার কারণ আছে, মিসেস রাফিয়াকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল। তেমন কিছু সে বলেছিল আপনাকে এ ব্যাপারে?'

বোকার মত চেয়ে রইল সাধন সরকার। তারপর বলল, 'এত কাণ্ড! কই না, বলেনি তো। তবে গতকাল সে আমার কাছ থেকে টাকা ধার চেয়েছিল।'

'কত?'

সাধন সরকার এই প্রথম হাসল, বলল, 'অঙ্কের কথা তোলার অবকাশই দিইনি আমি। বিবাহিতা মেয়েদেরকে টাকা ধার দেওয়া পছন্দ করি না। স্রেফ সম্ভব নয় বলে দিয়েছিলাম।'

'আপনার সাথে কথা বলার সময় কাজী হানিফের নাম উল্লেখ করেছিল সে কখনও?'

'কাজী হানিফ। ফেয়ার ভিউ নাইট ক্লাবের মালিক না লোকটা? সে-ও জড়িত এ ব্যাপারে? হেই ভগবান! কই, না।'

'চেনেন লোকটাকে?'

'কয়েকবার ফেয়ার ভিউয়ে গেছি। সেই সূত্রে দেখেছি। কেউ হয়তো নামটা বলে লোকটাকে দেখিয়েছিল—এই পর্যন্ত। পরিচয় নেই।'

'মিসেস রাফিয়া এখানে এসেছিল কখনও?'

সাধন সরকার ইতস্তত করল খানিকক্ষণ, 'এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করবেন না আমাকে দয়া করে।'

'ইয়াকুব নামের কাউকে চেনেন?'

'রাফিয়ার শোফারের কথা বলছেন? দু'একবার দেখেছি ছোকরাকে। রঙবাজ টাইপের, না? কিন্তু তার প্রসঙ্গ তুলছেন কেন?'

শহীদ বলল, 'মিসেস রাফিয়ার শোফার নাকি সে? কিন্তু আমি জানতাম মুক্তা নিকেতনের গার্ড সে।'

'হতে পারে। রাফিয়াকে নিয়ে গাড়ি চালাতে দেখেছি বলে বললাম। কিছু জানি না তার সম্পর্কে।'

'আপনার ড্রয়িংরুম থেকে মিসেস রাফিয়ার ছবিটা আমি নিয়ে গেছি। ছবিটা নিশ্চয়ই সে-ই আপনাকে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। রাফিয়াই আমাকে দিয়েছিল। দারুণ একটা ছবি, কি বলেন?'

'ছবিটা কতদিন আগে তোলা হয়েছে তা জানেন?'

'কয়েক বছর আগে নিশ্চয়ই। চট্টগ্রামে থাকত তখন ও। ছবিটা ফেরত দেবেন না?'

'না।'

কামাল বলল, 'ব্রেসিয়ারটা নেই এ বাড়িতে। কিন্তু মেয়েদের পোশাক পেয়েছি নিচের ওয়ারড্রোবে। কার ওগুলো?'

সাধন সরকার বলল, 'স্বীকার করছি, রাফিয়া এখানে প্রায়ই আসত—কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে তার সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখব না। শাড়িটাড়ি যা দেখেছেন—সব ওরই।'

শহীদ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বড্ড বিরক্তিকর চরিত্র আপনি, মি. সরকার। আপনার সাথে আর কোন আলাপ নেই আমাদের। তবে ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাবেন না অনুমতি না নিয়ে। আর, পুলিসের কাছে গেছেন জানতে পারলে আমি আমার সহকারী এই কামাল আহমেদকে পাঠাব আপনার কয়েকটা পাঁজর, নাক এবং একটা করে দুই হাতের দুটো আঙুল মট মট করে ভেঙে দেবার অনুমতি দিয়ে। চললাম।'

একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এল শহীদ রুম থেকে। বারান্দা ধরে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগল ও। কামাল কাপড়-চোপড়ের প্যাকেট বগলে নিয়ে অনুসরণ করল ওকে।

ম্লান, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে দু'জনকেই।

গাড়িতে এসে উঠল ওরা।

'সন্দেহের তালিকা থেকে গর্দভটাকে বাদ দিতে হচ্ছে, তাই না?'

শহীদ বলল, 'কাজে খুঁত না রাখাই ভাল। তুই ট্যাক্সি নিয়ে নারায়ণগঞ্জে চলে যা। যে সব জায়গার নাম বলেছে সব জায়গায় যাবি, কেমন?'

কামাল বলল, 'মিথ্যে কথা বলেনি ও, শহীদ। তবু, তুই যখন বলছিস...'

দুই

অফিসের সামনে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল শহীদ। বুকের ভিতর রক্ত ছলকে উঠেছে অফিসরুমের ভিতর আলো জ্বলতে দেখে।

কে হতে পারে? জামান চট্টগ্রামে গেছে। কামালকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসছে ও এইমাত্র।

মহুয়া? অসম্ভব। মহুয়া এমনিতেই সচরাচর অফিসে আসে না।

মি. সিম্পসন নাকি? নাকি ইন্সপেক্টর গনি?

এক মুহূর্ত চিন্তা করল শহীদ। না, তা হতে পারে না। মি. সিম্পসন যদি ওর ফেরার জন্যে অপেক্ষা করতেই মনস্থ করেন, অফিসে থাকবেন কেন তিনি একা একা? ইন্সপেক্টরই বা কেন বসে থাকবে একা?

তবে?

স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে নামল শহীদ। খোলা রয়েছে গেট। সরাসরি গেট দিয়ে ঢুকেছে কেউ।

কে? অফিসে আলো জ্বেলে কি করছে সে?

দু'পাশে বাগানের মাঝখান দিয়ে এগোল শহীদ। পকেট থেকে রিভলভারসহ

হাতটা বের করে করিডরে উঠল।

রিসেপশনের দরজাটা খোলা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে ভিতরে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না।

পা টিপে ঢুকল ভিতরে। পাশের রুমে যাবার দরজাটাও খোলা। আবার উঁকি মেরে সে রুমটাও দেখল। কেউ নেই।

ওর চেম্বারের দরজাটা ভেজানো রয়েছে। নিঃশব্দ পায়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। কান ঠেকাল দরজার গায়ে।

কোন শব্দ নেই। কী-হোলে চোখ রাখায় চেম্বারের যে অংশটা দেখা গেল সেখানে কেউ নেই।

পা দিয়ে সজোরে লাথি মারল শহীদ কবাটের উপর।

কবাট দুটো দু'পাশে ছুটে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেলো, শব্দ হলো বিকট।

চেম্বারের ভিতর একটা চেয়ারে বসে আছে রীটা। শব্দ শুনে চমকে কোলের বইটা থেকে চোখ তুলে তাকিয়েছে সে। কিন্তু শহীদকে দেখেও আতঙ্ক দূর হলো না চোখমুখ থেকে। অপূর্ব সুন্দর মুখটা পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে তার। তাকিয়ে আছে শহীদের দিকে নয়, শহীদের হাতের উদ্যত রিভলভারটার দিকে।

রিভলভারটা পকেটে ভরতে ভরতে শহীদ ভিতরে ঢুকল, 'অবাক কাণ্ড! আপনি এখানে কিভাবে এলেন? আমি ভেবেছিলাম কে না কে!'

রীটা বুক খালি করে নিঃশ্বাস ছাড়ল সশব্দে। অপ্রতিভ ভাবে হাসল সে, 'আপনার জন্যে সেই কখন থেকে ঠায় বসে আছি। গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর দেব বলে…।'

'আপনি ঢুকলেন কিভাবে? চাবি পেলেন কোথায়?' মুখোমুখি বসল শহীদ।

'কেন, কামালের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম একটা চাবি। উচিত ছিল আপনারই দেয়া, কিন্তু দেননি। আমিও তো ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশন-এর একজন এখন।'

শহীদ বলল, 'আমার মাথার ঠিক নেই, মিস রীটা…'

'আমাকে মিস, আপনি—এসব বলেন কেন? নাম ধরবেন, তুমি বলবেন। শিল্পীকে কি মিস বলতেন? আমি তো শিল্পীর পদটাই পূরণ করছি।'

শহীদ বলল, 'গুরুত্বপূর্ণ খবরটা কি?'

রীটা বলল, 'মিসেস রাফিয়ার মার্সিডিজটা ফেয়ার ভিউয়ের গ্যারেজে দেখে এসেছি আমি।'

'গাড়িটা লুকিয়েও রাখেনি—গেলে আর দেখে ফেললে?'

রীটা গোমেজ বলল, 'অত সহজ নয়। আসলে ফেয়ার ভিউয়ে প্রায়ই যাই আমি। গেটম্যান, পোর্টার—সবাইকে চিনি। ওদের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক। জিজ্ঞেস করতেই বলে ফেলেছে। তারপর নিজে গিয়ে দেখেছি।'

'কাজের মেয়ে দেখছি। কাজী হানিফকে দেখেছ নাকি?'

রীটা গোমেজ বলল, 'সব খবরই নিয়ে এসেছি। কাজী হানিফের সাথে কথা বলিনি অবশ্য। তবে হত্যাকাণ্ডের সাথে সে জড়িত নয়। গতকাল বারোটা থেকে

রাত দেড়টা পর্যন্ত সে নিজের নাইট ক্লাবেই ছিল। মি. শহীদ, মিসেস রাফিয়া অমন বিদঘুটে জায়গায় লুকিয়ে আছে—আমার মনে হচ্ছে সে-ই খুনী।'

শহীদ দ্রুত বলল, 'তার মানে? তুমি কি মিসেস রাফিয়াকে দেখেছ ওখানে?'

'না, তা দেখিনি। কিন্তু গাড়িটা যখন রয়েছে, নিশ্চয়ই সে-ও ওখানে লুকিয়ে আছে।'

শহীদ বলল, 'নাও থাকতে পারে।'

রীটা গোমেজ রিস্টওয়াচ দেখল, 'সাড়ে আটটা বাজে। দেরি করে কি লাভ?'

শহীদ বলল, 'তুমিও যাবে?'

রীটা হাসল, 'অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি—যাব না মানে? তাছাড়া, আপনি তো মেম্বার নন। ঢুকতে দেবে না আপনাকে। আমি মেম্বার—আমার সাথে ঢুকতে পারবেন, সে নিয়ম আছে। ভাল কথা, রিভলভার সঙ্গে নিচ্ছেন তো?'

শহীদ বলল, 'কেন? রিভলভার দিয়ে কি হবে?'

রীটা অবাক হলো, 'বলেন কি! ফেয়ার ভিউয়ে যাবেন এক ভদ্রমহিলাকে বের করে আনতে—রিভলভার লাগবে না? আপনি গেলেই তো আর মিসেস রাফিয়া সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসবে না আপনার সাথে। তাছাড়া, নাইট ক্লাবটার সুনামের চেয়ে দুর্নাম বেশি। কাজী হানিফের পোষা গুণ্ডাবাহিনী—টাফ ক্যারেক্টার এক একটা। অবশ্য আপনি যদি না লাগতে যান—ওরা কিছু বলবে না। নাইট ক্লাব—বোঝেনই তো। ভেতরের গোপন কুঠরিতে জুয়া খেলা চলে। কাজী হানিফ ভয়ানক হুঁশিয়ার। অকারণে কাউকে ঘুর ঘুর করতে দেখলে সন্দেহ করবে। এমনিতে লোকটা ভালই, কিন্তু খেপলে—ভয়ঙ্কর। মোট কথা, আমার ধারণা, আপনাকে ওরা দেখলেই কিছু একটা ঘটাবার চেষ্টা করবে। সুতরাং তৈরি হয়ে যাওয়াই ভাল বলে মনে করি।'

শহীদ হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল, বলল, 'মহুয়া, আমি ফেয়ার ভিউয়ে যাচ্ছি।'

মহুয়াকে কোন প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে সেট অফ করে দিয়ে শহীদ দাঁড়াল, 'চলো।'

অফিসে তালা লাগিয়ে বাইরে বের হলো ওরা। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে শহীদ বলল, 'ইয়াকুব আজ বিকেলে সাধন সরকারের বাড়িতে লুকিয়ে ঢুকেছিল।'

শক্ত হয়ে উঠল রীটা গোমেজের শরীর। দপ করে যেন জ্বলে উঠল চোখ দুটো, 'ওর কথা শুনতে চাই না আমি।'

শহীদ বলল, 'কথা কিন্তু অন্য রকম ছিল, রীটা। তুমি ইয়াকুব সম্পর্কে তথ্য দেবে বলেছিলে।'

রীটা গোমেজ চুপ করে রইল।

স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে শহীদ বলল, 'আমার কি ধারণা জানো? কোন কারণে তুমি আমাকে ইয়াকুব সম্পর্কে সব কথা বলতে চাইছ না। ওর সম্পর্কে যা বলেছ তার চেয়ে অনেক বেশি জানো তুমি। কি জানো, রীটা?'

'যতটুকু বলেছি তার বেশি কিছু জানি না। জানতে চাইও না। বামন হয়ে চাঁদ

ধরতে চায় ও। ওকে আমি ঘৃণা করি।'

শহীদ ভিউ মিররে তাকাল। বলল, 'ঠিক আছে। ইয়াকুব সম্পর্কে কথা বলব না আমরা। কিন্তু তোমার সম্পর্কে কথা বলতে পারি তো?'

রীটা গোমেজ কটাক্ষ করে হাসল। খিল খিল করে হাসিতে ভেঙে পড়ল সে, 'আমার সম্পর্কে কি জানতে চান বলুন?'

'প্রত্যেক মানুষের একটা কাহিনী থাকে। তোমার কাহিনী শোনার কৌতূহল হচ্ছে আমার। তুমি কামালের ভক্ত। কিন্তু কামালও তোমার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে বলে মনে হয় না। কে তুমি, রীটা?'

রীটা হাসল না। বলল, 'শুনবেন? দুঃখ পাবেন কিন্তু। আসলে আমার কোন পরিচয় নেই। বাইরের চেহারাটাই আমার আসল চেহারা। কি জানেন, রহস্য ভালবাসি। লোকে আমাকে রহস্যময়ী নারী বলে মনে করুক তাই চাই। আমার অতীত জীবনের কথা—সে বড় করুণ ইতিহাস। আমি ভুলে যেতে চাই।'

শহীদ ভিউ মিররে চোখ রাখল আবার।

রীটাকে ম্লান দেখাল।

আবার বলল, 'আপনাকে বলতে আপত্তি নেই। কেন যেন, আপনার সাথে পরিচয় হবার সময় থেকেই মনে হচ্ছে, আপনার সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেলে আমার মধ্যে স্থিতি আসবে। জীবনে শান্তি পাইনি একদণ্ডের জন্যেও। মি. শহীদ, আমি বড় দুঃখী মেয়ে। আমার দুঃখ আমি ভুলে থাকতে চাই বলেই মদ খাই, সিগারেট খাই, নাইট ক্লাবে যাই, পুরুষদের সাথে বেপরোয়াভাবে মেলামেশা করি, গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে থাকি। আমি মেয়ে—একথা ভুলে থাকার চেষ্টা করি। আমি খ্রিষ্টান। আমার বাবা ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা চার্চের পুরোহিত। মা ছিলেন আদিবাসী। আমার বাবা আমার মাকে বিয়ে করেন আমার জন্মের পর। বিয়েটা টেকেনি। কারণ—আমার যখন নয় বছর বয়স তখন আমার মা উপজাতীয় এক যুবকের সাথে চলে যায়।'

শহীদ ভিউ মিররে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। একটা কালো মরিস গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে ফলো করছে। ড্রাইভারকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না ও। অনুসরণ করছে অনেক দূরত্ব বজায় রেখে।

'বাবার কাছে মানুষ আমি। কিন্তু মায়ের আত্মীয়-স্বজনদের সান্নিধ্যও পাই। সে জন্যেই সম্ভবত ভয় ডর বলে কিছু নেই আমার। ঘরকুণো হয়ে থাকা আমার স্বভাবের মধ্যে নেই। স্কুলে থাকতেই আমি বখে গিয়েছিলাম। প্রেম করতে শুরু করি তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকেই। তবে লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম বরাবর। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, স্পোর্টসেও। রাইফেল চালনায় আমি বরাবর ফার্স্ট হয়েছি। ভালো কুস্তি জানি। জুডোও শিখেছিলাম। স্কুলে বা আন্তঃজেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমি সবসময় ভাল করেছি।'

শহীদ বলল, 'তোমার বাবার কথা বলো।'

'তিনি মারা যান আমার যখন ষোলো বছর বয়স। ম্যাট্রিক পাস করেছি তখন আমি। এক যুবকের সাথে তখন আমার সম্পর্ক ছিল। মুসলমান সে, ডাক্তারী করত

আমাদের এলাকায়। তার সাথে আমি চট্টগ্রাম শহরে আসি। বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে আসে সে আমাকে। কিন্তু মাসখানেক পর সে জানায় আমার প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। আমি ভাঙি কিন্তু মচকাই না। তাকে ছেড়ে চাকরি নিলাম একটা স্কুলে। মুশকিল কি জানেন, শাস্তি পেলেও আমার শিক্ষা হয় না। বারবার প্রেমে পড়েছি আমি। প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বলে মনে করি নিজেকে। কিন্তু একই ভুল বারবার করছি। চাকরি ছেড়েছি একটার পর একটা, বিভিন্ন শহরে গেছি, নতুন নতুন ছেলে বন্ধুদের সাথে মিশেছি—শেষ পর্যন্ত তরী ভিড়েছে ঢাকায়।'

শহীদ বলল, 'ব্যস। আর শুনতে চাই না।'

'না, শুনতে হবে। ঢাকায় কি করি জানেন? না, চাকরি করি না। তাস সাজাতে পারি আমি। তারমানে, চুরি করতে জানি। ক্লাবে খেলি। কিছু না কিছু আতই। মগবাজারে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছি। ছোট একটা গাড়িও কিনেছি। বেশ কেটে যাচ্ছে দিন।'

ফেয়ার ভিউ নাইট ক্লাব।

চৌরাস্তার মাথায় আকাশ ছোঁয়া প্রকাণ্ড গেট বিরাট একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধ সেটা।

কিন্তু গাড়ি গেটের সামনে থামতেই সেটা খুলে গেল ঘরঘর শব্দ তুলে। রীটা জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল। তিন-চারজন গার্ড গাড়ির নাক বরাবর এগিয়ে আসছিল, রীটাকে দেখা মাত্র একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রীটা মাথা ভিতরে নিয়ে হাসল, 'চিনতে পেরেছে আমাকে। গাড়ি চালান।'

গেট একটা নয়। কংক্রিটের চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ি এগোল। সামনে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও একটা গেট দেখা গেল। সাদা ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। গেটটা খোলাই। আবার মাথা বের করে দিল রীটা গোমেজ। কাজ হলো এবারও। হাত ইশারায় দু'জন লোকের একজন গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকতে বলল।

এরপর রাস্তার দু'পাশে বাগান। বিল্ডিংটা আরও সামনে। সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন গেটম্যান দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশ পথের পাশে। গাড়ি থামাতেই স্যালুট করল সে।

রীটা নামল আগে। তারপর শহীদ।

গেটম্যান প্রবেশ পথ খুলে দিয়ে একটু নত হলো। রীটার পিছু পিছু ভিতরে ঢুকল শহীদ।

হলরুমে প্রচুর লোকজন গিজ গিজ করছে। চারদিকের দেয়ালে প্রায় ডজন খানেক দরজা। সবগুলোই বন্ধ। প্রত্যেকটি দরজার সামনে দু'একজন করে স্যুট পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো সহজেই শহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রত্যেকের স্যুটের রঙ কালো। টাইয়ের রঙ সাদা। জুতোগুলো খয়েরি রঙের। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সটান। হাসি নেই মুখে।

দরজা খুলে কেউ কেউ বেরিয়ে আসছে। কেউ কেউ ঢুকছেও বটে, কিন্তু ঢুকতে হলে কালো স্যুট পরা লোকগুলোর অনুমতি নিতে হচ্ছে, দেখে মনে হলো।

অনেক চেয়ার, কয়েক সেট সোফা রয়েছে হলরুমের এদিক সেদিক। নারী-পুরুষ বসে আছে। যেন অপেক্ষা করছে সবাই।

'আপনি বসুন, আমি টয়লেট থেকে আসছি।'

একটা খালি সোফা দেখিয়ে দিয়ে হাইহিলের খট খট শব্দ তুলে চলে গেল রীটা গোমেজ। 'লেডিস' লেখা একটা দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে একজন লোককে দেখতে পেল শহীদ। চেনা চেনা মনে হলো। চেয়ে আছে ওর দিকেই। চোখাচোখি হতে লোকটার চেহারা যেন একটু কঠিন হয়ে উঠল। দৃষ্টি ফেরাল না সে। পা বাড়াল। আসছে শহীদের দিকেই সোজা।

লোকটার হাঁটার ভঙ্গি দেখে শহীদ অনেক কিছু বুঝে নিল। হাঁটার সময়-হাত দুটো শরীরের দুই পাশ থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকছে, প্রায় স্থিরভাবে। ভঙ্গিটা চর্চা করে রপ্ত করেছে বোঝা যায়। হাত দুটো ওভাবে থাকায় আক্রমণাত্মক একটা ভাব ফুটে রয়েছে লোকটার মধ্যে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। চল্লিশ ইঞ্চি চওড়া বুক। হাতগুলোও পেশীবহুল। মুখটা বড়সড় কিন্তু চ্যাপ্টা ধরনের। নাক নামক জিনিসটা নেই বললেই চলে।

সামনে এসে দাঁড়াল শহীদের। ঠোঁটের কোণা থেকে সিগারেট না নামিয়েই প্রশ্ন করল, 'কাউকে খুঁজছেন?'

সাথে সাথে উত্তর না দিয়ে শহীদ লোকটার ঠোঁটে ধরা সিগারেটের দিকে চোখ রেখে হাতের পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে লোকটার চিবিয়ে কথা বলার ভঙ্গি নকল করে বলল, 'খুঁজছি? কই, কাউকে হারিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

লোকটা একটু যেন অবাক হলো, দেখল শহীদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীব্র দৃষ্টিতে বলল, 'মেম্বার?'

শহীদ বলল, 'না।'

'কার সাথে এসেছেন?'

শহীদ বলল, 'কার সাথে কথা বলছি আমি?'

নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকাল লোকটা, 'সিকিউরিটি গার্ড। কার সাথে আসা হয়েছে জানতে চাইছি। আজে-বাজে লোক এখানে ঢুকে মেম্বারদের বিরক্তির কারণ হোক তা আমরা চাই না। আপনাকে আগে কখনও দেখিনি। অচেনা মুখ।'

ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে মুখ ফেরাল শহীদ, 'ভাল করে দেখুন, চিনতে পারার তো কথা।'

দাঁতে দাঁত চাপল বোধহয় লোকটা, 'ঠাট্টা করছেন? জানেন…?'

লোকটার পিছন থেকে রীটা গোমেজ বলে উঠল, 'উঠুন…।'

লোকটা ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, থেমে গেল রীটা গোমেজ। হাসি মুছে গেছে তার মুখ থেকে। কিন্তু ক'সেকেণ্ডের মধ্যেই সামলে নিল নিজেকে, টকটকে লাল ঠোঁট বিস্তার করে হাসল, 'হাই। কেমন আছ, টগর?'

'আপনি?'

হাসি হাসি মুখ করল টগর, তাকাল শহীদের দিকে, 'বুঝেছি! মিস রীটার সঙ্গীরা সবাই অমন দুঃসাহসী ভাব দেখায়।'

শহীদ সটান উঠে দাঁড়াল। রীটা গোমেজের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'কুয়োর ব্যাঙ!'

টগর পকেটে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে ধরল কিছু একটা, কিন্তু কি মনে করে হাতটা বের করল না পকেট থেকে।

রীটা গোমেজের সাথে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। কালো স্যুট পরা একজন লোক রীটা গোমেজকে দেখে হাসল, খুলে দিল দরজা। ভিতরে প্রবেশ করল ওরা।

টগর নড়েনি। চেয়ে আছে সে তখনও ওদের গমন পথের দিকে।

লবির ভিতর দিয়ে করিডরে, তারপর সুইং ডোর ঠেলে বারের ভিতর, এক কোণায় গিয়ে বসল ওরা একটা টেবিল দখল করে।

ওয়েটার এল। শহীদ নিজের জন্যে কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। রীটা হুইস্কি দিতে বলল।

ওয়েটার চলে যেতেও ওরা চুপ করে রইল, পরস্পরের সাথে কথা বলল না।

বারে খুব বেশি লোক নেই। মেয়ে এবং পুরুষ প্রায় সমান সংখ্যকই হবে। নিচু গলায় কথা বলছে সবাই।

কেউ লক্ষ করছে না ওদেরকে।

ওয়েটার পানীয় দিয়ে গেল। বরফ দেয়া পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আড়চোখে তাকাল শহীদ রীটার দিকে।

অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে রীটা গোমেজের চেহারায়। চিন্তিত, গম্ভীর দেখাচ্ছে।

কথা বলল রীটাই, 'কাজটা ভাল করেননি।'

শহীদ বলল, 'মানে?'

'টগরকে আপনি চেনেন না, মি. শহীদ। ওকে সবাই গোখরা সাপ বলে। কাজী হানিফের বডিগার্ড ও। রিভলভার ছাড়া ল্যাট্রিনেও ঢোকে না। সিঁড়ির নিচে যাকে দেখলেন—ও হলো খসরু। আর একজন বডিগার্ড।'

শহীদ হাসছে দেখে আরও ভারি হয়ে উঠল রীটার সুন্দর মুখটা। ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু যেন ভাবছে সে। বলল, 'কি করবেন এখন?'

শহীদ শেষবার চুমুক দিয়ে ঠক্ করে টেবিলে নামিয়ে রাখল গ্লাসটা, 'প্রত্যেকটা রুমে নাক গলাব। বিল্ডিংটার নকশা সম্পর্কে কিছু জানো?'

'তেমন কিছু জানি না। টপ ফ্লোরে কাজী হানিফের একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে জানি। কোনদিন ওঠার সুযোগ হয়নি আমার। অনেক বাধা। রুমের সংখ্যা বেশ কয়েকটা হবে, যতদূর শুনেছি। মিসেস রাফিয়া যদি ফেয়ার ভিউয়ে থেকে থাকে, তাহলে টপ ফ্লোরেরই কোথাও আছে সে।'

'টপ ফ্লোরেই যাব আগে আমি।'

রীটা শহীদের শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ পর বলল, 'ভয়

করছে না আপনার?'

শহীদ হেসে ফেলল, 'খুব। ভয়ে কেঁদে ফেলতে পারি। সিন ক্রিয়েট হবে একটা—পালাও!'

'পালাব?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। আমি যাচ্ছি। যদি কোন বিপদে পড়ি, আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা কোরো না।'

রীটা বলল, 'টগরের নজরে পড়ে গেছেন আপনি, মি. শহীদ। আমি বলি কি, দরকার নেই আজ মিসেস রাফিয়ার সন্ধান করে।। চলুন, ফিরে যাই।'

শহীদ বলল, 'ফিরব তো বটেই। মিসেস রাফিয়াকে নিয়ে ফিরব।'

'আমি জানি, টপ ফ্লোর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবেন না আপনি। তা ছাড়া টগর...'

'আহ, থামো!' উঠে দাঁড়াল শহীদ। আবার বলল, 'ফিরে যাও, রীটা।'

'মি. শহীদ! এক মিনিট...।'

শুনল না শহীদ। কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। বিল মিটিয়ে দিয়ে তাকাল পাশে। রীটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'দোতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেব আপনাকে।'

শহীদ কথা না বলে পা বাড়াল।

করিডরে বেরিয়ে এসে সিঁড়িটা দেখতে পেল শহীদ। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে কালো স্যুট পরা একজন লোক।

কাছাকাছি যেতেই লোকটা পথ রোধ করে দাঁড়াল। বলল, 'ওনলি ফর মেম্বার, মিস্টার।'

পিছনে আসছিল রীটা। বলল, 'খসরু, উনি আমার সাথে যাচ্ছেন।'

'ওহ্, সরি!' পথ ছেড়ে দিল খসরু।

উপরে উঠে শহীদ দেখল প্রশস্ত করিডরের শেষ মাথায় একটা বার। বার-এর বড়সড় প্রবেশ পথটা কাঁচ দিয়ে তৈরি। বারের ভিতর দশ বারোজন নারী পুরুষ বসে আছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

রীটা গোমেজ ফিস ফিস করে বলল, 'আমাকে আগে যেতে দিন। আমি বারে ঢুকব, আপনি সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবেন উপরে।'

বারের কাছে, অনেকটা সামনাসামনি সিঁড়িটা। শান্ত, সহজ ভঙ্গিতে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে লাগল শহীদ। পিছন ফিরে তাকাল না একবারও। রীটা গোমেজের গলা ভেসে এল হঠাৎ।

খিলখিল করে হাসছে রীটা গোমেজ কারও কোন রসিকতা শুনে।

বাঁক নিয়েই শহীদ একসাথে তিনটে করে ধাপ টপকাতে শুরু করল এক এক লাফে।

কেউ লক্ষ করেনি ওকে।

উপরে উঠে দাঁড়াল শহীদ। লম্বা করিডর ওর সামনে, দু'পাশে পালিশ করা কাঠের দরজা। সবগুলোই বন্ধ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছিল শহীদ, এরপর কি করা উচিত? নিরাপদে কাজটা সারতে হবে···

এমন সময়!

মাত্র দশ হাত সামনের একটা দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। প্রথমে ডান, তারপর বাঁ পা ফেলে একটি যুবতী বেরিয়ে এল করিডরে।

মিসেস রাফিয়াকে দেখেই চিনল শহীদ।

তিন

ভূত দেখার মত চমকে ওঠা উচিত ছিল মিসেস রাফিয়ার। কিন্তু চমকাল না সে। মানুষ খেকো বাঘকে দেখলে মানুষ যেমন ভয়ে মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে যায়, তারপর দিক হারিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে—তাই করল।

খোলা দরজা পথে ভিতরে ঢুকে কবাট দুটো বন্ধ করে দিল সে সশব্দে। বিদ্যুদ্বেগে দরজার সামনে পৌঁছুল শহীদ। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল কবাট দুটো।

পিছিয়ে গেল মিসেস রাফিয়া। এদিক ওদিক তাকাল ভীতা হরিণীর মত, যেন পালাবার পথ খুঁজছে। এক পা এগিয়ে রুমের ভিতর ঢুকল শহীদ, খপ্ করে ধরে ফেলল মিসেস রাফিয়ার একটা হাত। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'শান্ত হোন, মিসেস রাফিয়া। আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি আমি।'

হাত ছাড়িয়ে দৌড়ুবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল মিসেস রাফিয়া। হাতটা ছেড়ে দিয়ে শহীদ সজোরে একটা চড় মারল গালে।

চড় খেয়ে স্থির হয়ে গেল মিসেস রাফিয়া। হাঁপাচ্ছে সে হাপরের মত। চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'চলে যান! চলে যান আপনি!'

ব্যাপার কি? দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করল শহীদ। চড় খেয়েও অপমানিত বোধ করছে না মিসেস রাফিয়া। বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ভয়ে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আছে সে। কেন?

'চলে যান! প্লীজ—চলে যান এখুনি!' অস্ফুটে, শোনা যায় কি যায় না, ফিসফিস করে বলে উঠল মিসেস রাফিয়া।

'আপনাকে কোথায় না খুঁজেছি আমি! কয়েকটা প্রশ্ন করব আপনাকে, মিসেস রাফিয়া। আপনি শান্ত হয়ে বসুন তো।'

দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার বলে উঠল মিসেস রাফিয়া, 'বেরিয়ে যান! আপনার সাথে কোন কথা নেই আমার।'

শহীদ বলল, 'নেকলেসটার কথা ভুলে গেছেন নাকি? ফেরত চান না ওটা?'

এবার চড় না মারলেও গালে হাত দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল মিসেস রাফিয়া, 'কি! আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'সুন্দর বুঝতে পারছেন। নেকলেসটা শিল্পীকে দিয়েছিলেন আপনি। কেন দিয়েছিলেন, মিসেস রাফিয়া?'

অকস্মাৎ উন্মাদিনীর মত ছুটল মিসেস রাফিয়া। খসে পড়ল শাড়ি, সজোরে

গিয়ে পড়ল সে একটা বড় টেবিলের উপর। টেবিলের সাথে একাই ধস্তাধস্তি করতে করতে একটানে খুলে ফেলল ড্রয়ারটা। খামচে ধরে বের করে আনল একটা ·২৫ পিস্তল। সেটা শহীদের দিকে তুলে ধরার আগেই শহীদ পৌঁছে গেল তার পাশে, ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সেটা। শহীদের মুখ খামচে ধরল সে, প্রথমে এক হাত দিয়ে, তারপর দুই হাত দিয়ে।

ধাক্কা মারল শহীদ। মুখ ছেড়ে দিয়ে শহীদের চুল ধরে এক রকম ঝুলে পড়ল মিসেস রাফিয়া। হাত দুটো ধরে হেঁচকা টান মারল শহীদ নিচের দিকে। তারপর পিছিয়ে এল এক পা। পিস্তলটা পড়ে গেছে কার্পেটের উপর, লাথি মেরে খাটের নিচে পাঠিয়ে দিল সেটাকে।

হিংস্র, বন্য বাঘিনীর মত চেহারা হয়েছে মিসেস রাফিয়ার।

'দুঃখিত, মিসেস রাফিয়া। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, যতই চেষ্টা করুন না কেন, আপনাকে আমি ছাড়ছি না। অভিনয় বন্ধ করুন। উত্তর দিন আমার প্রশ্নের। শিল্পীকে কেন আপনি আপনার অত দামী নেকলেসটা দিয়েছিলেন?'

নিজের হাত দুটো চোখের সামনে তুলে দেখল মিসেস রাফিয়া। দু'চোখ ভরা পানি দেখল শহীদ।

'হাত মুচড়ে দিয়েছেন আমার···। ওটা···নেকলেসটা কাউকে দিইনি আমি!'

'দুঃখিত। শিল্পীর সাথে তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন আপনি। ঢোকার সময় আপনার গলায় ছিল সেটা। কিন্তু বেরিয়ে আসার সময় ছিল না। পরে সেটা পাওয়া গেছে শিল্পীর ফ্ল্যাটে। আপনি দিয়ে এসেছিলেন তাকে। কেন?'

'বললাম তো দিইনি।'

'আপনাকে দেখেছে একজন ঢোকার সময়, বেরুবার সময়। সুতরাং মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। হয় আমাকে বলুন, নয়তো পুলিস ডাকব আমি। ভেবে দেখুন কোনটা পছন্দ।'

'নেকলেসটা দিইনি আমি কাউকে! ওটা চুরি গেছে আমার কাছ থেকে।'

শহীদ জানতে চাইল, 'রাত সাড়ে বারোটার সময় আপনি ধানমণ্ডি লেকের ধারে গিয়েছিলেন কেন?'

চমকে উঠল মিসেস রাফিয়া। ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করল মুখের চেহারা। 'কি আজেবাজে বকছেন! অত রাতে লেকের ধারে যাব কেন আমি?'

'শিল্পীকে যখন খুন করা হয়, ওখানে আপনি ছিলেন। কি করছিলেন ওখানে, মিসেস রাফিয়া? নাকি আপনিই গুলি করেন শিল্পীকে?'

ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে মিসেস রাফিয়া। বলে উঠল, 'আমি যাইনি! আমি কখনও যাইনি! বেরিয়ে যান! আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না আমি। চলে যান বলছি এখনও!'

রহস্যময় ব্যাপার হলো, কথাগুলো কেউ শুনে ফেলবে এই ভয়ে একেবারে ফিসফিস করে কথা বলছে মিসেস রাফিয়া। ভীষণ রকম আতঙ্কিত সে।

ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না শহীদের। যতবার কথা বলছে, চমকে চমকে উঠছে সে।

'কিছুই আপনি জানেন না, কিছুই আপনি করেননি—তাহলে এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছেন কিসের ভয়ে? বাড়িতে থাকছেন না কেন? আপনার স্বামী জানেন আপনি এখানে আছেন? উত্তর দিন—চুপ করে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে। নেকলেসটা…!'

মিসেস রাফিয়া হঠাৎ কেঁপে উঠল থরথর করে। দরজা খোলার শব্দ পায়নি শহীদ। পদশব্দও কানে ঢোকেনি। কিন্তু এক কোনার ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় একটা প্রতিফলন নড়ে উঠেছে বলে মনে হতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও পিছন দিকে।

দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কাজী হানিফ। প্রৌঢ়ই বলা চলে তাকে। মেদসর্বস্ব। পরনে ধূসর রঙের ট্রপিক্যাল স্যুট। মাথায় টাক, চকচক করছে বৈদ্যুতিক আলোয়। চোখ দুটো গর্তে। ক্লান্ত, বিরক্ত দেখাচ্ছে তাকে।

মিসেস রাফিয়ার দিকে ফিরল শহীদ। বোবা, বোকা, অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। রক্ত নেমে গেছে শিরা উপশিরা বেয়ে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা।

ক্রেপসোলের জুতো কাজী হানিফের পায়ে। প্রায় কোন শব্দই হলো না। এগিয়ে এসে শহীদের ডান দিকে দাঁড়াল সে হাত চারেক দূরে।

শান্ত, আলাপী কণ্ঠে জানতে চাইল সে, 'নেকলেসটা সম্পর্কে কি জানেন আপনি বলুন তো?'

শহীদ বলল, 'আমাদের আলোচনায় নাক গলাবেন না। শুধু নেকলেস নয়, আমরা একটা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কথা বলছি। নিজেকে জড়ানো উচিত হবে না আপনার।'

'নেকলেসটা কোথায় আছে জানেন নাকি?' যেন শহীদের কথা শুনতেই পায়নি কাজী হানিফ।

'আছে নিরাপদেই, তালা-চাবির ভিতর। মিসেস রাফিয়া বুঝি বলেনি আপনাকে একটা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তিনি? পুলিস ওকে খুঁজছে। ওকে আশ্রয় দিয়েছেন আপনি—একজন হত্যাকারিণীকে গা ঢাকা দিতে সাহায্য করার অভিযোগ থেকে আপনিও নিষ্কৃতি পাবেন বলে মনে হয় না। নাকি এইসব ছোটখাট ব্যাপার গ্রাহ্য করেন না?'

নির্বিকার মুখের ভাব এতটুকু পরিবর্তিত হলো না। তাকাল সে এই প্রথম মিসেস রাফিয়ার দিকে, 'আপনি এই লোকের কথাই আমাকে বলেছিলেন?'

আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়েছে মিসেস রাফিয়া। সবেগে মাথা কাত করল সে। গলার শিরাগুলো অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে উঠেছে, দেখল শহীদ।

কাজী হানিফ মুখ ফেরাল শহীদের দিকে, 'এখানে এলেন কিভাবে?'

রীটা গোমেজকে জড়াতে চাইল না শহীদ, একেবারে অপরিহার্য না হলে তার নাম মুখে আনবে না ঠিক করল ও। বলল, 'সোজা উঠে এসেছি ওপরে। কেউ বাধা দেয়নি।'

কথা না বলে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন ভাবল কাজী হানিফ। তারপর, ধীরে ধীরে রুমের মাঝখানটায় গিয়ে দাঁড়াল সে।

এভাবে হেঁটে রুমের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবার কারণটা বুঝতে না পারলেও

শহীদের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত উঠে এল। হঠাৎ ও যেন বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

'ঢুকলেন কিভাবে উনি, টগর?'

দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল টগর—আড়ালে। দ্রুত পায়ে ঢুকল সে ভিতরে, 'রীটা গোমেজের সাথে এসেছে…।'

সেই চিবিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। হাতের রিভলভারটা শক্ত করে ধরে আছে।

আর একজনের পদশব্দ কাছে এগিয়ে আসছে। শহীদ আয়নার দিকে তাকাল আড়চোখে। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল আর একজন লোক। চিনতে পারল শহীদ। দোতলায় ওঠার সময় এই লোকটাই ওর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

'নিয়ে এসো রীটাকে।'

দোরগোড়া থেকে সরে গেল খসরু। হাত নেড়ে অপর একটি দরজা দেখিয়ে মিসেস রাফিয়ার উদ্দেশে বলল কাজী হানিফ, 'পাশের রুমে!'

যান্ত্রিক পুতুলের মত ঘুরে দাঁড়াল মিসেস রাফিয়া। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝট করে ফিরল ওদের দিকে। দৃঢ়, অবিচলিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মিথ্যে কথা বলছেন উনি। যা বলছেন—একটা কথারও অর্থ বুঝতে পারছি না। আমাকে বিপদে ফেলার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, যতটুকু বুঝতে পারছি।'

'ঠিক আছে। আপনি যান।' কাজী হানিফ নীরস গলায় বলল।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল মিসেস রাফিয়া, বন্ধ করে দিল দরজাটা। কাজী হানিফ সাথে সাথে তাকাল টগরের দিকে, 'আমার কাছ থেকে বেতন নিয়ে ঘাস কিনে খাও, না? কেউ যাতে ওপরে উঠতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হাজার বার হুকুম দিইনি আমি?'

টগর কথা বলল না, এমন কি তাকাল না পর্যন্ত কাজী হানিফের দিকে। চেয়ে আছে সে শহীদের দিকে। অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনুমতি পেলে চিবিয়ে খাবে সে শহীদের গায়ের কাঁচা মাংস। রিভলভারটা সে ধরল সিলিংয়ের দিক থেকে শহীদের মাথার দিকে।

কথা বলে উঠল শহীদ। ভয়হীন, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। 'মাথাটা একটু খাটান, কাজী হানিফ। নিজেকে, নিজের ব্যবসাকে একটা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মিসেস রাফিয়াকে ডেকে পাঠান, যেতে বলুন আমার সাথে—আপনি যাতে জড়িয়ে না পড়েন কেসটার সাথে, সেটা আমি দেখব।'

'হুঁ। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে মিটছে না।'

সশব্দে দরজাটা খুলে যেতে চমকে উঠল সবাই একটু। রুমের ভিতর দ্রুত ঢুকে পড়ল রীটা। তার ঠিক পিছনেই খসরু। হাতের রিভলভারটা রীটা গোমেজের শিরদাঁড়া লক্ষ্য করে ধরা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পিছিয়ে গেল সে, একটা হাত পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা। তারপর দু'পা সামনে এগিয়ে দাঁড়াল।

শান্ত, স্বাভাবিক দেখাচ্ছে রীটাকে। দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে রুমের দৃশ্যটা দেখে নিল সে, 'হ্যালো! আপনি ওপরে উঠলেন কিভাবে? রিভলভার দেখছি—ঘটনাটা কি? নাটকের রিহার্সেল হচ্ছে নাকি?'

রিভলভারের নলের মত কালো আঙুল তুলে শহীদকে দেখাল কাজী হানিফ, 'ওকে তুমি সাথে করে এনেছ?'

রীটা বলল, 'তাতে হয়েছেটা কি? আমি কি মেম্বার নই? মেম্বারদের সাথে তো একজন করে আসতেই পারে।'

কাজী হানিফ মাথা নাড়ল, 'তা পারে। আমি আগেই ভেবেছিলাম, তুমি ঝামেলা তৈরি করবে একদিন না একদিন। ঠিক তাই করেছ।'

'হানিফ সাহেব, কি বলছেন আপনি? কাকে বলছেন?' রীটা হঠাৎ খেপে উঠল যেন, আবার বলল, 'আমাকে তুমি বলার দুঃসাহস কোথা থেকে হলো আপনার? নিজের আস্তানায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন দেখছি। মি. শহীদ, চলুন। এখানে আর কোনদিন থুথু ফেলতেও আসব না।'

চমৎকার কৌশল, সন্দেহ নেই। নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে শহীদকে বিপদের মুখ থেকে মুক্ত করে নিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা। কিন্তু কাজ হলো না।

কাজী হানিফ হুকুম দিল, 'নড়লেই গুলি করবে, টগর।'

নড়ল না শহীদ। টগরকে সুযোগ দেয়াটা বোকামি হবে। গুলি করার অজুহাত পেলে হাতছাড়া করবে না সে।

কাজী হানিফ খসরুর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল সবেগে। কয়েক পা এগিয়ে এসে খসরু রীটা গোমেজের কাঁধে হাত রাখল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠাস করে চড় মারল রীটা গোমেজ খসরুর গালে।

'এত বড় স্পর্ধা। আমার গায়ে হাত রাখিস!' খসরু খপ করে মুঠো করে ধরল রীটা গোমেজের বব ছাঁটা চুল। হেঁচকা টান মেরেই ছেড়ে দিল সে চুল।

ছিটকে পড়ল রীটা গোমেজ। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল সে কয়েক সেকেণ্ড।

টগবগ করে ফুটছে শরীরের ভিতর রক্ত, কিন্তু একটা কথাও বলল না শহীদ।

খসরু আবার এগিয়ে আসছে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল রীটা গোমেজ। অসহ্য অপমানে রাগে কাঁপছে সে।

সবাই চেয়ে আছে খসরুর দিকে।

সুযোগটা নিল শহীদ। লাফ দিয়ে পড়ল সে।

টগর তৈরি ছিল না। কিন্তু আক্রান্ত হবার এক সেকেণ্ড আগে ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল সে। শহীদ তখন শূন্যে। ওকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, অত সময় পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে টগর হাতের রিভলভারটা ছুঁড়ে দিল কাজী হানিফের দিকে। পরক্ষণে শহীদের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল সে।

পড়ে গেল কার্পেটের উপর শহীদও। উঠে দাঁড়িয়ে আবার লাফ দিল ও। খসরু রীটা গোমেজকে ছেড়ে এগিয়ে আসছিল ওর দিকে, তাকে লক্ষ্য করেই লাফ দিল শহীদ।

লাফ দেবার পরপরই শব্দ হলো। বন্ধ রুমের ভিতর রিভলভারের শব্দ, কানের পর্দা ফেটে যেতে চাইল। কানের পাশ দিয়ে বুলেটটা ছুটে গেল, তা টেরই পেল না ও।

খসরু সরে গেছে। শহীদ তাল সামলে সিধে হয়ে দাঁড়াল খসরুর মুখোমুখি।

'গুলি করছি!' কাজী হানিফের গলা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডান দিকে শহীদ। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ঘা খেলো ও মাথার পিছনে। টগর ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। রিভলভারের বাঁট দিয়ে ওর মাথার পিছনে সে-ই মেরেছে।

একপলকে অন্ধকার হয়ে গেল শহীদের গোটা দুনিয়া। মেঝেতে, সশব্দে ঢলে পড়ল ওর জ্ঞানহীন দেহ।

চার

কামরাটা স্যাঁতসেঁতে। মাটির নিচের কোন সেল সম্ভবত। একটাও জানালা নেই। সিলিংটা অনেক উঁচুতে।

হলদেটে আলো পড়েছে দেয়ালে। একটা টেবিলের ছায়া দেখা যাচ্ছে। দু'পাশে দুটো চেয়ারের ছায়া দেখা যাচ্ছে। চেয়ার দুটোয় বসে আছে দুজন লোক। লোক দুটোকে নয়, তাদের ছায়া দুটো দেখতে পাচ্ছে শহীদ।

এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে ওর।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে ওর। হাত-পা বাঁধেনি, মুক্তই রেখেছে। পাশ ফিরল ও। তাকাল না টগর বা খসরু। তাস খেলছে ওরা মুখোমুখি বসে। সময় কাটাবার জন্যে নয়, টাকা দিয়ে লাভ লোকসানের খেলা খেলছে।

কিন্তু টগর কথা বলে উঠল, 'নড়বেন না। যেমন শুয়ে আছেন তেমনি শুয়ে থাকেন। এই শেষ দানটা খেলে নিই।

ব্যাপারটা কি? 'তুমি' থেকে 'আপনি' বলার মানে? ব্যঙ্গ করছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

খসরু উঠে দাঁড়াল, 'থাক খেলা। বসকে গিয়ে খবরটা দিই।'

টগর টেবিলের উপর থেকে রিভলভারটা তুলে নিল। 'আচ্ছা। পাহারায় আছি আমি।'

দরজা খুলে খসরু বেরিয়ে যেতে শহীদ উঠে বসল। 'রীটা কোথায়?'

'চুপ!'

রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল শহীদ। এগারোটা বাজতে সাত মিনিট বাকি। আরও তিন মিনিট পর দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল খসরু। তারপর কাজী হানিফ।

কাজী হানিফের প্রথম কথাটা শুনে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো শহীদের। 'আপনার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মি. শহীদ। ছি, ছি—কিরকম জঘন্য একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটে গেল বলুন তো! প্রথমেই কেন আপনি আপনার পরিচয় দেননি? তাহলে তো আর এমন দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটত না।'

শহীদ উঠে দাঁড়াল।

'মিসেস রাফিয়া আমাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। দুঃখিত, মি. শহীদ। আপনি সুস্থ বোধ করলে বলুন, আপনাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি।'

শহীদ বলল, 'কানে মধুবর্ষণ করছে আপনার কথাগুলো, যাই বলুন। তা সে

যাই হোক, মিসেস রাফিয়া কোথায়?'

কাজী হানিফ তিক্তকণ্ঠে বলল, 'চলে গেছে—না, তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'ভাল করেননি। তাড়িয়ে দিয়েছেন, না আমার হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে অন্যত্র কোথাও সরিয়ে দিয়েছেন?'

বিনয়ের অবতার বলল, 'প্লীজ, মি. শহীদ! আপনার সম্মান সম্পর্কে আমি এখন সম্পূর্ণ সচেতন। আপনাকে চিনতে পারার পর মিথ্যে কথা বলব—সে সাহস নেই আমার। আপনার পরিচয় জানার পরপরই আমি তাকে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে বলি। দশ মিনিট পরই আপদ বিদায় হয়। এই, খসরু, ইডিয়েট, একটা চেয়ার আনতে কি হয়েছে?'

খসরু বুলেটের বেগে বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

'কোথায় গেছে সে?'

'তা ঠিক জানি না।'

এগিয়ে আসতে আসতে বলল কাজী হানিফ। হাতের ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেটটা খুলে সরিয়ে দিল শহীদের দিকে।

মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করল শহীদ। চেয়ার নিয়ে প্রবেশ করল খসরু ভিতরে। শহীদের কাছে নামিয়ে রাখল সেটা। পকেট থেকে পাইপ বের করল শহীদ। বসল চেয়ারে। ধীরে সুস্থে তামাক ভরতে লাগল পাইপে।

'কৌতূহল ছিল নেকলেসটা সম্পর্কে,' কাজী হানিফ বলল।

পাইপে অগ্নিসংযোগ করে ধোঁয়া ছাড়ল শহীদ, 'কেন? মিসেস রাফিয়ার নেকলেসের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?'

'সে আমাকে ওটা দেবে বলেছিল। ওটার বদলেই তাকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম। দু'দিন আগে সে আমার সাথে দেখা করে বলে এক সপ্তাহের জন্যে প্রোটেকশন দরকার তার, বদলে টাকা দেবে। নিজের মুখেই পাঁচ হাজার টাকার কথা বলে সে। কিন্তু তাতে আমি রাজি হইনি। বুঝতে পেরেছিলাম, গুরুতর কোন বিপদের আশঙ্কা করছে সে। বড়লোকের বউ, অভাব কি তার? শেষ পর্যন্ত প্রোটেকশনের বিনিময়ে সে আমাকে তার গলার নেকলেসটা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু গতরাতে যখন সে পৌঁছায় এখানে, গলায় নেকলেসটা ছিল না। জিজ্ঞেস করতে বলে, চুরি হয়ে গেছে। মিথ্যে কথা বলছে; সন্দেহ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। বেশি বাড়াবাড়ি করিনি, কারণ, ভয়ে জড়সড় হয়ে ছিল। ভয়ের কারণটা তখন অবশ্য বুঝিনি। ঠিক করেছিলাম আজ রাতে নেকলেসটার কথা তুলব। কিন্তু আপনি তার আগেই তো···। মি. শহীদ, নেকলেসটার ওপর আমার দাবিই এখন সবচেয়ে বেশি। আপনিও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে···?'

শহীদ বলল, 'না। স্বীকার করব না। নেকলেসটা আপনি পাবার আশা ত্যাগ করুন। জিনিসটা পাওয়া গেছে যে মেয়েটি খুন হয়েছে তার বেডরুমে। খবরের কাগজে খুনের খবরটা পড়েছেন নিশ্চয়ই। পুলিস জানে না ওটা আমাদের কাছে

আছে, কিন্তু জানবে তারা।'

'নেকলেসটার কথা দেখছি আমার ভুলে যাওয়াই উচিত!' চিন্তিতভাবে কথাটা যেন নিজেকেই শোনাল কাজী হানিফ।

'অমন ভয়ে আধমরা হয়ে আছে কেন মিসেস রাফিয়া বলতে পারেন?' হঠাৎ প্রশ্নটা করল শহীদ।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। কিসের ভয়ে যেন সর্বক্ষণ কুঁকড়ে আছে। কারণটা বুঝতে পারিনি। গতরাতে আসার পর থেকেই লক্ষ করেছি ব্যাপারটা। খানিক আগে চলে যেতে বলায় প্রায় কেঁদে ফেলেছিল—ওই ভয়েই।'

'প্রোটেকশন চেয়েছিল কেন? কার কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা করছিল সে। বলেনি কিছু?'

'খানিকটা। কে একজন লোক নাকি তার পিছু লেগেছে, বিপদে ফেলার জন্যে। তার চোখে যাতে ধরা পড়তে না হয় সেজন্যে ক'দিন লুকিয়ে থাকতে চায়। যা বলল তাতে মনে হয় লোকটা ভয়ঙ্কর ধরনের। লোকটা যদি এখানে আসে আমি যেন তাকে ওপরে উঠতে বাধা দিই—অনুরোধ করেছিল আমাকে। আমি আপনাকে সেই লোকই ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনার পকেটের কাগজপত্র দেখে বুঝতে পারি ভুল হয়ে গেছে। যাক, আবার আমি ক্ষমা চাইছি, মি. শহীদ। আর আপনাকে কষ্ট দেব না। ভাল কথা, একজন অ্যাংলো ওপরে ওঠার চেষ্টা করার সময় আমার লোকদের হাতে ধরা পড়ে যায়। কুয়াশার নাম বলে সে। আপনার নামও বলে।'

'ডি. কস্টা।'

'হ্যাঁ, ওই নামই বলেছিল। তাকে আমরা বের করে দিয়েছি বাইরে। সে যদি আপনার লোক হয়ে থাকে, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্যেও ক্ষমা চাইছি।'

শহীদ দাঁড়াল, 'রীটা কোথায়?'

'আপনার গাড়িতে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি। টগর, মি. শহীদকে সসম্মানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।'

টগর বেরিয়ে গেল রুম থেকে। তাকে অনুসরণ করল শহীদ।

রুমটা আণ্ডারগ্রাউণ্ডেই অবস্থিত। লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল ওরা। করিডর থেকে হলরুমে পৌঁছুল। দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল টগর।

শহীদ পাশ ঘেঁষে বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, 'তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই।'

বলেই টগরের নাকে দেড়মণ ওজনের একটা ঘুসি মারল শহীদ। থ্যাচ্ করে শব্দ হলো, ভেঙে গেল নাকটা। প্রায় একই সাথে ডান পা দিয়ে খসরুর তলপেটে লাথি মারল ও।

হলরুমের কার্পেটে পড়ে গেল টগর—টগর নয়, টগরের অজ্ঞান দেহ।

দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এল শহীদ। মুখোমুখি হঠাৎ একটা কালো ছায়ামূর্তিকে দেখে চমকে উঠল ও।

'ডি. কস্টা জেদ ধরাতে আমি নিজে না এসে ওকে পাঠিয়েছিলাম। জানতাম এখানে গোলমাল হবে। কিন্তু সে আমাকে খুঁজে বের করে খানিক আগে খবর দিল—তা যাক, তোমার খবর কি?'

শহীদ বলল, 'কোন খবর নেই। এখনও রহস্য ভেদ করতে পারছি না।'

'আমার সাহায্য দরকার হলেই ফোনে জানিয়ো।'

শহীদ বলল, 'জানাব।'

'শহীদ, তোয়াব খান বাড়িতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি দেখা করবেন তোমার সাথে। যাতে দেখা করেন সে ব্যবস্থা আমি করেছি।'

শহীদ বলল, 'ধন্যবাদ।'

পরমুহূর্তে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো আলখেল্লা পরিহিত ছায়ামূর্তি।

অন্ধকারের দিকে নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শহীদ। তারপর, এক সময় গেটের দিকে পা বাড়াল।

পাঁচ

রাত সাড়ে বারোটা। মুক্তা নিকেতন। ফোক্সওয়াগেন গেটের সামনে থামতেই গেটটা শব্দ করে খুলতে শুরু করল।

নামার সময় শহীদ দেখল গার্ড লোকটা ইয়াকুব নয়, অন্য একজন। এগিয়ে যেতে দেখে বলল, 'সালাম, স্যার। মালিক আপনার জন্যে জেগে বসে আছেন এখনও। আপনি গাড়ি নিয়েই ভিতরে ঢুকুন। বিল্ডিংয়ের গেটে বাটলার আছে, সে আপনাকে মালিকের কামরায় পৌঁছে দেবে।'

গাড়িতে ফিরে এল শহীদ।

গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে রিস্টওয়াচ দেখল। বারোটা বেজে তেত্রিশ মিনিট হয়েছে। রীটা গোমেজ এতক্ষণে পৌঁছে গেছে বাড়িতে। একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এসেছে তাকে ও।

বিল্ডিংয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাটলার। গাড়ি থামিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে নামল শহীদ।

'আসুন, স্যার।' বিনয়ে বিগলিত সুরে বলল বাটলার। বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে অনুসরণ করল শহীদ।

স্টাডি রুমে অপেক্ষা করছিলেন মোহাম্মদ তোয়াব খান। শহীদকে ঢুকতে দেখে মুখের চেহারা যেমন ছিল, গাম্ভীর্য এবং বিরক্তিতে ভরপুর, তেমনি রইল, এতটুকু বদলাল না। 'বসুন, মি. শহীদ।' যেন গুরু গুরু ডেকে উঠল মেঘ।

শহীদ বসল পায়ের উপর পা তুলে।

'বলুন? কেন দেখা করতে চেয়েছেন?'

তীব্র কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে দিল শহীদ, 'চাই মিসেস রাফিয়াকে। এবং এই মুহূর্তে চাই।'

তোয়াব খান বললেন, 'আপনার সহকারীকে আমি তো একবার জানিয়েই

দিয়েছি আপনাদের নিজস্ব ঝামেলায় আমার স্ত্রীকে টানবেন না।'

'সে তো গত সকালের ঘটনা। তারপর বুড়ীগঙ্গার পানি অনেক গড়িয়েছে, মি. তোয়াব। অনেক ঘটনাও ঘটেছে। আপনার স্ত্রীকে খুনী সন্দেহে পুলিসও জেরা করতে আসবে। শুধু সময়ের ব্যাপার সেটা।'

'শহরে নেই সে। তাকে আমি এসবে জড়াতে দেব না। তার সাথে কথা বলার সুযোগও আমি দেব না কাউকে।'

'আগেই তিনি জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেকে। আমি তাঁর সাথে কথাও বলেছি।'

চুরুটটা হাত ফসকে পড়ে গেল ডেস্কের উপর, বোকার মত চেয়ে রইলেন কোটিপতি তোয়াব খান। 'কি বললেন? আবার বলুন।'

'ভুল শোনেননি। আমার সহকারীকে গত সকালে বলেছেন মিসেস রাফিয়াকে আপনি শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কথাটা সত্যি নয়। সত্যি হলো এই যে, গত রাতে আপনার স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর তাঁর সাথে আপনার আর দেখাই হয়নি। কোথায় রাতটা কাটিয়েছেন তিনি, বলতে পারেন? জানা আছে আপনার? না, আপনার জানা নেই। আমি জানি।'

শহীদ পাইপ বের করে টোবাকো ভরতে ভরতে বলল, 'আপনার ধারণা মিসেস রাফিয়া শিল্পীর খুন হওয়ার সাথে জড়িত। আপনি হয়তো বিশ্বাস করেন তিনিই শিল্পীকে খুন করেছেন। সেজন্যেই তাঁকে ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। কিন্তু, মি. তোয়াব, এটা একটা খুনের কেস, ভুলে যাবেন না। অপরাধী যে-ই হোক, তার নিষ্কৃতি নেই। আপনি জানেন না, মিসেস রাফিয়া গত রাতে আমার চেম্বারে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন জানেন? তাঁকে কেন অনুসরণ করা হচ্ছে তা জানতে। আমি তাঁকে আপনার সাথে কথা বলতে পরামর্শ দিই।

তিনি আমাকে টাকার লোভ দেখান। আমার কাছে সুবিধে করতে না পেরে তিনি বিদায় নেন, এবং রাস্তায় শিল্পীর সাথে মুখোমুখি কথা বলেন। তারপর ওর সাথে শিল্পীর ফ্ল্যাটে যান। ওদেরকে লোকে দেখেছে। পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট পর মিসেস রাফিয়া ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসেন। তার দেড় ঘণ্টা পর শিল্পী একটা ফোন পায় এবং সে-ও ফ্ল্যাট ছেড়ে ওই গভীর রাতে বাইরে বেরিয়ে আসে। তার মৃতদেহ আরও পরে মোরশেদ নামের এক লোক আবিষ্কার করে। সকালে আমার অপর এক সহকারী শিল্পীর ফ্ল্যাটে যায়। সে শিল্পীর বেডরুমের কার্পেটের নিচ থেকে মিসেস রাফিয়ার নেকলেসটা পেয়ে যায়। পরিষ্কার হয়ে যায় এরপর যে মিসেস রাফিয়া শিল্পীর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত।'

তোয়াব খান শুনলেন কথাগুলো। কিন্তু মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কি ভাবছেন তিনি। পিছনের নিভাঁজ দেয়ালের মতই তাঁর মুখের চেহারা ভাবলেশহীন, নির্বিকার।

শহীদ বলল, 'পরিস্থিতিটা আরও জটিল করে তুলেছে দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড।'

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তোয়াব খানের মধ্যে।

শহীদ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনাকে কথা দিয়েছিলাম পুলিসকে আপনার

কেস সম্পর্কে কিছু জানাব না। কিন্তু সে কথা এখন আর রাখা সম্ভব নয়। আমি পুলিসকে সব কথা জানাব।'

'সে কি!' তোয়াব খান চমকে উঠলেন। এতক্ষণ তিনি যে নির্বিকার ভাবটা ধরে রেখেছিলেন চেহারায় তা উবে গেল। হঠাৎ যেন বয়স বেড়ে গেল তাঁর। ক্লান্ত, আতঙ্কিত দেখাল।

অবদমিত কণ্ঠস্বরে আবার তিনি বললেন, 'আমার মানসিক অবস্থা ভাল নয়। সে যাই হোক, সমস্যাটা আপনি আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে বোঝার চেষ্টা করুন, প্লীজ। আমাকে আমার মেয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে।'

শহীদ বলল, 'মিসেস রাফিয়ার প্রসঙ্গে ফিরে আসুন। কোথায় তিনি?'

'খানিক আগে আপনিই তো বললেন তার সাথে কথা বলেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'কথা বলার সময় বাধা পেয়েছিলাম। ফেয়ার ভিউ নাইট ক্লাবে তাঁর সন্ধান পাই আমি। ওখানে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। মি. তোয়াব, তিনি কি বাড়িতে ফিরে এসেছেন?'

মাথা নাড়লেন তোয়াব খান।

'কোন খবর দেননি?'

'না।'

'বলতে পারেন কোথায় গেছেন তিনি? কোথায় তাঁকে পাব?'

'না। সে কি গতরাতে ওই নাইটক্লাবে ছিল?'

'হ্যাঁ। কাজী হানিফকে তিনি বলেন একজন লোক তাঁকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে, তাই তার দৃষ্টির আওতা থেকে সরে থাকার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় দরকার। নিজের নেকলেসটা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কাজী হানিফকে, আশ্রয়ের বিনিময়ে। কিন্তু নেকলেসটা পায়নি বলে কাজী হানিফ তাঁকে তাড়িয়ে দেয়।'

'দিস ইজ ফ্যানটাস্টিক! কে সেই লোক? কে তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে? এসব কথা আমাকে কেন বলেনি সে? কোথায় সে?' রাগে কাঁপছেন তোয়াব খান। চিৎকার করে কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালেন।

'লোকটা কে তা আমি জানার চেষ্টা করব। হয়তো এই লোকই আপনার স্ত্রীকে ব্ল্যাকমেইল করছে।'

পায়চারি করতে করতে তোয়াব খান বললেন, 'মি. শহীদ, একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন?'

'আমি সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারি।'

'রাফিয়া কি শিল্পীকে খুন করেছে? আপনার তাই বিশ্বাস?'

শহীদ বলল, 'না। শিল্পী এবং মোরশেদ, দু'জনেই খুন হয়েছে ·৪৫ পিস্তলের গুলি খেয়ে। মোরশেদকে গুলি করা হয়েছে পনেরো-বিশ গজ দূর থেকে। কপাল ফুটো করে ঢুকে গেছে বুলেট—অর্থাৎ অব্যর্থ লক্ষ্য। ·৪৫ পিস্তল ব্যবহার করে কোন মেয়ে এই খুন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি যা বিশ্বাস করি না পুলিসও তা বিশ্বাস করবে না এমন নয়। তিনি এমন উদ্ভট আচরণ করছেন

দেখেশুনে মনে হচ্ছে, কালপ্রিট তিনিই।'

'ওকে···ওর মত সেন্সলেস একটা মেয়েকে বিয়ে করে আমি পাপ করেছি। মি. শহীদ, আমাকে এই জঘন্য বিপদ থেকে রক্ষা করুন আপনি। আমাকে আমার একমাত্র মেয়ের কথা ভাবতে হবে। কথা দিচ্ছি আমার দ্বারা কোন সাহায্য সম্ভব হলে করব আপনাকে। কিন্তু দয়া করে আপনি পুলিস আর খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কবল থেকে আমাকে মুক্ত রাখুন।'

'চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু আবার বলছি, মিসেস রাফিয়ার সাথে কথা বলার পর পরিস্থিতি কি রকম দাঁড়ায় তার ওপর নির্ভর করছে সব। আচ্ছা, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ব্যবস্থাটা বন্ধ করতে পারেন তাঁর? টাকার অভাব হলে তিনি হয়তো আপনার কাছে বাধ্য হবেন ফিরে আসতে।'

'পারি। কাল সকালেই ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করব।'

শহীদ বলল, 'রাত অনেক হলো। এবার যেতে হয়। আর একটা কথা—আমার ফী···'

শহীদ কি বলবে তা যেন তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, শহীদকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কত?'

'আপাতত, দশ হাজার দিলেই চলবে।'

বিনাবাক্যব্যয়ে ড্রয়ার খুলে চেক বই আর কলম বের করলেন তোয়াব খান। চেক লিখে সই করলেন। চেকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আরও টাকা দেব আপনাকে আমি, মি. শহীদ। আরও যত চান। কিন্তু যে ভাবেই হোক, পুলিসের ঝামেলা এবং প্রচারের কলঙ্ক থেকে আমাদেরকে বাঁচান।'

চেকটা নিল শহীদ। কোন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে টাকা নেওয়া, ওর জীবনে সম্ভবত এটাই প্রথম ঘটনা। চেকটা নিল টাকার জন্যে নয়, তোয়াব খান যে ওকে একটা কেসে নিয়োগ করেছিলেন তার প্রমাণ হাতে রাখার উদ্দেশ্যে।

চেকটা কোটের বুক পকেটে রেখে হঠাৎ জানতে চাইল, 'ইয়াকুবকে কতদিন হলো চাকরিতে নিয়েছেন?'

'ইয়াকুব? কেন? এই কেসের সাথে তার কি সম্পর্ক?' অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটল তোয়াব খানের দুই চোখে।

'সম্পর্ক থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে সে সন্দেহজনক ভাবে বিলাসবহুল জীবন যাপন করে। কোথায় পায় সে অত টাকা? সন্দেহ হয়, মিসেস রাফিয়াকে সে-ই ব্ল্যাকমেইল করছে না তো?'

'ইয়াকুব!' বিকৃত কণ্ঠে নামটা উচ্চারণ করলেন তোয়াব খান। বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শহীদের দিকে। তারপর আবার বললেন, 'এসব কি!'

শহীদ বলল, 'কতটুকু জানেন তার সম্পর্কে আপনি?'

চুরুট ধরাতে ধরাতে বিরক্তির সাথে বললেন তিনি, 'কিছুই জানি না বলতে পারেন। মাসখানেক বা তার কিছু বেশিদিন হবে চাকরি করছে আমার কাছে। আমাদের বাটলার মোখলেস ওকে নিয়ে এসেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করতে বলেন ইয়াকুব সম্পর্কে?'

'এখন না। ওর সম্পর্কে আমিই খোঁজ নিচ্ছি। আচ্ছা, চলি। মিসেস রাফিয়ার সন্ধান বা দেখা পেলেই···।'

'অবশ্যই, সাথে সাথে জানাব।' প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন শহীদকে। হঠাৎ পিছন থেকে বললেন, 'অযৌক্তিক আচরণ করার জন্যে আমি লজ্জিত, মি. শহীদ।'

করিডরের শেষ মাথায় অপেক্ষা করছিল মোখলেস—বাটলার। নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল সে শহীদকে দেখতে পেয়েই। কাছাকাছি এসে সবিনয়ে বলল, 'স্যার, মিস ঋতু আপনার সাথে কথা বলতে চান। আপনি যদি দয়া করে আমার সাথে···।'

'এত রাতে ঋতু কথা বলতে চায়? কি কথা? চলো।'

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, সন্দেহ নেই। ঋতুর সাথে এর আগে দু'বার মুখোমুখি হয়েছে ও। অসুস্থ মানসিকতার শিকার মেয়েটা। মোটর অ্যাক্সিডেন্টে পঙ্গু হয়ে গেছে বছরখানেক আগে, হাঁটতে পারে না। সারাদিন সারারাত সে এই বাড়ির ভিতর বন্দিনী হয়ে থাকে। একা।

ডিম্বাকৃতি বেডরুমে ঢুকে শহীদ দেখল ঋতু কয়েকটা বালিশের উপর পিঠ এবং মাথা রেখে শুয়ে আছে। দুধে আলতা গায়ের রঙ, দেহে ভরা যৌবন, কালো সিল্কের স্লীপিং গাউনে সুন্দর মানিয়েছে। প্রথম দর্শনেই পরিষ্কার বোঝা যায়, ধনীর অভিমানী দুলালী। বালিশে ছড়ানো চুলের মাঝখানে সুন্দর মুখটা তাজা ফুলের মতই সজীব। কিন্তু চোখ দুটোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, মেয়েটি মানসিক অসুখে ভুগছে। তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গাত্মক চাউনি।

খাটের ধারে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। ঋতু নড়লও না, কথাও বলল না। শহীদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি যেন খোঁজার বা বোঝার চেষ্টা করছে সে।

শহীদের পিছনে দরজাটা মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। মোখলেসের পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

'পেয়েছেন তাকে?' তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠস্বর।

শহীদ একটু হাসল, 'ও, এই কথা জানার জন্যে ডেকেছ? না।'

'ফেয়ার ভিউ নাইট ক্লাবে খোঁজ নেননি?'

শহীদ পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ওখানে থাকতে পারে সে তা কে বলল তোমাকে?'

'হয় ওখানে, নয় সাধন সরকারের বাড়িতে—দু'জায়গার কোথাও আছে সে। তার আর যাবার জায়গা কই?'

'অমন জোর দিয়ে বলছ কিভাবে?'

ঠোঁট দুটো বিস্তারিত হলো একদিকে। বাঁকা হাসি হেসে বলল ঋতু আবার, 'তাকে আমি চিনি। কঠিন বিপদে পড়েছে, তাই না?'

জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো। তৃপ্তিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মুখটা।

শহীদ জানতে চাইল, 'সে বিপদে পড়েছে কিনা জানলে কিভাবে তুমি?'

'আপনার সহকারীকে খুন করেছে সে। এখনও জানেন না বুঝি?'

শহীদ বলল, 'খুন হয়েছে জানি। কিন্তু কাজটা কে করেছে তা এখনও জানি

না। তুমি জানো নাকি?'

জোর দিয়ে ঋতু বলল, 'আমি জানি সে টার্গেট প্র্যাকটিস করছিল।'

'কি ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র?'

'একটা রিভলভার। কিন্তু তা জেনে কি হবে?'

'জানলে কিভাবে?'

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল সে, 'তার প্রতিটি মুভমেন্ট সম্পর্কে খবর রাখি আমি। এ বাড়িতে সে আসার পর থেকে তার ওপর আমি নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি।'

সন্দেহ নেই ইয়াকুবকে দিয়ে এই কাজ করায় সে, ভাবল শহীদ। বলল, 'টার্গেট প্র্যাকটিস করাটা অপরাধ নয়। কেউ টার্গেট প্র্যাকটিস করলেই তাকে খুনী মনে করতে হবে নাকি?'

'তাহলে কেন লুকিয়ে পড়েছে সে? এ বাড়িতে ফিরে আসতে পারছে না সে কিসের ভয়ে? এই বাড়ি, এই বাড়ির ধন-সম্পদ, সম্মান—তার কাছে সবচেয়ে বেশি লোভনীয়। সেই লোভ বিসর্জন দিয়ে কেন সে আত্মগোপন করে আছে? নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে। কারণটা আর কি হতে পারে? সে খুন করেছে—এটাই কারণ।'

শহীদ বলল, 'অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। সাধন সরকার সম্পর্কে তুমি কি জানো, ঋতু?'

'তার প্রেমিক—ওই সাধন সরকার। আমি জানি।'

'তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে কেউ—তাও জানো তুমি?'

ঋতু হাসল আবার ঠোঁট বাঁকা করে। 'আমি কথাটা বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু তোমার ড্যাডি বিশ্বাস করেন।'

'ড্যাডি তো নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছেন। আমি জানি, রাফিয়া তার প্রেমিককে টাকা দিয়ে সাহায্য করছে।'

'তোমার ড্যাডি সাধন সরকার সম্পর্কে জানেন?'

মাথা নাড়ল ঋতু এদিক ওদিক।

'তার বেডরুমের ভিতর একটা সুটকেস পাওয়া গেছে, তাতে চামচ, লাইটার, স্যাণ্ডেল, এইসব ছোটখাট জিনিস পাওয়া গেছে—এ কথা তোমার ড্যাডি বলেছেন তোমাকে?'

'ড্যাডি বলবেন কেন। আমি জানি। আমারও অনেক জিনিস চুরি করেছে ও। ছ্যাঁচড়া চোর একটা।'

'তুমি তাকে দেখতে পারো না, ঘৃণা করো, না?'

অস্ফুটে বলল ঋতু, 'করি।'

শহীদ বলল, 'তার বেডরুমে কেউ শত্রুতা করে জিনিসপত্রসহ সুটকেসটা রেখে আসতে পারে। তুমি কি বলো?'

'বোকা ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না সে-কথা। সে যে চোর একথা কার জানতে বাকি আছে? এমনকি মোখলেসেরও অনেক জিনিস চুরি গেছে।'

'ইয়াকুবের কোন জিনিস চুরি যায়নি?'

অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল ঋতু, ঝট করে তাকাল শহীদের দিকে। আগুন ঝরতে শুরু করেছে তার দু'চোখ থেকে।

'গেছে হয়তো।'

'হয়তো মানে? বলেনি সে তোমাকে কিছু? কিছু চুরি গেলে তোমাকে তো বলতই।'

নিজেকে সামলে রাখল সে অতি কষ্টে। বলল, 'হয়তো মোখলেসকে বলেছে।'

'ইয়াকুব মিসেস রাফিয়ার শোফার হিসেবেও কাজ করে তাই না?'

চেহারা আরও লাল হয়ে উঠল মেয়েটার। বলল, 'করলেই বা কি?'

'মিসেস রাফিয়া সুন্দরী কিনা, তাই বলছিলাম।'

ঋতু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাজে কথা বলবেন না।'

কথাটা বলে অন্যদিকে তাকাল আবার ঋতু। কিন্তু পরমুহূর্তে প্রশ্ন করল, 'তাকে পেলে কি করবেন? পুলিসের হাতে তুলে দেবেন না?'

'তুমি কি তাই চাও?'

'আমি কি চাই সেটা প্রশ্ন নয়। পুলিসের হাতে তাকে তুলে দেবেন কি দেবেন না?'

শহীদ বলল, 'এখনও জানি না শিল্পীকে সে খুন করেছে কিনা? সে যদি করে, তবে—অবশ্যই দেব।'

'জানেন না? কেন? জলের মত পরিষ্কার ব্যাপার যে সে খুন করেছে।'

'মোটিভ কি?'

'ড্যাডি তাকে প্রচুর সয়-সম্পত্তি দেবেন। উইল অনুযায়ী দু'বছর পর অগাধ টাকা এবং সয়-সম্পত্তির মালিক হবে সে। এই ব্যাপারটাই সুন্দর একটা মোটিভ নয়?'

'তুমি বলতে চাইছ সাধন সরকারের সাথে তার সম্পর্কের কথা তোমার ড্যাডি জানতে পারলে তিনি তাকে ডাইভোর্স করবেন, সম্পত্তি সে পাবে না—এই ভয়ে সে শিল্পীকে খুন করেছে?'

'শিল্পী জেনে ফেলেছিল তার সাথে সাধন সরকারের গোপন সম্পর্ক রয়েছে। জলের মত পরিষ্কার মনে হচ্ছে না?'

'কিন্তু সাধন সরকারেরও প্রচুর টাকা আছে।'

'প্রচুর কাকে বলেন আপনি? রাফিয়া যা আমার ড্যাডির কাছ থেকে পাবে তা দিয়ে অমন সাধনকে দশবার কেনা যাবে। তাছাড়া, রাফিয়া সাধনের ওপর নির্ভরশীল হতে চাইবে না এ তো স্বাভাবিক কথা।'

'অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে কথাগুলো। সয়-সম্পত্তির প্রতি তার যদি এতই লোভ থাকত তাহলে হত্যাকাণ্ডের পর সে এ বাড়িতেই ফিরে আসত। ফেয়ার ভিউয়ে গিয়ে লাভ হলো কি তার? সম্পত্তি তো সে এই উদ্ভট আচরণের জন্যেই হারাবে।'

'কোথাও গুরুতর কোন গোলমাল হয়েছে, তাই যেতে বাধ্য হয়েছে সে।

হয়তো···হয়তো কেন, নিঃসন্দেহে বলা যায় শিল্পীকে হত্যা করার সময় দেলোয়ার মোরশেদের চোখে পড়ে যায় সে।'

শহীদ এতক্ষণে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল চারদিকের দেয়ালে যে ভারি কাপড়ের পর্দা ঝুলছে তার পিছনে কেউ একজন আত্মগোপন করে আছে। নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে কিছুক্ষণ থেকে।

'ঋতু, তুমি হাঁটতে পারো না, অথচ কোন খবরই তোমার অজানা নয়। কে তোমাকে সাপ্লাই দেয় খবর?'

সরাসরি উত্তর না দিয়ে ঋতু আরও বলল, 'আমি পঙ্গু বলেই অতিরিক্ত সচেতন থাকি। সাবধান থাকতে হয় আমাকে। সে যাক, যা বললাম ভেবে দেখবেন। আমি এখন ঘুমাব। খুব ক্লান্ত বোধ করছি।'

চোখের পাতা বুজে মাথাটা কাত করল সে। কিন্তু সাথে সাথে তাকাল আবার, 'আমাকে আপনার ধন্যবাদ জানানো উচিত। আপনার সহকারীকে কে হত্যা করেছে তা জানিয়েছি। বাকি কাজটা করা আপনার দায়িত্ব।'

আবার চোখ বন্ধ করল সে। চোখ না মেলেই বলল, 'মোখলেস করিডরে অপেক্ষা করছে। সে আপনাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমি আর কথা বলতে পারছি না।'

নিঃশব্দে সোজা হেঁটে ডান পাশের পর্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে ফেলল ও।

কেউ নেই। একটা খোলা জানালা রয়েছে সামনে। উঁকি মেরে অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেলেও দ্রুত একটা পদশব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, শুনতে পেল ও।

'ও কি হচ্ছে?'

শহীদ দরজার দিকে পা বাড়াল, 'সন্দেহ মোচনের চেষ্টা হচ্ছিল।'

'সন্দেহ? কিসের সন্দেহ?'

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। মুচকি হেসে বলল, 'ইয়াকুব। আড়ি পেতে শুনছিল আমাদের কথা।'

বিছানায় তড়াক করে উঠে বসল ঋতু। কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটার আগেই শহীদ বেরিয়ে এল করিডরে।

দূর প্রান্তে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে মোখলেস। ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার অবতার বলে মনে হলো লোকটাকে শহীদের।

ছয়

গাড়ি চালাতে চালাতে মাথার ব্যাণ্ডেজটায় একবার হাত বুলাল শহীদ। ব্যথা করছে ভীষণ।

বাড়িতে নয়, অফিসে যাবার সিদ্ধান্ত নিল ও। নির্জনতা দরকার। চিন্তা ভাবনা করার জন্যে।

গাড়ি থামাল শহীদ রাস্তার উপর। গেট খোলা। খোলা রেখেই বেরিয়েছিল

নাকি ও?

হবেও বা। মনে নেই। করিডরে উঠে থমকাল মুহূর্তের জন্যে। কিসের গন্ধ? বারুদের নয়? হ্যাঁ—বারুদের গন্ধ।

দরজাটা বন্ধ না খোলা? পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। মৃদু ধাক্কা দিতেই উন্মুক্ত হয়ে গেল কবাট দুটো।

ব্যাপার কি? দরজা তো সে খুলে রেখে যায়নি! কে খুলল? পা টিপে টিপে অন্ধকার রুমে ঢুকল ও। সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সুইচ অন করল, রুমের দিকে তাকিয়ে। কেউ নেই। পাশের রুমে ঢুকে একই পদ্ধতিতে আলো জ্বালল। উজ্জ্বল আলোয় মিসেস রাফিয়াকে প্রথমে দেখতে পেল শহীদ। একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে সোফার পাশেই। কুঁকড়ে রয়েছে দেহটা সোফার উপর। যেন অতিরিক্ত ক্লান্তিতে সোফার উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কপালের ফুটোটা কুৎসিত, ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। রক্ত এখনও জমাট বাঁধেনি।

·৪৫ কোল্ট পিস্তলটা দেখল শহীদ তারপর। খোলা একটা জানালার নিচে, কার্পেটের উপর।

মৃতদেহটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। মুখটা এতক্ষণে ভাল করে দেখতে পাওয়া গেল। অমন সুন্দর মুখটা রক্তাপ্লুত অবস্থায় কুৎসিত দেখাচ্ছে। চেয়ে থাকতে পারল না শহীদ। চোখ ফিরিয়ে নেবার সময় ওর সামনের দেয়ালে একটা ছায়া দেখল শহীদ।

একটা মানুষের ছায়া। মাথায় হ্যাট রয়েছে ছায়াটার। হ্যাটের উপর তার ডান হাতটা তোলা। সেই হাতে ভারি কিছু একটা রয়েছে। হাতটা নেমে আসছে নিচের দিকে।

এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করল শহীদ, কিন্তু পুরোপুরি ঘুরতে পারার আগেই মাথায় আঘাত পেল ও।

তারপর আর কিছু মনে নেই শহীদের।

জানালা দিয়ে ভোরের কচি রোদ ঢুকেছে রুমের ভিতর। ফিসফিস করে কথা বলছে কারা যেন। অন্তত একটা কণ্ঠস্বর পরিচিত ঠেকছে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না ও।

মনে পড়ছে ধীরে ধীরে গত রাতের ঘটনা। হ্যাট পরা একজন লোক পিছন থেকে আক্রমণ করেছিল ওকে।

মাথার ব্যথাটা কষ্ট দিচ্ছে ভীষণ। মহুয়া···খবর পায়নি সে? কামালই বা কোথায়? সন্ধ্যার পর তাকে নারায়ণগঞ্জে পাঠিয়েছিল ও—রাতেই তো তার ফেরার কথা। নাকি সে-ও সেখানে বিপদে পড়েছে?

মহুয়ার কথাটা আবার মনে পড়ল। সে হয়তো জানেই না ও অফিসে সারারাত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জানবেই বা কিভাবে, জানবার তো কথা নয় তার।

হ্যাট পরা লোকটা···কে সে? মি. সিম্পসন হ্যাট পরেন। হাসি পেল ওর। মাথাটা ঠিক মত কাজ করছে না। হ্যাট আর কে পরে?

ডি. কস্টা।

ডি. কস্টা বা মি. সিম্পসন ওকে কেন আক্রমণ করবে?

কণ্ঠস্বরটা এতক্ষণে চিনতে পারছে শহীদ। আবার চোখ মেলল ও। আধহাত দূরে, কার্পেটের উপর রোদ বিছিয়ে রয়েছে। ইন্সপেক্টর গনি ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে। জোর গলায় কথা বলছে সে, 'মি. শহীদ? চোখ মেলে রাখতে পারছেন না, মি. শহীদ? চেয়ে থাকুন, দেখুন আমরা এসেছি, আর কোন ভয় নেই···মি. শহীদ!'

কিন্তু চোখ মেলে রাখতে পারল না শহীদ। আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল পাতা দুটো।

ইন্সপেক্টরের পদশব্দ সরে গেল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল। 'সামনের রুমে মেয়েটা কে?'

উত্তরে কে যেন কি বলল, শুনতে পেল না শহীদ।

মিসেস রাফিয়া। মনে পড়ে গেল। চোখ মেলল শহীদ। হাত নেড়ে খামচে ধরল কার্পেট। অসহ্য ব্যথায় খসে পড়ে যেতে চাইছে মাথাটা। মিসেস রাফিয়ার মৃতদেহটা···সেটা সামনের রুমে গেল কিভাবে? সামনের রুমের কথা বলল কেন ইন্সপেক্টর?

চোখ বন্ধ করল আবার শহীদ। চিন্তা করতে চাইছে না ও। কিন্তু স্রোতের মত একটার পর একটা বিষয় ধাক্কা মারছে মাথার ভিতর। বাস্তব অবস্থাটা কি? কোল্ট ·৪৫ অটোমেটিকটা নিশ্চয়ই পেয়েছে ইন্সপেক্টর। লাশটাও আবিষ্কার করেছে। দুই যোগ দুই—চার।

কি করবে ইন্সপেক্টর গনি? সে কি মিসেস রাফিয়াকে হত্যা করার জন্যে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে?

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? একটার পর একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে। কোন কিনারা হচ্ছে না। প্রথমে শিল্পী। তারপর দেলোয়ার মোরশেদ। তারপর মিসেস রাফিয়া।

এরপর কে?

ও নিজে? খুনী এবার বুঝি ওকেই খুন করার চেষ্টা চালাবে। চালাবে বলা ভুল—খুন করারই তো চেষ্টা করেছিল ওকে। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে।

না, তা বোধহয় না। যে আক্রমণ করেছিল সে বোধ হয় শিল্পীর খুনী নয়। ওকে খুন করতে চেয়েছিল বলে মনে হয় না। চাইলে পারত। প্রথম আঘাতেই জ্ঞান হারায় ও। অজ্ঞান কোন লোককে খুন করা তো মশা মারার মতই সহজ। না, লোকটা ওকে খুন করতে চায়নি। তাছাড়া, আর একটা ব্যাপার, পিস্তলটা দেখেছিল ও জানালার ঠিক নিচে—খুনী যদি ওই হ্যাট পরা লোকই হবে, পিস্তলটা ফেলে রাখবে কেন সে?

কি প্রমাণ হচ্ছে তাহলে?

হ্যাট পরা লোকটা মিসেস রাফিয়াকেও খুন করেনি। খুন করেছে আর কেউ।

খুনী খুন করে চলে যাবার পর লোকটা ঢোকে এখানে। এমন সময় ও পৌঁছায়। ওর পায়ের শব্দ পেয়ে লোকটা লুকিয়ে পড়েছিল রুমের কোথাও। ওর চোখে ধরা না পড়ে রুম থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সে আক্রমণ করে ওকে পিছন থেকে।

কেমন হচ্ছে ব্যাখ্যাটা? নিজেকেই প্রশ্ন করল শহীদ।

মন্দ নয়। মনে হচ্ছে, এটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।

হালকা হয়ে গেল মনটা। সেই সাথে যেন মাথার ব্যথাটাও অনেক কমে গেল। চোখ মেলেই ছিল ও, পাশ ফিরল।

কারও দিকে নয়, চোখ পড়ল প্রথমে সোফার উপর।

লাশটা নেই।

'মি. শহীদ!'

ইন্সপেক্টর গনি ভারি দেহটা নিয়ে দোরগোড়া থেকে প্রায় ছুটে এল। নিজের চেষ্টাতেই উঠে বসল শহীদ। অসুস্থ বোধ করল না ও, মাথাটা ঘুরে উঠবে মনে করেছিল, তা-ও ঘুরল না।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' ইন্সপেক্টরের কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর।

'আপনারা কিভাবে খবর পেলেন?' প্রশ্ন করল শহীদ।

'খবর পাইনি। অন্য একটা কারণে এসেছিলাম। আপনার বাড়িতেই যেতাম, কিন্তু গেট খোলা দেখে ভিতরে ঢুকে আপনার এই অবস্থা দেখি। কি সাংঘাতিক কাণ্ড। কে, মি. শহীদ?'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল শহীদ। 'মহুয়া, কামাল—ওদেরকে খবর দেয়া হয়নি?'

'এইমাত্র এলাম আমরা। একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়েছি ডাক্তার আনতে। ওদের কাউকে খবর দিইনি তার কারণ···।' চুপ করে আছে ইন্সপেক্টর গনি।

'কি কারণ?' উঠে দাঁড়াল শহীদ। কাছের একটা চেয়ারে বসে আবার সোফাটার দিকে আড়চোখে তাকাল ও।

লাশ তো নেই-ই। রক্তের ছিটে ফোঁটা দাগও নেই।

ব্যাপার কি? লাশটা কি সত্যিই সামনের রুমে? গেল কিভাবে ওখানে? সোফায় রক্ত নেই কেন?

'সবাই এসে ভিড় করলে কথাবার্তায় বিঘ্ন ঘটবে,' ইন্সপেক্টর বলল।

সরাসরি তাকাল শহীদ, 'কিসের কথাবার্তা, ইন্সপেক্টর?'

ইন্সপেক্টর এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শহীদের দিকে। খানিক পর বলল, 'বলব মি. শহীদ। আর একটু সুস্থ হয়ে নিন।'

মাথা নিচু করে কিছু ভাবল শহীদ। বুদ্ধি খাটিয়ে প্রশ্ন করল একটা, 'সামনের রুমে একজন ভদ্রমহিলা আছেন, ইন্সপেক্টর?'

ইন্সপেক্টর গনি চোখ সরায়নি শহীদের দিক থেকে। আরও তীক্ষ্ণ হলো তার দৃষ্টি, 'হ্যাঁ। কে ওই ভদ্রমহিলা?'

শহীদ চুপ করে থাকল।

ইন্সপেক্টর গনি কনস্টেবলকে উদ্দেশ করে বলল, 'ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসো তো।'

শহীদ বলল, 'না!'

ইন্সপেক্টরের ভুরু জোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠল, 'না মানে? দেখা করতে চান না ভদ্রমহিলার সাথে?'

চেয়ে রইল শহীদ ইন্সপেক্টরের দিকে। তার ভাষাটা যেন বোধগম্য হচ্ছে না ওর। মৃত একটা মেয়ের সাথে দেখা করে নাকি কেউ?

এমন সময় দোর-গোড়ায় দেখা গেল রীটাকে। হাস্যোজ্জ্বল, চঞ্চল। সকৌতুকে বলে উঠল, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, মি. শহীদ। পুলিসে ছুঁলে আঠারো দু'গুণে ছত্রিশ ঘা। কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন।'

শহীদ বলল, 'ও, তুমি।'

ইন্সপেক্টর সাথে সাথে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি আর কারও কথা ভেবেছিলেন?'

শহীদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার ভিতর সাইক্লোন বইতে শুরু করেছে। রহস্যটা কি? রহস্যটা কি? রহস্যটা কি? মৃতদেহটা কোথায়? কোথায়? লাশের কথা তুলছেন না কেন ইন্সপেক্টর? কেন?

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

টলতে টলতে সামনের রুমে যাবার দরজার দিকে এগোতে শুরু করেছে শহীদ।

চেয়ে আছে সবাই।

শহীদ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল সামনের রুমটা।

নেই!

লাশ নেই, রক্ত নেই—কিছুই নেই।

ফিরে এল শহীদ। বসল চেয়ারে। মাথাটা হঠাৎ চক্কর দিয়ে উঠল। চেয়ারে হাতল নেই, কিন্তু আছে মনে করে আঁকড়ে ধরার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল ও।

ছুটে এল রীটা। ইন্সপেক্টর গনি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে শ্রাগ করলেন, 'মিস্টিরিয়াস। ব্যাপারটা বুঝলাম না!'

আবার জ্ঞান হারাল শহীদ।

সাত

পনেরো মিনিট পর চোখ মেলে কামাল ও ডাক্তার আসাদুজ্জামান, নতুনদের মধ্যে এদেরকে দেখতে পেল শহীদ।

নড়েচড়ে সিধে হয়ে উঠে বসল ও সোফার উপর। জ্ঞান হারাবার পর চেয়ার থেকে সোফায় শুইয়ে দেয়া হয়েছিল ওকে।

কেউ কথা বলল না। কিন্তু প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারল শহীদ হাজার হাজার প্রশ্ন মাথা খুঁড়ে মরছে প্রত্যেকের বুকে।

ডাক্তার আসাদুজ্জামান এগিয়ে এসে বললেন, 'মোটেই মারাত্মক আঘাত নয়। খুলি ফাটেনি, উপরের চামড়া কেটে গেছে মাত্র দু'জায়গায়। দুটো ইঞ্জেকশন দিয়েছি। আর দুটো বিকেলের দিকে নিতে হবে। আর কিছু ক্যাপসুল খেলেই সব

ঠিক হয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

ছোট একটা শিশি বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার ওর দিকে, 'এই ব্র্যাণ্ডিটুকু এক ঢোকে গিলে ফেলুন। হাঁটাচলা করার শক্তি পাবেন।'

নির্দেশ পালন করল শহীদ। খালি শিশিটা ছুঁড়ে দিল ও কামালের দিকে কামাল সেটা লুফে নিল।

'কিরে! খুব ভয় পেয়েছিস, না?'

কামালের উদ্দেশে কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল শহীদ। বলল, 'হাত-মুখ ধোব বাথরুমে ঢুকছি আমি। ইন্সপেক্টর, আপনি কি খুব ব্যস্ত? ব্যস্ততা না থাকলে অপেক্ষা করুন।'

ইন্সপেক্টর গনি এতক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিল, একটাও কথা বলেনি। শহীদের প্রশ্নের উত্তরেও মৌনতা বজায় রাখল। অবাক চোখে শহীদকে সারাক্ষণ দেখছে সে।

সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল শহীদ। কাপড়-চোপড় খোলার আগে রিস্টওয়াচটা চোখের সামনে তুলল ও। নয়টা বেজে বিশ মিনিট হয়েছে। অফিসে ঢুকেছিল ও রাত তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। মিসেস রাফিয়া খুন হয়েছিল বড়জোর পনেরো মিনিট আগে—অর্থাৎ সাড়ে তিনটের সময়। ছয় ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রায় সবটুকু সময় অজ্ঞান হয়ে ছিল ও।

মৃতদেহটা নেই। ঝট্ করে এদিক ওদিক তাকাল ও। না, বাথরুমেও নেই মৃতদেহ। অফিসের কোথাও আছে? সকলের চোখের আড়ালে? টেবিলের নিচে সোফার তলায়, কিংবা আলমারির ভিতর?

না। তা সম্ভব নয়। ইন্সপেক্টর গনি সন্ধান নিয়েছে। ওকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখার পর সে সার্চ করেছে গোটা অফিস—কোন সন্দেহ নেই।

যে সোফার উপর লাশটা ছিল সেই সোফার হালকা বাদামী রঙের কভারটা নেই।

লাশটা কেউ সরিয়ে নিয়ে গেছে। কেন? কেই বা?

মাথার ভিতর চিন্তার জাল তৈরি হচ্ছে অনবরত।

কেন? খুনী কি বদ্ধ উন্মাদ? সে যদি লাশ এবং পিস্তলটা ফেলে রেখে যেত সম্পূর্ণ সন্দেহটা পড়ত ওর উপর।

কিংবা, এমনও হতে পারে, মৃতদেহটা খুনী নিয়ে যায়নি। অন্য কেউ নিয়ে গেছে। রীটা গোমেজ? ওকে পুলিসের জেরার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে সরিয়ে ফেলেনি তো লাশটা? তার নার্ভ খুব শক্ত। এই ধরনের কাজ তার পক্ষে করা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু···নাহ! কষ্ট-কল্পনা হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

কে তাহলে?

মুখহাত ধুতে ধুতে বারবার সেই একই প্রশ্ন করতে লাগল শহীদ—কে? কে তাহলে? সেই হ্যাট পরা লোকটা? খুনী স্বয়ং?

পনেরো মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল শহীদ।

সোফায় বসল ও।

কেউ কোন শব্দ করছে না। কামাল গালে হাত দিয়ে বসে আছে, চিন্তামগ্ন সে। ইন্সপেক্টর চোখ ফেরাচ্ছে না শহীদের দিক থেকে। চাপা একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে আছে তার চেহারায়।

রীটা একটা ম্যাগাজিন খুলে মাথা নিচু করে পড়বার ভান করছে।

ডাক্তার বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। সামনের রুমে সাব-ইন্সপেক্টর উসখুস করছে একা একা। প্রায়ই উঁকি মেরে ভিতরের পরিবেশটা আঁচ করার চেষ্টা করছে সে।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আড়চোখে ইন্সপেক্টর গনিকে দেখে নিল শহীদ।

ক্রিং···ক্রিং···।

হাত বাড়াল শহীদ রিসিভারের দিকে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি সকলের চোখে।

'শহীদ খান স্পিকিং!'

ছয় কি সাত সেকেণ্ড অপর প্রান্তের বক্তার বক্তব্য শুনল শহীদ। হাত থেকে খসে পড়ে গেল রিসিভারটা। বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ও কার্পেটের উপর পড়ে যাওয়া রিসিভারটার দিকে।

'শহীদ!' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কামাল, পায়ের ধাক্কা লেগে সশব্দে পড়ে গেল চেয়ারটা। দ্রুত এগোল সে। 'কি হলো? কে ফোন করেছে?' রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল কামাল, কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বুঝতে পারল সে।

'জামান···জামান···।' শহীদ উচ্চারণ করতে পারছে না কথাটা।

ইন্সপেক্টর গনি উঠে দাঁড়াল। নাটকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'হ্যাঁ, মি. শহীদ। জামান খুন হয়েছে। সেই খবর দেবার জন্যেই এসেছিলাম আমরা। কিন্তু ফোনে কে বলল আপনাকে কথাটা?'

উঠে দাঁড়াল রীটা গোমেজ। তার কোল থেকে পড়ে গেল ম্যাগাজিনটা।

'কুয়াশা,' বলল শহীদ।

ইন্সপেক্টর বলল, 'ঠিকই সন্দেহ করেছি আমি। কুয়াশা তাহলে সব খবরই রাখছে। সে-ও কি এই সব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত, মি. শহীদ?'

উত্তর দিল না শহীদ।

কামাল বলল, 'না, ইন্সপেক্টর।'

'কি করছিল জামান চট্টগ্রামে? কেন গিয়েছিল সে? চট্টগ্রামের পুলিস সুপার ফোন করে জানতে চেয়েছেন আমার কাছ থেকে।'

ভাঙা গলায় শহীদ বলল, 'কিভাবে খুন হয়েছে সে, ইন্সপেক্টর?'

'কর্ণফুলী নদীতে পাওয়া গেছে তার লাশ। হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। গতরাত দশটার সময় নিহত হয়েছে সে, চট্টগ্রাম পুলিসের ধারণা। লাশ দেখতে চাইলে আপনারা যেতে পারেন।'

আধঘণ্টা পর গম্ভীর থমথমে মুখে বিদায় নিয়ে চলে গেল ইন্সপেক্টর গনি তার দলবল নিয়ে।

'কামাল।'

নিঃশব্দে শহীদের সামনে এসে দাঁড়াল কামাল।

'টিকেটের ব্যবস্থা কর। দুটো। আমরা নেক্সট ফ্লাইটেই যাচ্ছি চট্টগ্রামে!'

কামাল চেয়ে রইল শহীদের দিকে।

'যা তুই,' বলল শহীদ।

বেরিয়ে গেল কামাল।

খোলা দরজা পথে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শহীদ বলল, 'এবার বলো, রীটা অত সকালে কেন এসেছিলে তুমি অফিসে?'

'ফোন করেছিলাম প্রথমে। কিন্তু কেউ ধরেনি রিসিভার। ফোন করেছিলাম কারণ, গতরাতে আপনি তোয়াব খানের কাছ থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছেন কি জানতে চেয়েছিলাম।'

'বাড়ির নাম্বারে ফোন করোনি কেন?'

রীটা গোমেজ বলল, 'বাড়ির নাম্বার জানা থাকলে তো!'

শহীদ চুপ করে থেকে একটু পর বলল, 'হুঁ। তারপর?'

'কেউ রিসিভার ধরছে না দেখে মনটা কেমন যেন করে উঠল। দেরি না করে তখুনি রওনা হয়ে গেলাম। আপনি রুমের কার্পেটের উপর পড়ে ছিলেন অজ্ঞান হয়ে। আলো জ্বলছিল। কি করব ভাবছিলাম, এমন সময় ইন্সপেক্টর আসেন।'

'তুমি কাউকে দেখোনি এখানে এসে?'

'ছিল না কেউ—কাকে দেখব? ঘটেছিল কি আসলে?'

শহীদ বলল, 'কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি ঢুকতেই—আক্রমণ করে পিছন দিক থেকে।'

পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সোফায় হেলান দিল রীটা গোমেজ, 'ঘটনাটাকে আপনি খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন—যেন কিছুই হয়নি।'

উঠে দাঁড়িয়ে পাশের কামরার দিকে এগোল শহীদ।

'কোথাও যাচ্ছেন?'

উত্তর দিল না শহীদ। পাশের কামরায় ঢুকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগল।

খানিকপর ফিরে এল আবার মাঝের রুমে। এটা সেটা দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারপর নিজের চেম্বারে ঢুকল।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল পাঁচ মিনিট পর। সব কিছু ঠিক ঠাক আছে। একটা জিনিসও এদিক ওদিক হয়নি। মিসেস রাফিয়া যে এখানে ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। সোফার বাদামী রঙের কভারটা যদি থাকত, নিজেরই সন্দেহ হত ওর দুঃস্বপ্ন দেখেছে ও, মৃতদেহ দেখেনি।

কিন্তু কভারটা নেই।

রীটা চেয়ে আছে ওর দিকে সারাক্ষণ, 'কি হয়েছে আপনার? কিছু খুঁজছেন মনে হচ্ছে?'

শহীদ মাথা নাড়ল—সম্মতি সূচক।

'কি?'

শহীদ অস্ফুটে বলল, 'নিজেই জানি না।'

রীটা গোমেজকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'মি. শহীদ, আপনার উচিত বিছানায় শুয়ে ক'দিন বিশ্রাম নেয়া।'

'না,' সংক্ষেপে বলল শহীদ। তারপর তাকাল সরাসরি রীটার দিকে, 'আর কোন কাজ নেই তোমার?'

আসন ত্যাগ করল রীটা। মিষ্টি করে হাসল। বলল, 'কাজ দিয়েছেন কিছু?'

'যাও, ইয়াকুব সম্পর্কে যথা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করো।'

উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। 'আর কিছু? মিসেস রাফিয়ার খোঁজ করব না? তাকে তো আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার।'

শহীদ বলল, 'না। তাকে আমাদের আর দরকার নেই।'

'তারমানে? কি বলছেন···মানে···।'

'ঠিকই বলছি। তার আর কোন মানেও নেই।'

আট

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। খানিক আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু সে বৃষ্টিধারা নেমেছিল খণ্ড মেঘমালা থেকে। আকাশের অধিকাংশটাই এখন ঢেকে ফেলেছে কালো মেঘের একখণ্ড ভারি চাদর।

প্লেনের চাকা চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের টারমাক স্পর্শ করল সকাল আটটায়।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল ওরা। কামাল ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থান সম্পর্কে নির্দেশ দিল।

ব্যাকসীটে বসল ওরা। দুইজন দুই দিকের জানালার ধারে। মাঝখানে শূন্যতা। দু'জনেই যার যার জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে।

কথা বলার উৎসাহ নেই কারও মধ্যে।

ঢাকায় থাকতেই মিসেস রাফিয়ার মৃতদেহ সম্পর্কে শহীদ বলেছে কামাল এবং মহুয়াকে। সব শুনে দু'জনেই এমন ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল দীর্ঘক্ষণ যে শহীদ বুঝতে পেরেছিল ওরা ওকে পাগল ভাবছে। তারপর আবার একবার সবাই মিলে তন্ন তন্ন করে চারদিক পরীক্ষা করে। কি খুঁজছিল ওরাই জানে। সম্ভবত, মিসেস রাফিয়া অফিসে ছিল তার কোন প্রমাণ বা চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা দেখছিল ওরা। পাওয়া যায়নি।

সোফার কভারটা নেই। এটা স্বীকার করেছিল ওরা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চিন্তা করছে শহীদ। কামালের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। কামালের ধারণা শিল্পী, দেলোয়ার মোরশেদ এবং মিসেস রাফিয়ার নিহত হওয়ার সাথে জামানের নিহত হবার কোন সম্পর্ক নেই।

আপাতঃদৃষ্টিতে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমান কেসে যে সব চরিত্র প্রকাশ্যভাবে জড়িত তারা সবাই ঢাকায় রয়েছে। ঢাকায় রয়েছে মোহাম্মদ তোয়াব

খান, তাঁর মেয়ে ঋতু, তাঁর গার্ড ইয়াকুব। ঢাকায় রয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন, সৌখিন যুবক সাধন সরকার, ফেয়ার ভিউ নাইট ক্লাবের মালিক কাজী হানিফ। আরও একজন ঢাকায় আছে। তার নাম জানা নেই, পরিচয় জানা নেই। হ্যাট পরা সেই লোকটা—কে সে? যেই হোক, সেও একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বর্তমানে সেই সবচেয়ে রহস্যময় চরিত্র। সে-ও রয়েছে ঢাকায়।

মোটকথা শহীদ ব্যাখ্যা করে বলতে না পারলেও ওর মন বলছে জামানের নিহত হবার সাথে বর্তমান কেসের সরাসরি যোগাযোগ আছে। যে রহস্যের শিকার হয়েছে শিল্পী, দেলোয়ার মোরশেদ, মিসেস রাফিয়া, সেই একই রহস্যের শিকার জামানও।

জামান কাজ নিয়ে এসেছিল চট্টগ্রামে। গতকাল সাড়ে চারটের সময় পৌঁছয় ও। রাত একটার সময় কর্ণফুলী নদীতে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায়। মেডিক্যাল রিপোর্ট বলছে অন্তত চার ঘণ্টা আগে নিহত হয়েছে ও। অর্থাৎ চট্টগ্রামে পৌঁছুবার প্রায় চার ঘণ্টা পর খুন হয়েছে ও।

এই চার ঘণ্টায় কি কি করেছিল জামান? ওকে পাঠানো হয়েছিল মিসেস রাফিয়ার অতীত জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে। জোয়ারদার ফটোগ্রাফারস্-এর সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল ওকে। সাধন সরকারের বাড়ি থেকে মিসেস রাফিয়ার যে ছবিটা শহীদ উদ্ধার করে সেটার পিছনে জোয়ারদার ফটোগ্রাফার-এর নাম ঠিকানা ছিল। ছবিতে মিসেস রাফিয়াকে অর্ধ নগ্ন দেখাচ্ছিল। টু-পীস বিকিনি পরে ছবি তোলে সে। অমন একটা ছবি অপরিচিত কাউকে দিয়ে তোলানো কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়, শহীদের মনে হয়েছিল। জোয়ারদার ফটোগ্রাফারস-এর মালিক বা ফটোগ্রাফারের সাথে মিসেস রাফিয়ার ঘনিষ্ঠতা না থেকে পারে না। এই কথা ভেবেই শহীদ জামানকে পাঠিয়েছিল চট্টগ্রামে।

ঢাকা থেকে কি কেউ অনুসরণ করেছিল জামানকে? ন'টার দিকে নিহত হয়েছে ও—খুনী তাকে খুন করে পরবর্তী ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে যেতে পারে, ফিরে গিয়ে মিসেস রাফিয়াকে খুন করতে পারে।

উদ্ভট হয়ে উঠছে চিন্তাগুলো? নিজেকেই প্রশ্ন করল শহীদ।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি চলে এসেছে ট্যাক্সি।

'কথা যা বলার আমিই বলব,' বলল শহীদ। ট্যাক্সি হেডকোয়ার্টারের ভিতর ঢুকল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগোল ওরা। করিডরে ওদের মুখোমুখি হলো একজন সাব-ইন্সপেক্টর। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল সে।

'মি. শহীদ! পৌঁছে গেছেন আপনারা! আসুন, স্যার, আমার সাথে আসুন।'

চিনতে পারল না শহীদ সাব-ইন্সপেক্টরকে। চিনতে পারার কথাও নয়। এ লোককে আগে কখনও দেখেনি ও। সাব-ইন্সপেক্টরও ওকে সশরীরে দেখেনি কখনও। ওর ছবি দেখেছে অসংখ্যবার খবরের কাগজে, তাই চিনতে ভুল করেনি।

অফিসে গিয়ে বসল ওরা। মুখোমুখি বসা লোকটা ঘড়ঘড়ে গলায় কাশল কয়েকবার। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। বলল, 'স্যার, এমন দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে

দিয়ে আপনার সাথে পরিচয় হবে ভাবিনি। আপনার সুনাম-সুখ্যাতি শুনে শুনে…।'

শহীদ বলল, 'ইন্সপেক্টর, ডেড-বডি কোথায় তাই বলুন।'

'জ্বী? জ্বী হ্যাঁ। ডেড-বডি—মর্গে। আমি ইন্সপেক্টর চেরাগ আলী খান, স্যার। নিহত ভদ্রলোক আপনার কে, স্যার?'

'সহকারী।'

ইন্সপেক্টর চেরাগ আলী খান মাথা দোলাল, 'জ্বী। জ্বী হ্যাঁ। সহকারীর নামটা, স্যার?'

'জামান চৌধুরী।'

'জ্বী। জ্বী হ্যাঁ, ডেড-বডি সনাক্ত করতে যেতে হবে, স্যার।'

বহন ক্ষমতার চেয়ে বেশি ভারি তার দেহটা। অতিকষ্টে চেয়ার ছেড়ে উঠল, 'জ্বী। জ্বী হ্যাঁ, চলুন।'

ভদ্রলোকের মুদ্রাদোষ ওটা। হাসি পাবার কথা, কিন্তু শহীদ বা কামালের হাসি পেল না। অনুসরণ করল ওরা তাকে। সামনে শুধু তার দেহটাই দেখা যাচ্ছে, বাকি সব আড়ালে। চলমান পাহাড় একটা।

করিডর ধরে এগোল ওরা। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকাল। তারপর উঠন। এক প্রান্তে লাল ইটের উঁচু ছাদের ঘর। ভিতরে ঢুকে একটি মাত্র বেড দেখতে পেল ওরা। বেডের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে কেউ। চাদর দিয়ে ঢাকা তার আপাদমস্তক। অ্যাটেনড্যান্ট লোকটাকে হুকুম দিল ইন্সপেক্টর।

মুখের চাদর সরাল সে।

'জ্বী? জ্বী হ্যাঁ। চিনতে পারেন, স্যার?'

জামানই। মাথা ঝাঁকাল শহীদ। চোখ ফিরিয়ে নিল ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে, পা বাড়াল দরজার দিকে। ভেজা চোখে নতমস্তকে ওকে অনুসরণ করল কামাল।

সস্তাদরের, নিম্ন শ্রেণীর হোটেল। ওয়েটার বা বেয়ারাদের ইউনিফর্ম নেই। যে লোকটা ওদেরকে পথ দেখিয়ে উপর তলায় নিয়ে গেল, মধ্য বয়স্ক, বেঢপ প্যান্ট পরনে। লোকটার হাঁটার ভঙ্গি হাস্যকর। পিঠটা একবার ডান দিকে কাত হয়ে যায়, একবার বাঁ দিকে। কোমরটাও অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকে। লোকটা যেন নেচে নেচে হাঁটে।

হোটেলে ঢোকার সময় ঘোর আপত্তি তুলেছিল কামাল, 'এই হোটেলে! তোর কি মাথা খারাপ হলো?'

কথা বলেনি শহীদ, থামেওনি। অগত্যা চুপ করে গিয়েছিল কামাল। শহীদ চুপ করে থাকলে এক কথা দু'বার বলবার সাহস হয় না তার। মাঝে মাঝে, সে জানে, শহীদ এমন ব্যাখ্যাহীন উদ্ভট কাণ্ড করে। গত ক'দিন থেকে তো চরমে উঠেছে ব্যাপারটা। এই রকম অবস্থায় আর যাই হোক, শহীদকে ঘাঁটাতে নেই। কামাল এতদিনে এটা ভাল করেই জেনেছে।

একটাই রুম। মাঝারি আকারের। দু'পাশে দুটো বিছানা। টেবিল একটাই, চেয়ার দুটো। একটা নামকা-ওয়াস্তে ড্রেসিং টেবিলও আছে, ভাঙাচোরা। আয়নাটা

ঝাপসা হয়ে গেছে, সামনে দাঁড়ালে অন্যরকম, অপরিচিত কারও, ভাঙাচোরা চেহারা প্রতিফলিত হয়। তবে অনেকগুলো জানালা। মোট পাঁচটা। একটা জানালার সামনে দাঁড়ালে বাইরের রাস্তাটা দেখা যায় নিচেই।

'তোমার নাম কি?'

'ঘন্টা মিয়া, স্যার।'

কামাল বিছানায় বসল, 'চা দাও দু'কাপ।'

'গোছল করবেন না, স্যার? ওই দরজাটা, ওটাই গোছলখানা।'

কামাল হাত নেড়ে বিদায় হতে বলল।

'হোটেলটা পছন্দ হয়নি তোর, না?' এই প্রথম কথা বলল শহীদ থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুবার পর।

'না। কেন যে তুই এই রকম পচা একটা হোটেলে উঠলি—কেন বল তো?'

উত্তর না দিয়ে পাইপে টোবাকো ভরল শহীদ। আগুন ধরিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল পাইপ। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রাস্তার দিকের জানালার সামনে, 'এদিকে আয়, দেখে যা।'

পাশে গিয়ে দাঁড়াল কামাল। দেখার জন্যে ডাকল শহীদ, কিন্তু দেখিয়ে দিল না।

'কি রে?' প্রশ্নটা করার পর ব্যাপারটা ধরা পড়ল কামালের চোখে।

'ও-ও, তাই বল!' শহীদের দিকে উজ্জ্বল মুখে তাকাল কামাল। তারপর আবার চোখ ফেরাল বাইরের দিকে।

নিচে রাস্তা। গাড়ি-ঘোড়া চলছে, লোকজন হাঁটছে। রাস্তার ওপারে পাশাপাশি কয়েকটা দোকান। তারপর একটা বাড়ির উঁচু পাঁচিল। তারপর আর একটা দোকান।

দোকান না, স্টুডিও। লাল এবং হলুদ রঙের সাইনবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে স্টুডিওর মাথায়। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—জোয়ারদার ফটোগ্রাফারস!

'দেখতে পাচ্ছিস? ওখান থেকেই তদন্ত শুরু করেছিল জামান। অন্তত তাই করার কথা ছিল।'

কামাল বলল, 'জামান মিসেস রাফিয়ার ছবিটা সাথে করে এনেছিল, না?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি একটা কপি তৈরি করে রেখেছিলাম, এনেছি সেটা। সুটকেসে আছে। কামাল, আমরা শুধু জামানের লাশ সনাক্ত করতেই আসিনি। ছবিটা দেখিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেও এসেছি।'

'আমাদের প্রথম পদক্ষেপ কি হবে তাহলে?'

শহীদ বলল, 'এখন তো স্টুডিওটা বন্ধ। খুলুক। আমি স্টুডিওর মালিকের সাথে দেখা করব। কি যে ঘটবে জানি না—কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবেই। স্টুডিওতে ঢুকব আমরা স্বাভাবিক ভাবে নয়, কৌশল খাটিয়ে। মালিকের সাথে হয়তো কিছুটা রাফ ব্যবহার করব আমরা।'

ঘন্টা মিয়া দরজার বাইরে থেকে খুক্ করে অকারণেই কাশল একবার, তারপর কবাট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ট্রে থেকে চায়ের কাপ দুটো টেবিলে নামিয়ে রাখল

সে।

জানালার কাছ থেকে শহীদ ফিরে এল, বসল চেয়ারে। 'কতদিন ধরে আছ তুমি এখানে?'

ঘণ্টা মিয়া দুই হাত তুলে দশটা আঙুল দেখাল, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ—পুরো দশ বছর, স্যার।' একটা একটা করে আঙুল গুনে বলল সে।

পকেট থেকে দশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট বের করে শহীদ বাড়িয়ে দিল। 'যাও তো একটা ম্যাচ কিনে নিয়ে এসো?'

'দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে পঁচিশ পয়সা দিয়ে, স্যার?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। বাকি নয় টাকা পঁচাত্তর পয়সা তোমার—বকশিশ!'

বাকস্ফূর্তি হলো না ঘণ্টা মিয়ার। বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল।

ধমক লাগাল কামাল, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও।'

'যাই, স্যার।' ছুটে পালিয়ে যাবার ভঙ্গিতে চলে গেল ঘণ্টা মিয়া।

কামাল বলল, 'দশ বছর ধরে আছে, তার মানে এই নয় যে ও স্টুডিওটা সম্পর্কে সব খবর রাখে।'

'রাখতেও পারে। হোটেলের গেটের মুখোমুখি ওটা। খবর শুধু নয়, নাড়ি নক্ষত্র সবই জানার কথা ওর। চেষ্টা করে দেখাই যাক না।'

ফিরে এল ঘণ্টা মিয়া, 'স্যার, টাকাগুলো কি···।'

'হ্যাঁ। পকেটে রাখো। আচ্ছা, ঘণ্টা মিয়া, দেখো তো এই ফটোর লোকটাকে তুমি কখনও দেখেছ কিনা?' পকেট থেকে দুটো ফটো বের করে একটা বাড়িয়ে দিল শহীদ। সেটা নেবার জন্যে হাত না বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল ঘণ্টা মিয়া, দেখতে লাগল জামানের ফটোটা। সতর্ক সাবধানী হয়ে গেল তার চোখের দৃষ্টি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'স্যার, আপনারা পুলিস!'

পকেট থেকে নয়টা এক টাকার নোট এবং খুচরো পঁচাত্তরটি পয়সা বের করে সে শহীদের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'ভুল করেছি, স্যার, ক্ষেমা করুন। এই নিন, বাকি টাকা পয়সা।'

'কেন? ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন? বকশিশ নাও না তুমি?'

'আপনারা পুলিস, স্যার! আপনাদের কাছ থেকে বকশিশ—না, স্যার।'

শহীদ বলল, 'আমাদেরকে পুলিস বলে মনে হচ্ছে বুঝি? নাকি নাটক করছ?'

বোকার মত চেয়ে রইল ঘণ্টা মিয়া।

'পুলিস নই, আমরা এই লোকের বন্ধু।'

'আপনাদের বন্ধু? উনি তো খুন হয়েছেন, স্যার? খোদার কসম বলছি স্যার, আমি কিছু জানি না, আপনারা খামকা আমাকে জড়াচ্ছেন···।'

শহীদ বলল, 'এক নম্বর বোকা তুমি। তুমি কেন খুনের সাথে জড়িত হবে? সে কথা বলেছি আমরা? রাখো, টাকা-পয়সা পকেটে রাখো। ভয় পাবার কোন দরকার নেই, বুঝলে? আমরা তোমার কাছ থেকে কয়েকটা খবর চাই শুধু। জানলে বলবে, না জানলে বলবে না। তেমন খবর দিতে পারলে তোমাকে আমরা

আরও টাকা দেব।'

'সত্যি আপনারা পুলিস নন তো, স্যার?'

'পুলিসরা তদন্ত করতে এসে হোটেলে রুম ভাড়া নেয়? কখনও শুনেছ?'

'না, স্যার। আপনারা···না, পুলিস বলে মনে হচ্ছে না, স্যার। পুলিসরা খাকি পোশাক পরে থাকে। সকাল বেলা এসেছিলেন তেনারা।'

'পুলিস এসেছিল কেন?'

ঘণ্টা মিয়া বলল, 'আপনাদের ওই বন্ধু সম্পর্কে ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে। আপনাদের বন্ধু তো এই হোটেলেই উঠেছিল। এই যাহ! সব্বোনাশ! তওবা··· তওবা···।'

নিজের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারল ঘণ্টা মিয়া। উন্মাদের মত মাথা দোলাতে লাগল সে, যেন ঘোরতর কোন অন্যায় ঘটিয়ে ফেলে অনুতাপে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে।

'কি হলো তোমার? অমন করছ কেন।'

ঘণ্টা মিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলল, 'স্যার, চাকরিটা গেল আমার! পুলিস আপনাদের বন্ধুর একটা ছবি নিয়ে এসেছিলেন। লাশের ছবি। কিন্তু ম্যানেজার পুলিসী ঝামেলা এড়াবার জন্যে তেনাদেরকে বলেছেন, ওই ভদ্রলোককে তিনি চেনেন না, এই হোটেলে ওই চেহারার কোন ভদ্রলোক ছিল না! অথচ আমি বলে ফেললাম···।'

শহীদ এবং কামাল দৃষ্টি বিনিময় করল।

শহীদ বলল, 'তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা কথাটা কাউকে বলতে যাচ্ছি না। তুমি অকারণে ভয় পাচ্ছ।'

ঘণ্টা মিয়া ঘন ঘন ঢোক গিলে বলল, 'আমার চাকরিটা খাবেন না, স্যার! স্যার মা-বাপ!'

শহীদ পকেট থেকে দশ টাকার আর একটা নোট বের করল। বলল, 'এটাও রাখো পকেটে। এবার কাজের কথা হোক, কেমন? শোনো, এই লোক আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। কেউ তাকে খুন করে, হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে দিয়েছিল কর্ণফুলীতে। আমরা তার খুন হওয়ার কারণ খুঁজছি। এ সম্বন্ধে জানো তুমি কিছু?'

'না, স্যার, আমি কিছু জানি না।'

'আমাদের বন্ধুর নাম জামান। সে কোন ব্যাগ রেখে বেরিয়েছিল কিনা জানো?'

ঘণ্টা মিয়া তাকিয়ে রইল।

ধমকে উঠল কামাল, 'উত্তর দাও!'

'হ্যাঁ, স্যার। ম্যানেজারের কাছে আছে সেটা। সরিয়ে রেখেছেন তিনি।'

'আনতে পারবে সেটা? কাউকে না জানিয়ে?'

ঘণ্টা মিয়া ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'ধরা পড়লে?'

'আমরা আছি। পারবে?'

'তা পারব, স্যার।'

'যাও। নিয়ে এসো ব্যাগটা।'

ঘণ্টা মিয়া নাচুনে ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি অনুমান করেছিলি জামান এই হোটেলেই উঠেছিল?'

শহীদ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিভাবে জানলি···?'

শহীদ তাকাল মুখ ফিরিয়ে কামালের দিকে, 'আমরা যে কারণে এই হোটেলে উঠেছি জামানও সেই একই কারণে এই হোটেলে উঠেছিল।'

কামাল স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, তাই হবে। আচ্ছা, ঘণ্টা মিয়া কি মিসেস রাফিয়ার ছবি দেখে কিছু বলতে পারবে বলে মনে করিস?'

'কি ঘটে দেখা যাক।'

একটা এয়ার ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ভিতরে ঢুকল ঘণ্টা মিয়া, 'স্যার, এটা কিন্তু আবার রেখে আসতে হবে।'

কেউ কোন কথা বলল না। কামাল ব্যাগটা ঘণ্টা মিয়ার কাছ থেকে নিয়ে খুলে ফেলল।

বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না জামানের ব্যাগে। ক'টা বই, ম্যাগাজিন, এক বোতল হুইস্কি, কিছু কাপড়চোপড়— ব্যস। মিসেস রাফিয়ার ছবি কিন্তু পাওয়া গেল না।

ব্যাগটা বন্ধ করে কামাল বলল, 'নিয়ে যাও।'

শহীদ বাধা দিল, 'এক মিনিট, দেখো তো এই মেয়েটির ফটোটা—চিনতে পারো?'

ঝুঁকে পড়ে শহীদের হাতে ধরা মিসেস রাফিয়ার ছবিটা দেখল ঘণ্টা মিয়া। 'হায় খোদা! এ যে দেখছি সুলতানা! স্যার···না, ভুল হচ্ছে না, এ সুলতানাই!'

শহীদ বলল, 'কে এই সুলতানা? কিভাবে চেনো একে? কোথায় পাব একে বলতে পারো?'

ঘণ্টা মিয়া বলল, 'কোথায় পাবেন তা জানি না, স্যার। কয়েক মাস থেকে আর দেখি না তাকে ফ্রেণ্ডশীপ ক্লাবে। মেয়েটা খুব নাম করেছিল। কিন্তু কোথায় যে চলে গেল, জানিও না!'

'ফ্রেণ্ডশীপ ক্লাব মানে?'

ঘণ্টা মিয়া আকাশ থেকে পড়ল, 'ফ্রেণ্ডশীপ ক্লাব চেনেন না, স্যার? বলেন কি! ফ্রেণ্ডশীপ নাইট ক্লাব-সবাই চেনে। আমি আগে প্রায়ই যেতাম। ওখানে আমার এক দোস্ত ছিল। তার কাছে যেতাম চাকরির তদবির করতে। হলো না, স্যার— ম্যানেজার বলে কি, আমি নাকি বুড়ো, বুড়োর চাকরি ওখানে হবে না···।'

শহীদ এবং কামাল দৃষ্টি বিনিময় করল।

'এর নাম সুলতানা বলছ তুমি। চিনতে ভুল করছ না তো?'

ঘণ্টা মিয়া হলুদ দাঁত বের করে হাসতে লাগল, 'না, স্যার! সুলতানার নাচ যে দেখেছে সে বিশ বছর পরও ভুলবে না। রাফিয়া সুলতানা—শহরের কে না তাকে চিনতো?'

কুয়াশা ৬৩

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৭৭

এক

যাচ্ছি তো আমরা স্টুডিওতে?'

শহীদ বলল, 'না। ফ্রেণ্ডশীপ নাইট ক্লাবে যাব আমি। চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম, সেটাই উচিত হবে।'

আসলে মিসেস রাফিয়া সম্পর্কে সম্ভাব্য সব তথ্য সংগ্রহ করতে চায় শহীদ। স্টুডিওতে যাবে ও, কিন্তু পরে।

ঘণ্টা মিয়ার সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা বলেছিল ও। নতুন কোন তথ্য দিতে পারেনি সে। শুধু ফ্রেণ্ডশীপ নাইট ক্লাবটার ঠিকানাটাই পাওয়া গেল তার কাছ থেকে।

সাথে যেতে চাইল কামাল। এ ব্যাপারে সে কোন অজুহাত শুনবে বলে মনে হলো না। কিন্তু শহীদ প্রসঙ্গটা আলোচনাই করতে চাইল না। একবার শুধু বলল, আমি একাই যাচ্ছি।'

কামাল আর কোন কথা বলতে পারল না। একাই বেরিয়ে গেল শহীদ।

ট্যাক্সি নিয়ে জুবিলী রোডে পৌঁছুল শহীদ। নামল একটা পিচ ঢালা গলি পথের সামনে।

গলিটা খানিকদূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকেই শেষ প্রান্তের দোতলা বিল্ডিংটা দেখতে পেল ও। বিল্ডিংয়ের গায়ে বড় বড় রঙিন কাঁচের অক্ষর দিয়ে লেখা রয়েছে—ফ্রেণ্ডশীপ নাইট ক্লাব। রাতের বেলা অক্ষরগুলোয় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে ওঠে। নিওন সাইনের নিচেই কয়েকটা বিচিত্র ছবি। হার্ড বোর্ডের উপর চার পাঁচ রকম রঙ দিয়ে আঁকা হয়েছে ছবিগুলো। সিনেমা হলের সামনে, গেটের উপর যেমন খাড়া করে রাখা হয়, ঠিক তেমনি। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি জাঙ্গিয়া পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে, তার মাথার উপর একটা সাদা ইঁদুর। মেয়েটির সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে পিস্তল হাতে। গুলি করেছে সে। বুলেটটা ছুটে যাচ্ছে। এই ধরনের আরও অনেক ছবি।

রাস্তার উপরই গেট। বন্ধ নয়, আধখোলা। ভিতরে ঢুকে তেকোণা একটা বড় হলরুম দেখল ও। দু'জন লোক বসে দাবা খেলছে। পদশব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালও না। এক প্রান্তে বড় একটা মঞ্চ দেখা যাচ্ছে। পর্দা ঝুলছে মঞ্চে। শ'খানেক চেয়ার, সার সার দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর, সিলিংয়ে ঝুলছে দশ-বারোটা ইলেকট্রিক ফ্যান।

লোক দু'জন যেখানে বসে দাবা খেলছে, তার পাশেই একটা দরজা। দরজার মাথায় লেখা—ড্রিঙ্কস্। দরজাটার পাশ দিয়ে উঠে গেছে একটা সিঁড়ি।

নাইট ক্লাবগুলোয় ড্যান্স ফ্লোর থাকতে পারে, কিন্তু এই রকম উঁচু মঞ্চ আগে কোথাও দেখেনি শহীদ। ঢোকার মুখে পাশাপাশি কয়েকটা টিকেট কাউন্টার দেখেছে ও, তার মানে দর্শনীর বিনিময়ে এখানে শারীরিক কসরৎ, ম্যাজিক, টার্গেট প্র্যাকটিস, নাচ, ইত্যাদি দেখানো হয়ে থাকে।

লোক দু'জনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। কেউ মুখ তুলে তাকাচ্ছে না দেখে নিজেই কথা বলে উঠল, 'ম্যানেজার কোথায় বসেন বলতে পারেন?'

মুখ তুলল না কেউ। কিন্তু প্রায় একযোগে দু'জনেই বলে উঠল, 'দোতলায়, দোতলায়।'

কথা না বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল শহীদ।

উপরে প্রশস্ত করিডর। ডান দিকে একটা খোলা দরজা। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি মেয়েকে দেখতে পেল। আঁটসাঁট কামিজ পরে মেয়েটা চারটে রবারের রঙিন বল লোফালুফি করছে। তাগড়া চেহারার এক জোয়ান লোক মেঝেতে দুই হাত আর দুই হাঁটু রেখে মেয়েটির সামনে চতুষ্পদ জন্তুর মত স্থির হয়ে রয়েছে। মেয়েটি বলগুলো লোফালুফি করতে করতে লোকটার পিঠে প্রথম ডান পা, তারপর বাঁ পা তুলে দিয়ে দাঁড়াল। বল লোফালুফির খেলা চালিয়ে যাচ্ছে সে।

সরে গেল শহীদ। করিডরের শেষ মাথায় আর একটা দরজা। সেটা খোলা, পর্দা ঝুলছে। কালো প্লাস্টিকের উপর সাদা অক্ষরে লেখা নেমপ্লেট—মোহাম্মদ সাদী—ম্যানেজার। নেমপ্লেটের উপর একটা লাল বোতাম। সেটায় চাপ দিল শহীদ।

কর্কশ কণ্ঠে কেউ ভিতর থেকে বলে উঠল, 'ব্যস্ত! খুব ব্যস্ত! ভিতরে ঢুকবে না বলে দিচ্ছি—সাবধান!'

শহীদ পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল, 'সাদী সাহেব, আমিও খুব ব্যস্ত—আপনার সাথে আলোচনা করার জন্যে!'

মোহাম্মদ সাদী লোকটার চেহারা কৌতুকপ্রদ। ছোট্ট, এতটুকু কপাল কিন্তু মাথাটা প্রকাণ্ড। তোবড়ানো গাল। নাকের ডগায় নেমে এসেছে পাওয়ারওয়ালা কাচের চশমাটা, চশমার উপর দিয়ে পিচুটিভরা চোখে শহীদের দিকে পিট পিট করে চেয়ে আছে, দৃষ্টিতে বিস্ময়।

'জী?'

শহীদ বসল একটা চেয়ারে। দেখল টেবিলের উপর কাগজপত্রের স্তূপ, বুক অবধি দেখাই যায় না সাদী সাহেবের।

পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল শহীদ। সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে চোখের সামনে, একেবারে নাকের কাছে ধরল সাদী সাহেব। অনেকক্ষণ ধরে, অতি কষ্টে পড়ল শহীদের নাম। মুখ তুলে হাসল হঠাৎ, দাঁতহীন মাড়ি দেখা গেল সাদী সাহেবের, 'ওরে বাপস্—ডিটেকটিভ! তাও আবার ঢাকা শহর থেকে! তা, মিস্টার শহীদ, আমি তো লোক খারাপ নই, রক্ত দেখলেই মূর্ছা যাই, আমার সাথে কি দরকার আপনার বলুন তো?'

মজার লোক সাদী সাহেব, কথাগুলো বলেই কর্কশ স্বরে খল খল করে হেসে

উঠল।

শহীদও হাসল, 'না, আপনাকে বেঁধে নিয়ে যেতে আসিনি। এসেছি এক ভদ্রমহিলা সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে। আপনি তাকে চেনেন। ভদ্রমহিলার নাম সুলতানা, রাফিয়া সুলতানা।'

'ভদ্রমহিলা? সুলতানা ভদ্রমহিলা?' আকাশ থেকে পড়ল সাদী সাহেব। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, আবার, 'নাহ্! অতি বিনয়ী লোক আপনি, সাহেব, আপনার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। ওই হারামী ছুকরীটাকে আপনি ভদ্রমহিলা বলবেন? ছি ছি···।'

শহীদ বলল, 'আসলে কি জানেন, ওকে আমি ভাল চিনি না।'

সাদী সাহেব বিড়ি ধরাল, 'কে চেনে? বলি চেনেটা কে ওই ছুকরীকে? আজ তার এক চেহারা, কাল আরেক রকম···। তা, মিস্টার শহীদ, ছুকরী সম্পর্কে কি জানতে চান বলুন।'

'সে কি আপনার এই নাইট ক্লাবে কাজ করত?'

'করত বৈকি। ছুকরী···স্বীকার করতেই হবে, দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বুঝলেন ওর মত অমন পেটে ঢেউ খেলিয়ে আর কেউ নাচতে পারত না। শহরের ছোকরাগুলো তো তিনটে করে শো দেখত···।'

'কত দিন ছিল সে এখানে?'

সাদী সাহেব বলল, 'বছর দুয়েক। চলে গেছে গত বছর জুন মাসের পয়লা কি দোসরা, দুপুর বেলা।'

শহীদ জানতে চাইল, 'এখানে আসার আগে কোথায় কি করত সে?'

সাদী সাহেব মুখস্থ করা গদ্যের মত বলে যেতে লাগল, 'এই অফিসরূমেই ছুকরীকে নিয়ে এসেছিল ইন্টারভিউ দেয়ার জন্যে এখলাস সাহেব। এখলাস সাহেব···আহা, চুচু—বেচারা মরে গেছেন নিউমোনিয়ায় মাস ছয়েক আগে—তিনি এই ধরনের নাচিয়ে মেয়েদের খবরাখবর রাখতেন, মানে, এজেন্ট গোছের ছিলেন। ছুকরীকে জিজ্ঞেস করলাম নাচ জানো? উত্তর দিল না। বুঝলেন, শাড়ি খুলে ফেলে নাচতে শুরু করে দিল তক্ষুণি! কি কাণ্ড ভেবে দেখুন! তবে, হ্যাঁ, নাচটা খুব ভালই নাচল। পছন্দ করলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, নাম কি গো? বলল, রাফিয়া সালতানা, সুলতানা নয়, সালতানা। আসলে সুলতানা, কিন্তু ঢং করে উচ্চারণ করে ওই রকম—সা ল তা না। জানতে চাইলাম, কোত্থেতে আসা হলো? বলল, কোলকাতা থেকে। আর কি জানতে চান, মি. শহীদ? এই যাহ! খাতির করতে ভুলে গেছি আপনাকে—এই! কে আছিস—চা আন এক কাপ, সাথে···কই, সাড়া দিচ্ছে না কেন?'

শহীদ বলল, 'সাদী সাহেব, ব্যস্ত হবেন না। আমি চা খাই না। আচ্ছা···।'

হঠাৎ শহীদের দিকে আধ হাত এগিয়ে আনল সাদী সাহেব মাথাটা, 'বলি একটা কথা তো জিজ্ঞেস করতে বেমালুম ভুলে গেছি। ছুকরীর হয়েছেটা কি? স্বামীকে ছেড়ে আর কারও সাথে ভেগেছে বুঝি? দেখা হয়েছে তার সাথে আপনার?'

'দেখা হয়েছে,' বলল শহীদ। জানতে চাইল, 'আপনার মত একজন ভাল মানুষের কাছ থেকে চাকরি ছেড়ে চলে গেল কেন সে বলুন তো?'

'রঙিন স্বপ্ন দেখতে পেল—অমনি দে ছুট--বুঝলেন না! বিবাহ—এই জিনিসটাই আমাকে ডোবাল! একটা মেয়েকে গড়ে পিটে চৌকস করি, দু'পয়সা রোজগার করতে শেখে, লোকের প্রশংসা পায়—ব্যস! কাউকে না কাউকে ফাঁদে ফেলে ভেগে যায়, বিবাহ করে ফেলে! কি যে লোকসান হয় আমার···।'

'বিয়ের পর তার আর কোন খবর পাননি আপনি?'

সাদী সাহেব বলল, 'পাইনি মানে? বাদশা খান সুখী হয়নি, কিংবা ঘোড়ার ডিম কিছু একটা ঘটে থাকবে, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ওদের মধ্যে। লোক পাঠিয়েছিলাম আমি, ছুকরীকে পটিয়ে পাটিয়ে ফেরত আনবার জন্যে। কিন্তু আমার লোক গিয়ে পৌঁছুবার আগেই স্টারলিট নাইট ক্লাব ওকে গেঁথে ফেলে মোটা বেতনের লোভ দেখিয়ে। আমার লোক সেখানে তার সাথে গিয়ে দেখা করে, কিন্তু ছুকরী তাকে দেমাক দেখিয়ে ভাগিয়ে দেয়। তারপর অনেক দিন কোন খবর পাইনি। মাস চার পাঁচ হবে শুনেছি স্টারলিট থেকেও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সে। কোথায় এখন আছে—খোদা মালুম!'

সতর্ক হয়ে উঠেছে শহীদের কান। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল ও, 'বাদশা খান—কে সে?'

'ছুকরীর স্বামী।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

খল খল করে হাসল সাদী সাহেব, 'একশো ভাগ ঠিক জানি।'

'কবে বিয়ে হয় ওদের তা বোধহয় জানা নেই আপনার?'

সাদী সাহেব আবার হাসল, 'মি. শহীদ, এই মাথাটা হলো ছোট একটা কমপিউটার, বুঝলেন? একবার যা ঢোকে এই মাথায় তা আর বের হয় না। ওদের বিবাহের তারিখটাও আছে আমার কমপিউটারে। গত বছর বিয়ে হয় ওদের, মে মাসের আট তারিখে।'

'বাদশা খান এখন কোথায়? বেঁচে নেই বুঝি?'

সাদী সাহেব মুখ বিকৃত করল। 'বাদশা খান বেঁচে নেই মানে? মরবে নাকি ও? বলি, খারাপ মানুষ সহজে মরে? এক বন্ধুর সাথে ফটোগ্রাফির দোকান করেছে সে। জোয়ারদার ফটোগ্রাফারস দোকানের নাম।'

শহীদ বলল, 'সাদী সাহেব, আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন। কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে আমি কিছু প্রেজেন্ট করতে চাই। আপত্তি করতে পারবেন না, নিতে হবে।'

চেয়ে রইল সাদী সাহেব, 'কিছু প্রেজেন্ট করবেন? কেন, আপনার কে হই আমি?'

'কেউ হন না। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে, তাই।'

সাদী সাহেব চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল। তারপর চশমাটা খুলে পাঞ্জাবীর কোণা দিয়ে কাচ দুটো মুছল ভাল করে, আবার পরল চোখে, দেখতে লাগল শহীদকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বলল, 'দেখুন, ডিটেকটিভ হোন বা না হোন, সাফ সিধে কথা বলতে ভয় করি না আমি। বলি, ঘুষ দিতে চেষ্টা করছেন নাকি?'

হাসি পেলেও হাসল না শহীদ। গম্ভীর মুখে বলল, 'ছি, ছি, এত ছোট কথা কেউ

ভাবতে পারে? আমি আন্তরিক ভাবেই প্রস্তাবটা দিয়েছি, সাদী সাহেব···।'

খয়েরী রঙের মাড়ি বেরিয়ে পড়ল, ছেলেমানুষের মত হাসছে সাদী সাহেব, 'দেন তবে! জিনিসটা কি বলুন তো? খুব দামী জিনিস আবার দেবেন না, চোরের চোখে পড়ে যাবে—তখন আবার আপনাকেই খবর দিয়ে আনতে হবে ঢাকা থেকে···।'

নিজের রসিকতায় নিজেই অবিরাম হাসতে লাগল সাদী সাহেব। পকেট থেকে গ্যাস লাইটারটা বের করে বাড়িয়ে দিল শহীদ, 'মাত্র ক'দিন আগে কিনেছি, পুরানো বলে মনে কিছু নেবেন না···।'

'ওরে বাপস্! এযে অনেক দামী জিনিস···।'

'কই আর দামী···।'

'তবু?' ভুরু কপালে তুলে প্রশ্ন করল সাদী সাহেব।

'তিনশো।'

জিনিসটা নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে আনন্দে বলে উঠল, 'ওরে বাপস্! ওরে বাপস্! কি সুন্দর, তাই না?'

শহীদ হাসি চেপে বলল, 'সাদী সাহেব, আমি বাদশা খান সম্পর্কে জানতে চাই। সবটুকু। আপনি তার সম্পর্কে যা জানেন সব বলুন আমাকে।'

লাইটারটা জ্বেলে বিড়ি ধরাল সাদী সাহেব। বলল, 'বাদশা খান সম্পর্কে? তা—সব কথাই জানা আছে তার সম্পর্কে। বাদশা খান এখানেই কাজ করছিল সুলতানা যখন আসে। আমাদের এটা আসলে নামে মাত্র নাইট ক্লাব। ঠাণ্ডা পানীয় ছাড়া কিছু বেচি না। কারণ, মালিক সোবহান সাহেব হাজী, পরহেজগার মানুষ। ব্যবসা করি আমরা খেলা দেখিয়ে। মদ-টদ বেচা বন্ধ করার পর ব্যবসা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল, তখন বুদ্ধি খরচা করে এই পলিসি বের করি আমি। সব রকম খেলাই দেখানো হয়, সেই সাথে আছে নাচ। বাদশা খান রাইফেলের খেলা দেখাত।'

'কি রকম?'

'এই ধরুন, একটা দশ নয়া পয়সা উপরে ছুঁড়ে দিল, আয়নার দিকে তাকিয়ে গুলি করল পয়সাটার দিকে—কি যেন বলে, একসাইটিং, দারুণ একসাইটিং! ওস্তাদ লোক এই বাদশা খান। কোল্ট ·৪৫ রিভলভার দিয়ে আরও মারাত্মক ধরনের খেলা দেখাত সে। রিভলভারটা ছুঁড়ে দিত শূন্যে, লুফে নেবার সাথে সাথে গুলি করত। একটি মেয়ে ছিল তার সহকারিণী। সেই মেয়েটির ঠোঁটে সিগারেট থাকত, সেই সিগারেটের ডগায় লাগত পিস্তলের বুলেট, প্রতিবার এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ছোট হত সিগারেটটা। সব শেষে ফিলটারটার গায়ে লাগত বুলেট। মেয়েটির ঠোঁট থেকে ফিলটার নিয়ে ছুটে যেত বুলেটটা।'

চোখ বড় বড় করে তাকাল সাদী সাহেব, বলল, 'সে বড়ই ভয়ঙ্কর খেলা! না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। তবে, হ্যাঁ, বাদশা খানের সাহসের অভাব ছিল না। অবশ্য সাহসের অভাব ছিল না মেয়েটিরও···।'

'এই বাদশা খান তাহলে বিয়ে করেছিল রাফিয়া সুলতানাকে?'

'হ্যাঁ। বিয়ে করবার কিছু দিন পরই চাকরি ছেড়ে দেয় দু'জনে। জমানো টাকা দিয়ে পার্টনারশিপে ফটোগ্রাফির দোকান করে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল সে

ভালমানুষ হয়ে গেছে, ঘর-সংসার করবে এবার গাঁজা-মদ ছেড়ে। ভয়ানক চঞ্চল, অস্থির টাইপের লোক। এক জায়গায় বেশি দিন টিকতে পারে না। আর একটা অসুখ ছিল, সহজ উপায়ে টাকা রোজগার করার জন্যে প্রত্যেক দিন একটা করে উদ্ভট বুদ্ধি বের করত মগজ থেকে। তবে সে যাই হোক, এখন বোধহয় সে ভালই আছে। আগের সে বাদশা নেই আর। ভালই আয় ছবি তোলার ব্যবসাতে। নাটকের মেয়েরা ওকে চেনে, তারা সবাই ওদের দোকান থেকেই ছবি তোলে।

'রাফিয়া সুলতানাকে ছাড়ল কেন সে?'

'বাদশা ছাড়েনি, ওই ছুকরীই বাদশাকে ছেড়েছে, যত দূর শুনেছি। ঠিক জানি না এই একটা ব্যাপারে। বাদশা খান মেজাজী লোক, রগচটা। মার ধর করত কিনা কে জানে। তবে, তালাক দিয়েছে বলে শুনিনি। স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে ছুকরী।'

'আচ্ছা, সাদী সাহেব, বাদশা খানের কোন ছবি আছে আপনার কাছে? পেলে বড় উপকার হত।'

সাদী সাহেব চেয়ার ছেড়ে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে চাবি বের করে বলল, 'কি যে বলেন! মানুষের উপকার করতে পারাটাই তো সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার। দাঁড়ান, দেখি।'

চেয়ারের পিছনের আলমারিটা খুলে পেস্টবোর্ডের একটা বাক্স বের করল সাদী সাহেব। সেটা টেবিলে রেখে বসল আবার চেয়ারে। অসংখ্য ফটো রয়েছে বাক্সটায়।

দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠল সাদী সাহেব, 'পাব না মানে! এই স্বয়ং বাদশা খান।'

একটা ছবি বাড়িয়ে দিল সে শহীদের দিকে।

লম্বা, সরু মুখ বাদশা খানের। চোখ দুটো আশ্চর্য ধরনের ঢুলু ঢুলু কিন্তু অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সে চোখে। ড্রেন পাইপ প্যান্ট পরনে, গায়ে টি শার্ট। পেটা শরীর। ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা হবে। হাত দুটো পায়ের হাঁটু পর্যন্ত লম্বা।

এদিকে সাদী সাহেব মগ্ন হয়ে পড়েছে বাক্সের ছবিগুলো নিয়ে। শহীদের উপস্থিতির কথা ভুলে একটা করে ছবি তুলছে চোখের সামনে, দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। খানিক পর পরই তার মুখের চেহারা পরিবর্তিত হচ্ছে। কখনও মুচকি হাসি ফুটছে ঠোঁটে, কখনও বিড় বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করছে, কখনও মুগ্ধ হয়ে পড়ছে।

'এই নিন ছুকরীর ছবি···।'

শহীদের দিকে না তাকিয়ে আর একটা ছবি বাড়িয়ে দিল সাদী সাহেব। ছবিটা নিল শহীদ। রাফিয়া সুলতানারই ছবি। নাচছে সে। পরনে ব্লাউজ এবং ঘাগরা।

'এই নিন বাদশা খানের খেলার ছবি। দেখুন, কী ভয়ঙ্কর খেলা! মেয়েটির সাহসও দেখুন।'

শহীদের দিকে না তাকিয়েই ছবিটা বাড়িয়ে ধরল সাদী সাহেব। ছবিটা হাতে নিয়ে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল শহীদের কলজেটা।

এ কে? বাদশা খানের সাথে এ মেয়েটা কে?

ভাল করে দেখতে লাগল শহীদ। খেলা দেখাচ্ছিল বাদশা খান, সেই সময় ছবিটা তোলা হয়। পিস্তলটা শূন্যে দেখা যাচ্ছে, হ্যাট পরা বাদশা খান হাত তুলে রয়েছে সেটা ধরবার জন্যে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। তার ঠোঁটে একটা সিগারেট। হাসছে সে।

ফটোগ্রাফার লোকটা নিজের কাজ বোঝে ভাল। খুবই সুন্দর, পরিষ্কার ছবি তুলেছে সে। মেয়েটার চোখের পাপড়িগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

রীটা গোমেজ!

না, চিনতে ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েটা যে রীটা গোমেজ তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

দুই

মৃদু কণ্ঠে ডাকল শহীদ, 'সাদী সাহেব!'

সাদী সাহেব শুনতে পেল না। ছবি দেখছে সে তন্ময় হয়ে। দাঁতহীন মাড়ি দেখা যাচ্ছে, আপন মনে হাসছে সে।

'সাদী সাহেব!'

মুখ তুলল সাদী সাহেব। অপ্রতিভ দেখাল তাকে, 'কী কাণ্ড দেখুন দেখি! বুড়ো হচ্ছি তো, ভীমরতি পাকড়াও করছে—দেখুন, কেমন আলগোছে ভুলে গেছি আপনার কথা।'

'সাদী সাহেব, এই মেয়েটা, বাদশা খানের এই সহকারিণী—কে এ? নাম কি?'

'রীটা গোমেজ! খ্রিষ্টান। বিশেষ কিছু জানি না ওর কথা। চাকরি করত না। ওকে টাকা-পয়সা যা দিত বাদশা খানই দিত। আমাদের চুক্তি ছিল বাদশা খানের সাথে। সে কাকে কি দিত আমরা জানতাম না। তার সহকারী বা সহকারিণীদের সম্পর্কে আমি বিশেষ খবর নিতাম না।'

'কোথায় আছে সে এখন জানেন?'

'না।'

'বাদশা খান এখান থেকে চলে যাবার পর রীটা গোমেজ বুঝি তার সাথে চলে যায়?'

'না, বাদশা খানের আগেই সে বিদায় নেয়। তার একটা কারণও ছিল। বাদশা খান সুলতানা ছুকরীর সাথে পিরিত পিরিত খেলা খেলতে শুরু করলে খেপে যায় রীটা গোমেজ, ঝড়গা-ঝাঁটিও হয় ওদের দু'জনের মধ্যে, কিন্তু বাদশা খান সুলতানা ছুকরীর মোহ ত্যাগ করতে পারেনি—তাই চলে যায় মেয়েটা। মেয়েটা চলে যাবার পর বাদশা খানের রিভলভারের খেলাটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, অমন শক্ত নার্ভের মেয়ে আর পাওয়া গেলে তো! সত্যি, বুঝলেন, মি. শহীদ, এই একটা মেয়ে রীটা গোমেজ—ইস্পাতের চেয়েও মজবুত নার্ভ। তা না হলে অমন ভয়ঙ্কর রিস্কি খেলায় কেউ অংশ নেয়? বাদশা খান পরে চেষ্টা করেছিল সুলতানা ছুকরীর সাহায্য নিয়ে খেলাটা শুরু করতে, কিন্তু ছুকরীর নার্ভই ছিল না, কোনমতে রাজি হয়নি সে।'

'মাস ছয়েক হবে বোধহয় রীটা গোমেজ চলে গেছে?'

'তা হবে। মাস ছয়েকই হবে।'

'পরে আর কোন খবর পাননি তার?'

'চেষ্টা করলে হয়তো পেতাম। চেষ্টা করিনি। মেয়েটা বড্ড জেদী ছিল। আর কোন খেলাও জানত না।'

শহীদ বলল, 'আর মাত্র দু'চারটে প্রশ্ন করব, সাদী সাহেব। আচ্ছা, ইয়াকুব নামের কাউকে চেনেন?'

'ইয়াকুব? দাঁড়ান, কমপিউটরের চাবি টিপে দেখি···।'

সাদী সাহেব কানের উপরে, মাথার পাশে আঙুল ভাঁজ করে টোকা মারতে লাগল। খানিক পর বলল, 'দুঃখিত। না।'

'জোয়ারদার সম্পর্কে কিছু জানেন? জোয়ারদার ফটোগ্রাফারস-এর মালিকের কথা জানতে চাইছি আমি। লোকটা দেখতে কেমন?'

'মোষের মত কালো, ওই রকমই দেহ, চেঁচিয়ে কথা বলে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে দু'চার সেকেণ্ড পরপরই—বেঁটে।'

হেসে ফেলল শহীদ। বলল, 'লোক হিসেবে কেমন?'

'বাদশা খান তার সাথে ব্যবসায় যোগ দিয়েছে—বুঝতে পারছেন না? দু'জন দু'রকম দেখতে হলে হবে কি—একই চরিত্রের চিড়িয়া। চোর, বদমাশ, গুণ্ডা, ফন্দিবাজ—কি নয় ওরা? জানেন, ওদের সম্পর্কে খবর নিতে আমার কাছে পুলিস পর্যন্ত এসেছিল।'

'পুলিস এসেছিল? কবে? কেন?'

'মাস কয়েক আগে। আমরা তো ওদেরকে দিয়েই ছবি তোলাই—তাই এসেছিল। জানতে চাইল, জোয়ারদার ফটোগ্রাফারস-এর মালিকদের কেউ আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছে কিনা কখনও। আমি বললাম—না। চলে গেল। কিন্তু যাবার সময় বলে গেল, ব্ল্যাকমেইলিংয়ের অভিযোগ আছে ওদের বিরুদ্ধে—সাবধানে থাকবেন। তারপর থেকে আমরা ওদেরকে দিয়ে আর ছবি তোলাই না।'

'আসলে কি সত্যি ওরা···।'

চোখ বুজে সাদী সাহেব বলল, 'আমি আগেই শুনেছিলাম, বুঝলেন? পুলিসকে না বললে কি হবে। হ্যাঁ, ওরা ব্ল্যাকমেইল করে। কিভাবে জানেন? বলছি, শুনুন। ধরুন, ফটোগ্রাফির দোকানে ছেলে-মেয়ে, প্রেমিক-প্রেমিকারা তো ছবি তুলতে যাবেই। ওরা করে কি, ছবি তোলার পর মেয়েদের কাছে চিঠি পাঠায় তোলা ছবি তার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে—বুঝলেন?'

শহীদ মাথা নাড়ল। বলল, 'ওরা দু'জনেই তাহলে ওই রকম লোক?'

'দু'জনেই। তবে বাদশা খান এককাঠি বাড়া। টাকার জন্যে করতে পারে না এমন কাজ নেই। আর একটা কথা, লোকটা বড্ড নিষ্ঠুর টাইপের। মি. শহীদ, দয়া করে ওর সাথে লাগবেন না। গুলি করার হাত ওর খুব ভাল কিনা।'

বিদায় নেবার সময় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল শহীদ। ঢাকার ঠিকানা দিয়ে

বলল, 'দরকার হলে, কোন বিপদে পড়লে ফোন করবেন। আপনার সাহায্যে আমি আসবই।'

সাদী সাহেব বলল, 'ওরে বাপস্! আমার রোগ দেখছি আপনার মধ্যেও আছে। মানুষের উপকার করতে খুব মজা লাগে, না?'

হাসতে হাসতে বিদায় নিল শহীদ।

গিলতে শুরু করল কামাল কথাগুলো। কথা তো বললই না, নিঃশ্বাসও ফেলল না সে নিয়মিত। সবই ধীরে ধীরে বলল শহীদ। ওর বলা শেষ হতেও কামাল বোবা হয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এত সব ঘটনা—কিন্তু একটার সাথে একটা যোগ করলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে কি?'

'ঘটনাগুলো জটিল এক রহস্যময় কাহিনীর টুকরো অংশ মাত্র। জোড়া লাগাতে হবে। ব্যস্ত হবার কিছু নেই, ধীরে সুস্থেই জোড়া লাগাবার কাজটা সারব আমরা। টুকরো ঘটনা আরও আছে, সেগুলোও সংগ্রহ করতে হবে।'

'রীটা···!'

'জানি না। সে এই রহস্যে জড়িত কিনা বা কতখানি জড়িত বোঝা যাচ্ছে না।'

সিগারেট ধরিয়ে কামাল বলল, 'বাদশা খানের সাথে জোট পাকায়নি তো সে?'

'অসম্ভব নয়। বললাম তো, জানি না। ঢাকায় তার উপস্থিতি কাকতালীয় অর্থাৎ দৈব-দুর্ঘটনাও হতে পারে। বাদশা খানকে সে হয়তো চিরজীবনের জন্যে ভুলে গেছে। জানি না ঠিক, তবে জানব আমি। সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কি জানিস?'

'রাফিয়া সুলতানা বাদশা খানের স্ত্রী অর্থাৎ বিবাহিতা সে, তা সত্ত্বেও বিয়ে করেছে তোয়াব খানকে। বাদশা খানকে ত্যাগ না করেই···।'

'হ্যাঁ। রাফিয়া যদি গোপনে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে থাকে—আমি বলতে চাইছি, বাদশা খানকে গোপন করে বিয়ে করে থাকে, এবং বাদশা খান পরে যদি ব্যাপারটা জেনে ফেলে থাকে—ব্ল্যাকমেইলারকে খুঁজে বের করার দরকার নেই। বাদশা খানই রাফিয়াকে ব্ল্যাকমেইল করছিল, ধরে নেয়া যায় সেক্ষেত্রে। আর একটা ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাদশা খান ·৪৫ কোল্ট অটোমেটিক ব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত। হত্যাকাণ্ডগুলো তার কীর্তি হওয়া বিচিত্র নয়।'

কামাল চিন্তা করতে লাগল ব্যাপারটা।

একসময় প্রশ্ন করল, 'আমার মাথায় এত সব ব্যাপার খেলছে না, শহীদ, স্বীকার করছি। আমি একবারে একটা প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে চাই। জামানকে বাদশা খান খুন করেছে বলে মনে করিস কিনা তাই বল?'

'হয় বাদশা খান, নয়তো জোয়ারদার এবং বাদশা খান মিলিতভাবে।'

'হুঁ। আচ্ছা, ইয়াকুবের ব্যাপারটা কি? সন্দেহের আওতা থেকে বাইরে থাকছে সে?'

'জানি না, ঠিক বলতে পারছি না। ঋতুর সাথে তার রহস্যময় কোন সম্পর্ক

অবশ্যই আছে, আমার ধারণা। কিন্তু এই ম্যাসাকারে ওদের কার কি ভূমিকা তা এখনও বলার সময় আসেনি।'

কামাল অসন্তোষের সাথে বলে উঠল, 'দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ প্রশ্নেরই উত্তর জানিস না তুই।'

শহীদ দৃঢ় গলায় বলল, 'কিন্তু একটা কথা জানি আমি। জোয়ারদারের পেট থেকে কিভাবে কথা বের করতে হবে, খুব ভাল করে জানি। ওটাই এখন সবচেয়ে বড় কর্তব্য। সেই কর্তব্যই পালন করতে যাচ্ছি আমরা।'

'বাদশা খান? তার পেট থেকে···।'

শহীদ বলল, 'দূর বোকা। সে কি এখানে নাকি? সে তো ঢাকায়। অবশ্য এটাও আমার অনুমান। তবে এ অনুমান সত্যি হতে বাধ্য।'

সুটকেস থেকে রাইটিং প্যাড বের করল শহীদ। প্যাডের সাদা কাগজে লিখল বড় বড় অক্ষরে—

আজকের মত ব্যবসা বন্ধ।

'কি লিখলি? এ আবার তোর কি হেঁয়ালি? আজকের মত ব্যবসা বন্ধ—মানে?'

'আমাদের ব্যবসা নয়, বন্ধু, জোয়ারদার ফটোগ্রাফারস-এর। শোন, আমি ভিতরে গিয়ে যখন কথা বলব তুই তখন দরজার কবাটে এটা সেঁটে দিবি, তারপর ভিতর থেকে বন্ধ করে দিবি···।'

'তারমানে—অ্যাকশন?'

মাথা নাড়ল শহীদ, 'অ্যাকশন। অফকোর্স!'

তিন

দুই কবাটের বড় দরজা। রাস্তা পেরোবার সময়ই ভিতরটা দেখে নিল ওরা। কাউন্টারে বসে আছে ম্রিয়মান এক যুবক। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গাল ভর্তি, চোখ দুটো বুজে আসছে ঘুমে। তার পিছনেই একটা দরজা পর্দা দিয়ে আড়াল করা। দু'পাশে কাচের দেয়াল আলমারি, ভিতরে বিভিন্ন আকারের ফটো পিন দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। আলমারির মাথার উপর কাঠের সেলফ, লম্বা লম্বা। সেগুলো সাজানো রয়েছে ফিল্মের বাক্স, বাক্স ছাড়া ফিল্মের রিল, কেমিক্যালসের কৌটা, ইত্যাদি দিয়ে।

প্রথমে শহীদ ঢুকল। পিছন পিছন কামাল দরজার কাছ পর্যন্ত গেল।

'কি চাই?'

সিধে হয়ে বসল বিষণ্ণ যুবক। গাল চুলকাচ্ছে সে, খস খস করে শব্দ হচ্ছে। বহুদিন বোধহয় স্নান করে না, দুর্গন্ধে ভরা শরীর। খেতেও পায় না ঠিক মত, এখানে মরতে এসেছে কাজ নিয়ে।

'ছবি তুলব।'

যুবক দেখল কামাল দরজার একটা কবাট বন্ধ করে দিয়ে সেটার আড়ালে চলে গেল।

'উনি কে···দরজা বন্ধ করলেন কেন?'

শহীদ হাসছিল, যুবক ওর দিকে তাকাতেই বলল, 'অন্ধ নাকি হে তুমি? আমার হাতে এটা কি দেখতে পাচ্ছ না?'

তাকাল যুবক শহীদের হাতের দিকে।

যা আশঙ্কা করেছিল শহীদ, তাই ঘটল। অনভিজ্ঞ যুবকটি চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল শহীদের হাতের রিভলভারটা দেখে।

ঘুসি মারল শহীদ যুবকের কপালের পাশে। এছাড়া উপায় ছিল না চিৎকারটা থামাবার। চেয়ারের উপর বসে পড়ল যুবক, এবং জ্ঞান হারাল। অজ্ঞান দেহটা এক হাত দিয়ে ধরে চেয়ারে বসিয়ে রাখল শহীদ।

দরজার দুটো কবাটই বন্ধ করে দিয়ে ভিতর থেকে হুড়কো লাগিয়ে উপরের ব্যাঙ নামিয়ে দিল কামাল। শহীদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'মজার কাজগুলো তুই সব একা করবি, আমাকে করতে দিবি না নাকি?'

চাপা কণ্ঠে ধমকে উঠল শহীদ, 'আহ! কাউন্টারের ওপাশে যা, বেঁধে ফেল ওকে। মুখে তুলো গুঁজতে ভুলিসনে!'

পকেট থেকে নাইলনের কর্ড এবং তুলো বের করল কামাল, ফিস ফিস করে বলল, গম্ভীর শোনাল তার গলা, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমাদের মধ্যে আর কেউ আমরা খুন হচ্ছি না। যা করার করেছে, এবার আমাদের পালা।'

কাউন্টারের ওপাশে গিয়ে কামাল অজ্ঞান যুবকের দায়িত্ব নিল। শহীদ উদ্যত রিভলভার হাতে নিয়ে কাউন্টারের ওপাশে পর্দা সরিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছোট একটা কামরা, পা দিয়েই শহীদ মদের গন্ধ পেল। পুরানো সোফা, কয়েকটা চেয়ার, দুটো আলমারি ছাড়া আর কিছু নেই। ক্যামেরা নেই দেখে শহীদের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে এটা স্টুডিও নয়। আর একটা দরজা দেখা যাচ্ছে মুখোমুখি। সেটাতেও পর্দা ঝুলছে।

পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল ও। সামনে না, দরজাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা ইঞ্চিখানেক সরিয়ে একটা চোখ দিয়ে তাকাল ভিতরে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তিন পা ওয়ালা ক্যামেরাটার দশ-বারো হাত সামনে কালো কাপড়ের স্ক্রিন। ক্যামেরার দুই পাশে দুটো বড় বড় ফ্লাডলাইট।

পর্দাটা আরও একটু ফাঁক করতে স্টুডিওর প্রায় সবটুকু দৃষ্টিগোচর হলো। পিছন ফিরে চেয়ারে বসে রয়েছে একটা লোক।

প্রশংসা করল শহীদ মনে মনে সাদী সাহেবের। নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে সে। মোষের মত কালো, ষাঁড়ের মত দেহ—এবং বেঁটেও বটে। লোকটার একপাশে একটা পাতলা লোহার পাতের চেয়ার। সামনে টেবিল। হাতে গ্লাস তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে কি যেন গলায় ঢালল সে। লোকটা যে জোয়ারদার তাতে সন্দেহ নেই।

অবশ্যই মদ। গন্ধ আগেই পেয়েছে শহীদ। শুধু যে মদই পান করছে তা নয়। মাথা নিচু করে কোন কাজ করছে সে, কি করছে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কাঁধে টোকা পড়ল শহীদের। পা বাড়াল শহীদ পিছন দিকে না তাকিয়েই। রিভলভারটা পিছনে লুকিয়ে ফেলল ও।

আশা করেনি শহীদ, কিন্তু নিস্তব্ধতা ভাঙল পিছন থেকে কামাল।

'রিভলভারটা লুকোচ্ছিস কেন? ওটা দেখা ওকে।'

স্প্রিঙের মত উপর দিকে লাফ দিল জোয়ারদার। হাতটা পৌঁছে গেছে টেবিলের দেরাজের হাতলে। টান দিয়ে সে দেরাজটা খুলতেই শহীদকে ছাড়িয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে তীরবেগে ছুটে গেল কামাল।

লোকটার পেটে গুঁতো মারল কামাল। জোয়ারদারের হাতটা আটকে গেল দেরাজের ভিতর, সেটা নিয়ে পড়ল সে দেয়ালের গায়ে, সেখান থেকে মেঝেতে। হেলে পড়া ভারি বস্তাকে যেমন টেনে হিঁচড়ে খাড়া করার চেষ্টা করা হয়, তেমনি গায়ের জোরে লোকটাকে দাঁড় করাল কামাল। দু'তিন সেকেণ্ড সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল সে, তারপর ঘুসিটা মারল ঠিক নাকের ব্রীজের উপর।

ছিটকে পড়ে গেল বেঁটে ষাঁড়টা, ক্যামেরাটাকে সাথে নিয়ে। কামাল বিনাবাক্যব্যয়ে লোকটার বুকের উপর গিয়ে বসে পড়ল।

'দেখিস, দম আটকে মরে না যায়।'

কামাল বলে উঠল, 'পাগল হয়েছিস? চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে ধোলাই দিলেও এর কিছু হবে না। অ্যাই শয়তানের নফর, নাম কি তোর?'

নাকটা থেঁতলে গেছে, ফুটো দিয়ে দুটো রক্তের মন্থর ধারা গড়িয়ে আসছে। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে কামাল ও শহীদ দু'জনেই আশ্চর্য না হয়ে পারল না। ভয় পায়নি, ভয়ের কোন ছাপই নেই চেহারায়। ওদের চোখের দিকে লোকটা একবারের বেশি বোধহয় দু'বার তাকায়নি, তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে শহীদের হাতের দিকে, হাতে ধরা রিভলভারটার দিকে। দুর্জয় মনোবলের অধিকারী এই লোক। কোন কিছুতেই ঘাবড়ায় না।

দেরাজটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। ছোট আকারের একটা পিস্তল তুলে নিয়ে নিঃশব্দে পকেটে ভরল ও।

কামালকে ইঙ্গিত করতে কামাল উঠে দাঁড়াল। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ, 'উঠে বসো, বাছা!'

আশ্চর্য, ঝট্ করে উঠে বসল লোকটা।

'সাবধান, শহীদ! শুয়োরটা···।'

জুতো দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে লাথি মারল শহীদ লোকটার পেটে। গড়িয়ে গেল দেহটা, কালো কাপড়ের সাথে জড়িয়ে পড়ল। দু'পা এগিয়ে কাপড়টা ধরে টান মারল কামাল। ঝুপ্ করে সিলিং থেকে কাপড়টা পড়ল লোকটার উপর, ঢাকা পড়ে গেল সে।

কালো পর্দাটা পড়ে যেতে কামাল দেখল একটা কেরোসিন স্টোভ রয়েছে। দেয়াল ঘেঁষে। একগাল হেসে বলে উঠল, 'পেয়েছি!'

কাপড়ে ঢাকা লোকটার কুণ্ডলী পাকানো শরীরে গোটা চারেক শক্ত লাথি মেরে থামল শহীদ। ঘাড় ফিরিয়ে কামালকে স্টোভ জ্বালাতে দেখে বলল, 'ও কি করছিস?'

'শয়তানের নফরকে ছ্যাক্ দেব।'

স্টোভটা জ্বেলে উঠে দাঁড়াল কামাল, লোহার চেয়ারটা টেনে নিয়ে এল, দাঁড় করিয়ে দিল সেটাকে স্টোভের উপর। স্টোভের অগ্নিশিখা লক লক করছে। গরম হতে লাগল চেয়ারটা।

'ক্যামেরাটা আস্ত রেখে লাভ আছে কিছু?' জানতে চাইল কামাল।

শহীদ বলল, 'যাবার আগে ওর হাত পা, ঘাড় মটকে দিয়ে যাব—ক্যামেরা ব্যবহার করার ক্ষমতা ওর আর থাকবে না।'

তিনপেয়ে ক্যামেরাটা তুলে আছাড় মারতে লাগল কামাল। টুকরো টুকরো, শতটুকরো না হওয়া পর্যন্ত থামল না সে।

কালো কাপড়টা সরিয়ে মুক্ত করল শহীদ লোকটাকে। পরিবর্তন নেই, সেই একই নির্বিকার চেহারা, ভয়হীন। খেপে গেল শহীদ। লোকটার ডান হাত ধরে ফেলল ও, একটা পা রাখল পাঁজরে, তারপর হাতটা মোচড় দিতে দিতে সর্বশক্তি দিয়ে টানতে লাগল।

ছিঁড়ে যাবে হাতটা, মনে হলো। কামালের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। লোকটার মুখে ভাঁজ পড়ল এইবার। অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল সে।

'জামানকে খুন করেছ কেন?' জানতে চাইল শহীদ।

চেঁচাচ্ছে লোকটা, শহীদের প্রশ্ন শুনে আরও জোরে চেঁচাতে শুরু করল। ছেড়ে দিল শহীদ, তারপর লাথি মেরে উপুড় করে দিল দেহটাকে।

চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে। আবার প্রশ্নটা করল শহীদ।

'আমি···কি বলছেন বুঝতে পারছি না।'

শহীদ মাথা নাড়তে নাড়তে তাকাল কামালের দিকে, 'চেয়ার তোর গরম হয়েছে?'

চেয়ারের বসার জায়গায় হাত ঠেকিয়েই সরিয়ে নিল কামাল, 'বড্ড!'

'ধর, বসিয়ে দিই।'

আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল কামাল। 'শয়তানের নফর, সিংহাসনে উঠে বসো।'

ধরাধরি করে তুলল ওরা লোকটাকে। হাত পা ছুঁড়তে শুরু করল সে। কানের নিচে ঘুসি মারল শহীদ, নেতিয়ে পড়ল লোকটা সাথে সাথে। কিন্তু জ্ঞান ঠিকই আছে।

চেয়ারে বসিয়ে দিতেই বিকট স্বরে আর্ত-চিৎকার শুরু করল সে। দু'জনের সম্মিলিত চেষ্টাতেও সামলাতে পারছে না ওরা লোকটাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সর্বশক্তি দিয়ে চেয়ারটা খাড়া রেখেছে কামাল, শহীদ লোকটাকে ঠেসে ধরেছে চেয়ারের সাথে।

কানের পর্দা ফেটে যাবে মনে হলো লোকটার চিৎকারে।

'কথা বলবি এবার?'

মাথা নাড়তে লাগল লোকটা। নাক কুঞ্চিত করল কামাল। কাপড়-পোড়ার দুর্গন্ধে শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। চামড়া পোড়ার গন্ধটা নাকে ঢুকতে বমি পেয়ে গেল তার।

ইশারা করল সে। ছেড়ে দিল শহীদ লোকটাকে। পিছিয়ে এল দু'পা। কামাল চেয়ারের পায়ায় লাথি মারতে চেয়ারসহ পড়ে গেল লোকটা মেঝেতে।

'কেন খুন করেছিস জামানকে?'

গোঙাতে লাগল লোকটা। চিবুকে পা ঠেকিয়ে খোঁচা মারল কামাল, 'আবার

বসবি নাকি সিংহাসনে, শয়তানের নফর?'

মাথা দুলিয়ে লোকটা বলল, 'না! না…!'

শহীদ বলল, 'তোর নাম জোয়ারদার?'

'হ্যাঁ।'

'জামানকে খুন করেছিস কেন?'

'কে জামান…আমি জানি না।'

লোকটার মুখের সামনে বসল শহীদ। মাথাটা নিচু করে বলল, 'আবার বল, শুনতে পাচ্ছি না তোর কথা।'

সেই অস্ফুটেই বলে উঠল লোকটা, 'আমি চিনি না…।'

শহীদ কামালের দিকে তাকাল, 'আবার চেয়ারের নিচে স্টোভটা দে। চেয়ারে বসিয়েই কথা বলাতে হবে।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল লোকটা।

'কি বলছিস?'

মাথা নিচু করে কান পাতল শহীদ।

জোয়ারদার বলল, 'আমি না…আমি খুন করিনি…।'

শহীদ বলল, 'কামাল।'

জোয়ারদারের শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। বলল, 'বাদশা…আমি না…।'

'বাদশা খান? সে খুন করেছে জামানকে?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।' পরিষ্কার কণ্ঠে বলল জোয়ারদার।

'শাবাশ! এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত আচরণ।'

নিচু কিন্তু পরিষ্কার গলায় জোয়ারদার বলতে শুরু করল। তবে কামাল নিজের কাজ গুছিয়ে রাখল, দরকারের সময় যাতে সময় নষ্ট করতে না হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব কথা আদায় হলো। এর মধ্যে দু'বার মাত্র আধ মিনিটের জন্যে উত্তপ্ত চেয়ারে বসাতে হলো জোয়ারদারকে। তার কথা থেকে বোঝা গেল, জামান সরাসরি এই দোকানে ঢোকে কোন রকম বিপদের আশঙ্কা না করেই। সন্ধ্যার খানিক পর জামান ঢুকেছিল। জোয়ারদারকে রাফিয়া সুলতানার ছবি দেখিয়ে জামান জানতে চেয়েছিল তার সম্পর্কে সে কিছু জানে কিনা।

'বাদশা স্টুডিওর ভিতর ছিল। ওখান থেকেই সে জামানের কথা শুনতে পায়। রাফিয়া সুলতানার নামটা শুনেই সে বেরিয়ে যায় কাউন্টারের কাছে। জামানকে সে বলে, রাফিয়া সম্পর্কে সে সব কথা জানে। ভিতরে এলে ধীরে সুস্থে সব কথা বলা যেতে পারে। কোন রকম সন্দেহ করেনি জামান। বাদশার সাথে সে স্টুডিওতে ঢোকে। তারপর বাদশা রিভলভার বের করে। জানতে চায়, কোত্থেকে এসেছে জামান। জামান ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশনের নাম বলে। বাদশাকে রাফিয়া সুলতানা ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশনের নাম বলেছিল। সুতরাং বাদশা ব্যাপারটা কি বুঝতে পারে। গুলি করে সে জামানকে। লাশটা দোকানের সামনেই দাঁড়ানো গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। আমি এইটুকুই জানি।'

কামাল আবার বসাল জোয়ারদারকে চেয়ারে।

'বাদশা খান কোথায় এখন?'

মিনিট খানেক বিকট স্বরে গগন ফাটাল জোয়ারদার। চেয়ার থেকে ধরাধরি করে নামাল ওরা তাকে। মাথাটা খাড়া রাখতে পারছে না সে আর। ঢলে পড়ছে কাঁধের উপর বারবার। শোনা যায় কি যায় না, অস্ফুটে বলল, 'সে রাফিয়ার সাথে দেখা করতে গেছে।'

'কখন?'

'কাল রাতে। দশটার প্লেনে।'

'বাদশা খানের স্ত্রী রাফিয়া, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'জানিস তুই, রাফিয়া মোহাম্মদ তোয়াব খান নামে এক ধনী ভদ্রলোককে বিয়ে করেছে আবার?'

চোখ বুজে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে জোয়ারদার, 'জানি···। পরামর্শটা দিয়েছিল বাদশাই। তার ধারণা ছিল রাফিয়া তোয়াব খানের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা খসাতে পারবে।'

'রাজি হলো কেন রাফিয়া? সে কি বাদশা খানকে ভয় করত?'

জোয়ারদার মাথা দোলাল, 'না।'

'তবে? ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হত না?'

'হত···। কিন্তু তাতে কি, ওরা দু'জন দু'জনকে ছাড়া থাকতে পারত না। মারামারি করত দু'জনেই, কিছু দিন একজন আর একজনকে ছেড়ে দূরে দূরে থাকত, কিন্তু আবার একসাথে হত। এই রকম দূরে দূরে থাকার সময় রাফিয়া তোয়াব খানের সাথে পরিচিত হয়। সে বাদশা খানের কাছে আসে, জানতে চায় কি করা উচিত। বাদশা তাকে বুদ্ধি দেয়। তোয়াব খানকে বিয়ে করে ফেলতে বলে। বিয়ে করে দুই হাতে টাকা আদায় করার পরামর্শ দেয়। দু'জনে মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিকল্পনা করে ওরা, কিভাবে কি করা হবে তাই নিয়ে।'

প্রশ্ন করল শহীদ, 'রীটা গোমেজ সম্পর্কে কি জানিস তুই?'

মাথা দোলাল জোয়ারদার। বলল, 'বাদশার সাথে কাজ করত। বাদশা তখন রাফিয়াকে বিয়ে করেনি। মেয়েটাকে দেখিনি কখনও—জানিও না বিশেষ কিছু।'

'গতরাতে গেছে বাদশা খান ঢাকায়। এর আগে কবে গিয়েছিল?'

'দু'রাত আগে। রাফিয়া ঢাকা থেকে ফোন করায় খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল সে। রাফিয়া ফোনে বলে, তাকে কেউ অনুসরণ করছে। বাদশা গিয়েছিল ঢাকায় রাফিয়ার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে, কিন্তু রাফিয়ার সাথে দেখা হয়নি তার।'

'দেখা না হওয়ায় ফিরে আসে সে?'

'হ্যাঁ। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল সে। মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। আমাকে বলল, যে মেয়েটা রাফিয়াকে অনুসরণ করছিল সে খুন হয়েছে। তার ভয় হচ্ছিল তাদের ষড়যন্ত্রটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। নিজেকে মুক্ত রাখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। রাফিয়ার সাথে দেখা করতে পারেনি বলে বেশি দুশ্চিন্তা করছিল সে।'

'ফোনে সে রাফিয়াকে জানায়নি কখন সে পৌঁছুবে ঢাকায়?'

'না। রাফিয়াকে সে প্রথমে বলে কাজ আছে, ঢাকায় এখন যেতে পারবে না সে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর সে মত বদলায়। ঠিক করে ঢাকায় গিয়ে ব্যাপারটা কি

জেনে আসবে সে।'

'আবার সে গেছে, কেমন? কবে ফিরবে?'

'তা বলে যায়নি আমাকে।'

একমুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল শহীদ, 'রাফিয়া পরশু রাতে খুন হয়েছে।'

নড়ে উঠল জোয়ারদারের ঠোঁট দুটো। কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না। দেহটা লম্বা করে পড়ে আছে সে। মুখটা রক্তাক্ত, মাঝে মাঝে ঘষছে মেঝের উপর।

'বাদশা খানের রিভলভারটা কিরকম?'

'বড় সাইজের। নাম জানি না। রিভলভার-পিস্তল সম্পর্কে কিছু জানি না আমি।'

'দেরাজে যেটা ছিল—কার!'

'বাদশারই। রেখে গেছে। বড়টা নিয়ে গেছে সাথে করে।'

উঠে দাঁড়াল শহীদ।

'কাজ শেষ?' জানতে চাইল কামাল।

শহীদ মাথা নাড়ল।

'আমার কাজ শেষ হয়নি।' কথাটা বলেই কামাল জ্বলন্ত স্টোভটা টেনে নিল কাছে। খপ করে ধরল সে জোয়ারদারের একটা হাত। দুই হাত দিয়ে টেনে আনল হাতটা। স্টোভের অগ্নিশিখার উপর নামিয়ে দিল গায়ের জোরে।

'শয়তানের নফর!'

দাঁতে দাঁত চেপে বলল কামাল।

চার

ছয়টায় চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে উড়ল প্লেন।

সন্ধ্যার সময় ঢাকায় ফিরে এল শহীদ। সরাসরি বাড়িতে পৌঁছুল ও। মহুয়া দরজা খুলে দিয়ে ওকে দেখেই স্থির হয়ে গেল। পরক্ষণে অদ্ভুত হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'মাথাটা কেমন আছে তোমার?'

'ভাল নেই, নতুন নতুন দুশ্চিন্তায় ভরাট হয়ে গেছে।'

ভিতরে ঢুকে সোফায় বসল শহীদ।

'কামাল কোথায়?'

'চট্টগ্রামে। মহুয়া, এক কাপ কফি খাওয়াতে পারো?'

ক্লান্ত শোনাল শহীদের কণ্ঠস্বর।

নিঃশব্দে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল মহুয়া স্বামীর দিকে।

তারপর ত্রস্ত পদে বেরিয়ে গেল ড্রয়িংরুম থেকে।

পাঁচ মিনিট পর ট্রে হাতে নিয়ে লেবু ঢুকল, পিছনে মহুয়া। লেবু ট্রে নামিয়ে রেখে চলে যেতে মহুয়া বলল, 'শুধু কফি খেয়ো না, কিছু মুখে দিয়ে নাও।'

কেক-এ কামড় দিয়ে শহীদ বলল, 'জামানের খুনীকে অন্তত চিনতে পেরেছি, মহুয়া। লোকটার নাম বাদশা খান। হয় সে এই ঢাকাতেই আছে, নয়তো ফিরে

গেছে চট্টগ্রামে। খবর নেবার জন্যে রেখে এসেছি ওখানে কামালকে।'

'নতুন নাম—কে লোকটা?'

'রাফিয়ার স্বামী সে।'

মহুয়া ভুরু কোঁচকাল, 'কি বলছ?'

'ঠিকই বলছি। মেয়েটা তোয়াব খানকে বিয়ে করে এই বাদশা খানের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও। লোকটাকে পাইনি এখনও, তবে পাব। মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর লোক—তার সাথে লাগতে হলে বিপদের আশঙ্কা ষোলো আনা মনে রাখতে হবে সর্বক্ষণ। সবরকম আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক।'

মহুয়া কি যেন বলতে গেল, শহীদ বাধা দিয়ে বলল, 'শোনো, রাইটিং প্যাড আর কলম নিয়ে এসো টেবিল থেকে। আমি বলি, তুমি লিখতে থাকো।'

নিঃশব্দে উঠে গেল মহুয়া। কাগজ কলম নিয়ে ফিরে এসে বসল আবার শহীদের মুখোমুখি।

'যখনই তোমার মনে হবে আমি বিপদে পড়েছি, অমনি কুয়াশা এবং মি. সিম্পসনকে ডেকে তোমার লেখা নোটগুলো দেখাবে। দেখলেই ওরা মোটামুটি সব বুঝতে পারবে। তবে, সাবধান, মারাত্মক কিছু না ঘটলে, অন্তত মি. সিম্পসনকে এটা কোনমতেই দেখাবে না।'

'মারাত্মক কি ঘটবে বলে আশঙ্কা করছ?'

মহুয়া একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে জানতে চাইল।

আশঙ্কা করছি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে, মনে মনে বলল শহীদ। কিন্তু মুখে বলল, 'আশঙ্কা করছি আমি বন্দী হব।'

'বন্দী হবে? কি বলছ বুঝতে পারছি না—কে এই ঢাকা শহরে তোমাকে বন্দী করতে যাচ্ছে?'

শহীদ হাসল, 'করতে যাচ্ছে তা তো বলিনি, বলছি, করতে পারে। সে যাই হোক, হাতে সময় এমনিতেই কম, তুমি লিখতে থাকো। আতঙ্কিত হয়ো না, বুঝলে? নোট দিচ্ছি শুধু সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে, তাছাড়া আর কোন কারণ নেই। আসলে ঘটবে না কিছুই।'

বিশ্বাস করল না মহুয়া, তার চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল।

'স্থানটা চট্টগ্রাম...'

পাইপে আগুন ধরিয়ে শুরু করল শহীদ। একমুহূর্ত চিন্তা করে নিল। তারপর আবার শুরু করল, 'সময়টা—আজ থেকে দু'বছর আগে। জুনের প্রথম ভাগ।'

মহুয়াকে লেখার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে ধীরে ধীরে বলে চলল শহীদ, 'একজন নর্তকী, যে নিজের নাম বলে রাফিয়া সালতানা, কোলকাতা থেকে উপস্থিত হয়। চট্টগ্রামে সে নৃত্যশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এক এজেন্টের মাধ্যমে পরিচিত হয় ফ্রেণ্ডশীপ নাইটক্লাবের ম্যানেজার সাদী সাহেবের সাথে। সাদী সাহেব তার নাচ পছন্দ করে এবং তাকে চাকরি দেয়। নাচে সে বেশ নাম করে। রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল শহরে তার বেলি ড্যান্স।'

পাইপ কামড়ে ধরে চিন্তা করতে লাগল শহীদ। খানিক পর বলতে শুরু করল, 'ফ্রেণ্ডশীপ নাইটক্লাবটা ঠিক নাইটক্লাব নয়। মদ বিক্রি হয় না। নাচ ছাড়া সেখানে

দেখানো হয় শারীরিক কসরৎ, কিছু কিছু ম্যাজিক, রাইফেলের খেলা, রিভলভারের খেলা, এই সব। রাফিয়ার নাচের পর যেটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে সেটা একটা খেলা—রিভলভারের খেলা। এই খেলাটা দেখাত বাদশা খান নামে এক লোক। বাদশা খানের সহকারিণী ছিল একটি যুবতী। এই যুবতীর নাম—রীটা গোমেজ।'

লেখা থামিয়ে চট্ করে মুখ তুলল মহুয়া, 'বলো কি!'

'হ্যাঁ। আমাদের রীটা। বাধা দিয়ো না, মহুয়া, লেখো। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ডিনামাইটের মত বিস্ফোরক হয়ে উঠেছে। আরও একটা চমক পাবে তুমি একটু পর।'

লিখতে শুরু করল মহুয়া।

একটু পর আবার বলতে শুরু করল শহীদ, 'বাদশা খান এবং রাফিয়া সুলতানা পরস্পরের প্রেমে পড়ে। বাদশা খান সিদ্ধান্ত নেয় রিভলভারের খেলা না দেখিয়ে সে তার বন্ধু জোয়ারদারের ফটোগ্রাফারের দোকানে টাকা খাটাবে। জোয়ারদার ফটোগ্রাফারস্-এর মালিক জোয়ারদার তার প্রস্তাবে রাজি হয়। জমানো কিছু টাকা দিয়ে বাদশা খান স্টুডিওর অর্ধেক মালিক হয়। ওরা মিলিতভাবে ব্যবসাটা চালাতে শুরু করে। সাধারণত নাটকে অভিনয় করে, নাচে, গায়—এই ধরনের মেয়েদের ছবি তুলত ওরা। কলেজ ভার্সিটির ছেলেমেয়েদেরও ছবি তুলত একচেটিয়াভাবে। এইসব মেয়েদেরকে ওরা ব্ল্যাকমেইল করে ভাল টাকা রোজগার করত। পুলিস ব্যাপারটা সন্দেহ করে, কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।'

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে পাইপটা নতুন করে ধরাল শহীদ।

'বাদশা খান রাফিয়াকে বিয়ে করে গত বছর নভেম্বরের আট তারিখে। রীটা গোমেজ ফ্রেণ্ডশীপ নাইট ক্লাব এবং বাদশা খানের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়। মাসখানেক পর বাদশা খানের সাথে ঝগড়া হয় রাফিয়ার। প্রায়ই ঝগড়া হত তাদের। কিন্তু এই ঝগড়াটা হয় বাড়াবাড়ি ধরনের—রাফিয়া বাদশা খানকে ছেড়ে চলে যায়। সে নতুন একটা চাকরি নেয় স্টারলিট নাইটক্লাবে। ওখানেই সে পরিচিত হয় মোহাম্মদ তোয়াব খানের সাথে।'

মহুয়া খসখস করে দ্রুত লিখে যাচ্ছে।

'বছর খানেক আগে মোহাম্মদ তোয়াব খান তাঁর স্ত্রীকে এক মোটর অ্যাক্সিডেন্টে হারান। অসুস্থ, পঙ্গু একটি যুবতী মেয়ে আছে তাঁর। রাফিয়া ফাঁদ পাতে—এবং সফল হয়। তোয়াব খান তার ফাঁদে পা দেন—এবং বিয়ের প্রস্তাব দেন।'

চোখ বুজে ভাবছে শহীদ।

'বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে রাফিয়া তার স্বামী বাদশা খানের সাথে দেখা করে, প্রস্তাবের কথা তাকে জানায়। একজন কোটিপতির ঘাড়ে নিজের স্ত্রীকে তুলে দিতে পারলে প্রচুর টাকার মুখ দেখতে পাবে—এই ভেবে বাদশা খান পরামর্শ দেয় স্ত্রীকে তোয়াব খানকে বিয়ে করার। স্ত্রীর সাথে তার একটা মৌখিক চুক্তি হয়। তোয়াব খানের কাছ থেকে রাফিয়া যা আদায় করতে পারবে তার একটা অংশ, সম্ভবত অর্ধেক, দিতে হবে বাদশা খানকে। এই শর্তে একমত হয় ওরা। এরপর তোয়াব

খানকে বিয়ে করে রাফিয়া। তোয়াব খান বিয়ে করেন অনেকটা চুপিচুপি, বিশেষ কাউকে না জানিয়ে। ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন না তিনি। বিয়ে করে রাফিয়াকে তোলেন নিজের বাড়িতে, ঢাকার মুক্তা নিকেতনে। আমি রাফিয়া সম্পর্কে সন্ধান নিয়ে দেখেছি, ক্লেপটোম্যানিয়া রোগ তার নেই। তোয়াব খানের সন্দেহটা মিথ্যে। চট্টগ্রাম ত্যাগ করার আগে বহুলোকের সাথে কথা বলি, যারা রাফিয়াকে চিনত। তারা কেউ স্বীকার করেনি রাফিয়ার ওইরকম বদভ্যাস ছিল বলে। আমি এখন বিশ্বাস করি যে রাফিয়ার বেডরূমে নানারকম ছোটখাট জিনিসভর্তি যে সুটকেসটা পাওয়া গেছে সেটা কেউ ষড়যন্ত্র করে ওখানে রেখে আসে। উদ্দেশ্য, তোয়াব খানের সাথে রাফিয়ার সম্পর্ক খারাপ করা। এ ব্যাপারে আমি একজনকেই সন্দেহ করি। সে হলো ঋতু, তোয়াব খানের পঙ্গু মেয়ে। রাফিয়া যদি শেষ পর্যন্ত তোয়াব খানের স্ত্রী হিসেবে টিকে যেত তাহলে ঋতু কয়েক কোটি টাকার সয়-সম্পত্তির অর্ধেক থেকে বঞ্চিত হত।'

থামল শহীদ।

লেখা শেষ করে মহুয়া তাকাল, 'ঋতু সম্পর্কে আর কিছু জানোনি তুমি?'

শহীদ বলল, 'ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই আমার হাতে, সুতরাং ওর প্রসঙ্গটা বাদ দিচ্ছি। রাফিয়ার সাথে সাধন সরকারের প্রেম—এই ব্যাপারটার সাথে বর্তমান কেসের কোন সম্পর্ক নেই। তোয়াব খান প্রায় বৃদ্ধ এবং নীরস, তাই রাফিয়া সাধন সরকারের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফুর্তি করার ইচ্ছা ছিল তার, আর কিছু নয়। ওই ধরনেরই মেয়ে সে। আমি এখন বিশ্বাস করি সাধন সরকার বর্তমান কেসে জড়িত নয়। যদিও তার বাড়িতে শিল্পীর কাপড়-চোপড় পাওয়া গেল কেন এটা একটা গুরুতর রহস্য হয়ে রয়েছে। তবে এ রহস্যের কিনারাও হবে। সম্ভবত সন্দেহের দৃষ্টি অন্য একজনের উপর গিয়ে পড়ুক, এই কথা ভেবে খুনী কাপড়-চোপড়গুলো রেখে এসেছিল সাধন সরকারের বাড়িতে। এটা অবশ্য আমার অনুমান মাত্র।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ওরা।

নিস্তব্ধতা ভাঙল মহুয়া, 'জামানের কি হয়েছিল, শহীদ?'

'হ্যাঁ, জামানের প্রসঙ্গ। লেখো। জোয়ারদার যে রাফিয়ার ঘনিষ্ঠ কেউ তা জামান জানত না। দোকানে ঢুকেই সে বিপদে পড়ে। বাদশা খান ছিল সেখানে। রাফিয়া তাকে আমাদের ইউনিভার্সেল ইনভেস্টিগেশনের নাম বলেছিল। জামানের মুখে রাফিয়ার নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম শুনে বিপদের আশঙ্কা করে সে। আগে থেকেই অস্থির, নার্ভাস ছিল সে। যে রাতে শিল্পী খুন হয় সে রাতে সে ঢাকায় এসেছিল, কিন্তু রাফিয়ার সাথে দেখা হয়নি তার। দেখা না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় ছিল সে ভীষণ রকম। এই পরিস্থিতিতে জামানকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে, গুলি করে। স্টুডিওতেই মারা যায় জামান। তার আগে সে জামানের হাত-পা বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জামানকে খুন করে সে দশটার প্লেনে সেই রাতেই ঢাকায় এসেছে। সে হয়তো ভেবেছিল রাফিয়াকে খুন করতে পারলে যে ভয়ঙ্কর বিপদটা দ্রুত এগিয়ে আসছে তার কবল থেকে গা বাঁচানো সম্ভব হবে। পুলিস রাফিয়াকে ধরে টরচার করলেই রাফিয়া ষড়যন্ত্রের কথা বলে ফেলবে—এই ভয়ে পাগল হয়ে

উঠেছিল সে। রাফিয়াকে সে খুন করেছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু, তার মোটিভ আছে, এটাই বলতে চাইছি আমি। অফিসরুমে সেই যে আমাকে পিছন থেকে আক্রমণ করেছিল তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। হ্যাট পরে সে। রাফিয়ার মৃতদেহ সম্ভবত, ঠিক বলতে পারছি না, সে-ই সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

মহুয়া বলল, 'ঘটনা তো অনেক দেখছি। কিন্তু ফলাফল কি?'

শহীদ দুর্বলভাবে হাসল, 'ফলাফল এখনও জানতে পারিনি। ঘটনাগুলো যোগ করতে হবে। আরও ঘটনা আছে, সংগ্রহ করতে হবে সব। তারপর ফলাফল। অঙ্কটা অস্বাভাবিক জটিল, মহুয়া। তবে জেনো, অঙ্ক আমি মেলাবই।'

মহুয়া বলল, 'কিন্তু যত দেরি হচ্ছে খুনীর আত্মবিশ্বাস ততই বাড়ছে। এই আত্মবিশ্বাসের ফলে সে আরও খুন করতে ইতস্তত করবে না।'

শহীদ বলল, 'খাঁটি কথা বলেছ। কি জানো…!'

হঠাৎ থামল শহীদ। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করল। অস্থির দেখাচ্ছে ওকে।

'কি জানো, যদি জানতে পারতাম কেন শিল্পী খুন হয়েছে এবং কেন রাফিয়া তার নেকলেসটা শিল্পীর ফ্ল্যাটে রেখে বেরিয়ে এসেছিল—তাহলে অঙ্কটা মিলিয়ে ফেলতে পারতাম। এই কেসটা আমার জীবনের সবচেয়ে জটিল কেস। সবকিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন, রহস্যময়। একটার পর একটা চমকপ্রদ তথ্য পাচ্ছি, অসংখ্য সূত্র রয়েছে হাতে, ঘটনাও ঘটছে একটার পর একটা অথচ কোন দিকে কোন কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছি না। শিল্পীর নিহত হওয়া এবং নেকলেসটার রহস্য—এ দুটো হলো মূল পয়েন্ট। এই দুটোর রহস্য উন্মোচিত করতে পারলে ঘটনা, তথ্য, সূত্র—একটার সাথে একটা সবগুলোকে মেলানো যাবে।'

মাথা নিচু করে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে পায়চারি করেই চলেছে শহীদ। দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে অনুসরণ করছে ওকে মহুয়া। অসহায় দেখাচ্ছে তাকে।

'আমি আরও জানতে চাই। জানতে চাই কাজী হানিফের নাইট ক্লাবে রাফিয়াকে অমন ভীতা-হরিণীর মত দেখাচ্ছিল কেন? কিসের ভয়ে, কার ভয়ে অমন উন্মাদিনীর মত আচরণ করেছিল সে? নাইট ক্লাবের মত একটা জায়গা—কেন সে আত্মগোপন করেছিল সেখানে?'

হঠাৎ হাতের পাইপটা কার্পেটের উপর আছাড় মেরে ফেলে দিল শহীদ। দ্রুত হলো ওর পায়চারি।

'আমি জানতে চাই কেন সে খুন হলো? জানতে চাই তার লাশটা গায়েব হয়ে গেল কেন? কে সরিয়েছে তার লাশ? কেন? কি উদ্দেশ্যে?'

'শান্ত হও, শহীদ! উত্তেজিত হলে কোন সমাধানেই পৌঁছুতে পারবে না।'

'রীটা গোমেজ—কি তার ভূমিকা? সে কি এখনও বাদশা খানের সাথে সম্পর্ক রাখছে? রাত্রে আমি আক্রান্ত হই, সকালে সে এসে হাজির—এটা কি একটা কোইনসিডেন্স? না! মনে হয় না। এই ব্যাপারটা আমাকে বিরক্ত করছে—জানতে হবে প্রকৃত ব্যাপারটা কি? আর একটা…আর একটা চরিত্র ইয়াকুব। চরিত্র বটে! আমার ধারণা এই কেসে সে-ও কোন না কোন ভাবে জড়িত। অনুমান, কিন্তু শক্ত যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে অনুমানটা। আমি ইয়াকুবের বাড়িতে যাব…ওটা

ইয়াকুবের বাড়ি নয়, ঋতুর বাড়ি—যাব। হয়তো বৃথা সময় নষ্ট হবে, তবু যেতে হবে আমাকে। তা না হলে খুঁত-খুঁত করবে মনটা।'

'কিন্তু সময় নষ্ট করাটা উচিত হবে না, শহীদ। ইন্সপেক্টর গনি দেলোয়ার মোরশেদের নিহত হবার ঘটনাটাকে অসম্ভব গুরুত্ব দিচ্ছেন। তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, ফোন করেছিলেন তিনবার। পুলিস শিল্পীর মাথা এবং হেদায়েত মোরশেদের মাথা থেকে বুলেট বের করে পরীক্ষা করে দেখেছে। একই পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়েছে দুটো বুলেট। আমার মনে হয়, ইন্সপেক্টরের সাথে দেখা করা উচিত হবে না তোমার। ভদ্রলোক ডেঞ্জারাস মুডে আছেন। তিনি হয়তো তোমাকে গ্রেফতার করার কথা এখনও ভাববেন না, কিন্তু জবাবদিহি চাইবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

শহীদ পায়চারি থামিয়ে বলল, 'হুঁ।'

পরক্ষণে পা বাড়াল ও।

'কোথায় যাচ্ছ?'

জবাব না দিয়ে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে বেডরুমে ঢুকল শহীদ। একটা তেপয়ের উপর লাল একটা টেলিফোন রয়েছে।

মহুয়া ত্রস্ত পায়ে বেডরুমে ঢুকল। শহীদ তখন লাল রিসিভার তুলে কথা বলছে কারও সাথে।

এক মিনিট পর রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ। কিন্তু নড়ল না, দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

'দাদাকে ফোন করলে কেন?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল শহীদ, 'ওর সাহায্য দরকার আমার, মহুয়া।'

'কি বললে দাদা?'

'বাদশা খানকে চাই আমি, মহুয়া। কুয়াশাকে লোকটার পরিচয় দিয়ে বললাম খোঁজ করার জন্যে চারদিকে লোক পাঠাতে।'

'যাচ্ছ তুমি?'

'হ্যাঁ। ফিরতে দেরি হলে, অস্বাভাবিক দেরি হলে কি করবে জানো তো?'

'হ্যাঁ, জানি। মি. সিম্পসনকে নোটটা দেব।'

'হ্যাঁ। চললাম। ভাল কথা, কামালের ফোন নাম্বারটা লিখে নাও। ওকে ফোন করে বলো, পরবর্তী ফ্লাইটেই, আজ রাতেই ঢাকায় চলে আসতে।'

'দাঁড়াও।'

দাঁড়াল শহীদ, 'কিছু বলবে?'

শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়ে শহীদের বুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মহুয়া। বিড় বিড় করে দোয়া-দরূদ কিছু পড়ে ফুঁ দিল শহীদের শার্টের বোতাম খুলে বুকে।

কোন কথা বলল না শহীদ। একসময় ঘুরে দাঁড়াল ও। জলে ভেজা ছলছল চোখে ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল মহুয়া, দরজার গায়ে হাত রেখে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ঘাড় ফেরাল শহীদ। চট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ চেপে ধরল মহুয়া, ঢুকে পড়ল ড্রয়িংরুমের ভিতর।

সোফায় লুটিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

পাঁচ

২০১/১৪ নিউ ইস্কাটন। ধবধবে সাদা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি। উঁচু পাঁচিল, দোতলা বাড়ি বলে বাইরে থেকে মনেই হয় না। অভিজাত এলাকায় যা হয়, লোকজন রাস্তায় একদম নেই। গেটটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি করা, সবুজ রঙের। খোলা রয়েছে।

রাত সাড়ে ন'টা বাজে। চাঁদ রয়েছে মাথার উপরে। গাড়ি নিয়ে গেটের সামনে দিয়ে চলে গেল শহীদ। থামল সামনে বাঁক নিয়ে দশ গজ এগিয়ে। পায়ে হেঁটে ফিরে এল গেটের কাছে। একজন মানুষ ঢোকার মত ফাঁক রয়েছে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না গেটটা। ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। সামনেই বাগান দেখল চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। একপাশে দোতলা বিল্ডিং। ঝুলন্ত বারান্দা দেখা যাচ্ছে চার-পাঁচটা। ডান দিকে দোতলার ব্যালকনির সাথে যে দরজা, সেটা খোলা। বৈদ্যুতিক আলো বেরিয়ে আসছে পর্দার ফাঁক দিয়ে।

তার মানে ইয়াকুব বাড়িতেই আছে। নিঃশব্দ পায়ে দোতলার আলোকিত রুমটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। চিন্তা করছে ও।

নির্দিষ্ট কোন কারণে আসেনি শহীদ। সন্দেহের উপর কাজ করছে ও। দেখা দরকার ইয়াকুব কি করছে। ইয়াকুব যদি অনুপস্থিত থাকত তাহলে রুমগুলো সার্চ করে দেখত আগে, কিন্তু সে যখন উপস্থিত রয়েছে—দেখা যাক কি করছে ছোকরা।

উপরে উঠতে হলে পানির পাইপ বেয়ে উঠতে হবে। কিন্তু পানির পাইপটা আলোকিত রুমটার কাছ থেকে অনেক দূরে।

তবু, পানির পাইপই একমাত্র ভরসা। দুই হাত দিয়ে পাইপ ধরে, নিচের অংশে পা ঠেকিয়ে উঠতে শুরু করল শহীদ।

মিনিট দুয়েক লাগল ওর উঠতে। পাইপ ছেড়ে দিয়ে একটা ব্যালকনির রেলিং ধরে কারনিসে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। আলোকিত রুমটার ব্যালকনি ডান দিকে, গজ তিনেক দূরে। মাঝখানে সাদা দেয়াল, তবে নিচের অংশে দুই ইঞ্চি চওড়া বর্ডার রয়েছে। পা রাখার জায়গা হিসেবে চলনসই, কিন্তু হাত দিয়ে ধরবার কিছু নেই।

কংক্রিটের বর্ডারে শুধু পা রেখে দেয়ালে গা ঠেকিয়ে একটু একটু করে এগোবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া হবে সেটা। এক চুল এদিক ওদিক হলেও পড়ে যেতে হবে নিচে। পড়লে মারা যাবার হয়তো ভয় তেমন নেই, কিন্তু হাত-পা নির্ঘাৎ ভাঙবে।

ঝুঁকিটা নেবে ঠিক করল শহীদ। দুই ইঞ্চি চওড়া কংক্রিটের বর্ডারে পা দিল ও। দেহটা সাঁটিয়ে রেখেছে দেয়ালের সাথে। ডান পায়ের সামনে বাঁ পা রাখছে, তারপর বাঁ পায়ের সামনে ডান পা, এই ভাবে দশ ইঞ্চি দশ ইঞ্চি করে এগোচ্ছে ও। ভারসাম্য হারাতে হারাতেও হারাচ্ছে না। দম বন্ধ করে, দাঁতে দাঁত চেপে এইভাবে এগোতে এগোতে দেড় গজের মত দূরত্ব অতিক্রম করার পর বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ল ওর।

একটা গাড়ির হর্ন শোনা গেল। তারপর ব্রেক কষে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল, সেই শব্দও কানে ঢুকল। দরজা খোলার শব্দ ঢুকল না কানে, কিন্তু সশব্দে বন্ধ হবার আওয়াজটা বেশ জোরেই পৌঁছল কানে।

দেয়ালের সাথে এমনভাবে দেহটাকে সেঁটে রেখেছে শহীদ যে মনে হলো দেয়ালের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাইছে ও।

হাইহিলের শব্দটা কানে ঢুকতে স্থির থাকতে পারল না শহীদ। এক চুল এক চুল করে মাথাটা ঘোরাল ও।

চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল মেয়েটিকে। কিন্তু চিনতে পারল না। যে-কোন কারণেই হোক, মেয়েটি খুব উত্তেজিত। ছুটছে না, তবে হাঁটাটা ছোটারই নামান্তর বলা যায়।

কে ও? রীটা গোমেজ?

নিঃসন্দেহ হতে পারল না শহীদ। ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও বোধ করল না ও। যেই হোক, সোজা উঠে আসবে সে ইয়াকুবের উপরের রুমে।

সোজা এগিয়ে আসছে মেয়েটা। মাথাটা উঁচু করে, দৃঢ় পদক্ষেপে। যে-কোন মুহূর্তে চোখ পড়তে পারে দোতলার দিকে। অন্তত আলোকিত রুমটার দিকে একবার তাকালে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাকানোই স্বাভাবিক। আর তাকালেই চাঁদের আলোয় ধবধবে সাদা দেয়ালে সেঁটে থাকা একটা ওয়ালপেইন্টিং-এর মত শহীদকে দেখতে পাবে সে।

হাতের তালু ঘামছে শহীদের। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে কখন মেয়েটি চিৎকার করে উঠবে।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। পনেরো সেকেণ্ড পর মেয়েটি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। নিচের করিডরে পৌঁছে গেছে সে, ভেসে আসছে অস্পষ্ট খট্ খট্ খট্ খট্ হাইহিলের শব্দ।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন শহীদের। আবার পা বাড়াল ও। ধীরে ধীরে গজ খানেক এগোল আরও, তারপর হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সামনের ব্যালকনির রেলিং। আর পড়ে যাবার ভয় নেই।

রেলিং টপকে ব্যালকনিতে নেমে শহীদ পর্দা ঝোলানো দরজার পাশে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

কে যেন কিছু পান করছে, ঢক ঢক শব্দ হচ্ছে কিছু ঢালার। আধ ইঞ্চি ফাঁক করল শহীদ পর্দাটা ডান হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে।

আরাম-আয়েশ আর বিলাসে ডুবে আছে ইয়াকুব, নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। রুমটা বড়সড়। সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র দিয়ে চমৎকার ভাবে সাজানো।

সোফায় আধশোয়া অবস্থায় বসে বিলিতি মদের বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালছে সে, ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে আছে বিপরীত দিকের দেয়ালে লটকানো নগ্ন নারীমূর্তি আঁকা তৈলচিত্রের দিকে। অদ্ভুত, গর্বিত হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটের কোণে।

নক হলো দরজায়। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ইয়াকুব দরজার দিকে। গম্ভীর হলো

মুখটা। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। যে এসেছে তাকে চেনে সে। বোঝা গেল তার হাবভাবে। সম্ভবত গাড়ির শব্দ পেয়ে ব্যালকনির দরজার কাছ থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে ইতোমধ্যে দেখে নিয়েছে সে মেয়েটাকে।

একটু একটু টলছে ইয়াকুব। হাতের গ্লাসটা তেপয়ের উপর রাখতে গিয়েও রাখল না। এগোল সে দরজার দিকে।

দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল ইয়াকুব।

কৌতূহলে দম বন্ধ হয়ে গেছে শহীদের। কাকে দেখবে ও? কে মেয়েটা? রীটা গোমেজ?

দরজা পেরিয়ে যে রুমের ভিতর প্রবেশ করল তাকে দেখে মাথা ঘুরে গেল শহীদের। বেলবটম পরা মেয়েটির বদলে শহীদ যদি একটি নর-কঙ্কালকেও ঢুকতে দেখত, অমন চমকে উঠত না ও।

মেয়েটি ঋতু। তোয়াব খানের পঙ্গু মেয়ে। যে হাঁটতে পারে না আজ বছর দুয়েক ধরে।

চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। একটা পিন পড়লেও যেন শোনা যাবে। দ্রুত চিন্তা করছে শহীদ। অফিসের ফাইল থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো একত্রিত করে তোয়াব খান, তাঁর পরিবার সম্পর্কে কামাল ওকে কি কি বলেছিল, মনে পড়ে গেল ওর। তোয়াব খানের মেয়ে ঋতু সম্পর্কে কামাল বলেছিল—মেয়েটা দু'বছর আগে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়, সেই থেকে চলৎশক্তিরহিত সে, পঙ্গু হয়ে গেছে। সেই অ্যাক্সিডেন্টেই তার মা নিহত হয়। ঋতুর পা ভাল করার জন্যে তোয়াব খান চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। বড় বড় বিদেশী ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তারেরা চেষ্টা করেও ঋতুকে হাঁটাতে পারেনি।

কিন্তু, একি দৃশ্য আজ চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে! ওই তো সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে ঋতু। ওই পা বাড়াল সে। কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। কই, এতটুকু খোঁড়াচ্ছেও না তো সে।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ইয়াকুব। কিন্তু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, 'এমন অসময়ে? ফোন করোনি কেন?'

কার্পেটের দিকে চেয়ে রয়েছে ঋতু। দু'বার ভুরু কুঁচকাল সে, তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'কেন, ডিসটার্ব ফিল করছ নাকি?'

ইয়াকুব টলছে, পা বাড়াল সে। ঋতুর পাশ ঘেঁষে এগিয়ে এল, বসল ধপ্ করে সোফায়। হাতের গ্লাসটা তুলল ঠোঁটে। ছোট ছোট দুটো চুমুক দিল। বলল, 'সেটা বড় কথা নয়, ফোন করে আসোনি কেন তাই জানতে চাইছি।'

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল ঋতু। মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে, 'আমার বাড়িতে আমি আসব, তার জন্যে কারও অনুমতি নিতে হবে তা জানা ছিল না। আজ জানলাম।'

ইয়াকুব তাকাল না, কথাও বলল না। গ্লাসের দিকে চোখ রেখে চুপ করে রইল সে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল ঋতুই, 'বসতেও বলছ না দেখছি আমাকে?'

না তাকিয়েই ইয়াকুব বলল, 'তোমার বাড়ি এটা—আমি কে? যা ইচ্ছা তুমিই তো করতে পারো।'

এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল ঋতু। বলল, 'মদ খাচ্ছ কেন?'

'জানো না কেন খাচ্ছি? কেন খাই?' সাথে সাথে পাল্টা প্রশ্ন করল ইয়াকুব।

'কেন?' চেষ্টা করা সত্ত্বেও গলার ঝাঁঝ চেপে রাখতে পারল না ঋতু।

ইয়াকুব এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করল। হাতটা মাথার উপর তুলে সামনের দেয়ালের দিকে গ্লাসটা ছুঁড়ে দিল সে।

দেয়ালে লাগল গ্লাসটা, ভেঙে গেল সশব্দে, চারদিকে অসংখ্য কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল।

'এসেছ ভালই করেছ। ফাইনাল আলোচনাটা এখনই হয়ে যাক!'

'ইয়াকুব, কি ভেবেছ তুমি আমাকে?'

'আমাকে কি ভেবেছ তুমি?' আবার পাল্টা প্রশ্ন করল ইয়াকুব।

দু'জন দু'জনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর ইয়াকুব বলতে শুরু করল, 'কেন তুমি রাজি হচ্ছ না বিয়েতে? কতবার এই এক কথা বলব আমি? বিয়ের প্রস্তাব তুমিই না দিয়েছিলে?'

ঋতু হঠাৎ কেমন যেন দমে গেল। নিস্তেজ স্বরে বলল, 'অসুবিধে আছে। সময় হোক...।'

'কিসের অসুবিধে? ব্যাঙ্কে তোমার নিজের নামে অগাধ টাকা নেই? এই বাড়িটা তোমার নামে কেনা নয়? তোমার বাবা—বিয়ে আমরা করে ফেললে তাঁর করার আছেটা কি? তাছাড়া, তোমার সম্পর্কে এবার সত্যি কথাটা বলবার সময় হয়েছে তাঁকে। অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটার সময় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন—কিন্তু এখন? তিনি আসল কথাটা জানেন না ভেবেছ? জানেন, জানেন। এবং তোমার ব্যাপারে দুঃখ পাওয়া তো দূরের কথা, তিনি মাথা ঘামান না। দু'বছর ধরে তোমাকে পঙ্গু দেখতে দেখতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন—আগের সেই দুঃখবোধ তোমার জন্যে তাঁর আর নেই।'

'আছে।'

'নেই। আমি বলছি নেই।' মেঝেতে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠল ইয়াকুব।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কেউ কারও দিকে তাকাল না, কথা বলল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল ইয়াকুবই।

'তোমার জন্যে তাঁর আগের সেই ভালবাসা থাকলে দু'দিন পর পর একবার তোমাকে দেখার জন্যে তোমার রুমে ঢুকতেন না তিনি। আগে কি রোজ চার-পাঁচবার করে দেখা করতেন না তোমার সাথে?'

ঋতুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খানিক পর সে বলল, 'আমার পঙ্গু অবস্থা দেখে তিনি ব্যথা পান, তাই ঘনঘন আমার সামনে আসতে পারেন না। তিনি দুঃখ পান। আর সেটাই আমি চাই। তিনি দুঃখ পেলেই আমি খুশি। শুনতে পাচ্ছ! আমি তাতেই একমাত্র আনন্দ পাই—তাঁকে দুঃখ দিয়ে।'

শেষের কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে, প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চিৎকার করে বলল ঋতু।

মুখ বিকৃত করে ইয়াকুব বলে উঠল, 'নিজেকে আর কতদিন ধোঁকা দেবে শুনি? বাস্তবের মুখোমুখি হও, সুন্দরী। তোমার বাবা বিয়ে করেছেন—তবু তোমার ভুল ভাঙল না?'

'ইয়াকুব—সাবধান হও বলে দিচ্ছি! এসব ব্যাপারে আমি তোমার সাথে আর কোন কথাই বলতে চাই না।'

ইয়াকুব ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'কথাই বলতে চাও না? বাহবা! বাহবা! তা বেশ তো, সব কথার শেষ কথাটা তাহলে শুনে নাও।'

'তার মানে?'

ইয়াকুব কথা না বলে ঋতুর দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। দেখল ঋতুকে কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে। তারপর ঝুঁকে পড়ে সামনের তেপয়ের উপর থেকে সোনার সিগারেট কেসটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করে ধরাল।

গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল ইয়াকুব, 'কেন আমি পড়ে আছি তোমাদের কাছে, ঋতু? আমার অবস্থা খারাপ ছিল, তাই তোমাদের বাড়ির গার্ড হিসেবে চাকরিটা নিয়েছিলাম। পরে তোমার সাথে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। আমরা ঠিক করি—বিয়ে করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু কি বলছ তুমি এখন? বলছ, বিয়েতে অসুবিধে আছে। কি অসুবিধে? তা তুমি বলতে চাইছ না। কি অর্থ দাঁড়ায় এসবের? তুমি আমাকে বিয়ে কোন দিনই করবে না, এই তো? বেশ, বেশ। টাকা পয়সার অভাব এখন আর তেমন নেই আমার। তোমাদের বাড়ির গার্ড হিসেবে আমি এখন বেমানান। তাছাড়া, আমাকে যখন তোমার আর ভাল লাগছে না—দরকার কি তোমাদের কাছে পড়ে থেকে? আমি আগামীকালই বিদায় হচ্ছি।'

ঋতু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি থামতে বলল, 'চলে যাবে, ইয়াকুব? কোথায়? কোথায় পাবে তুমি এই রকম একটা বাড়ি? হাত খরচার জন্যে প্রতি মাসে কয়েক হাজার করে টাকা? এমন রাজকীয় পোশাক, এমন রাজকীয় খানাপিনা—কে দেবে তোমাকে এসব?'

ইয়াকুব হাসতে হাসতেই বলল, 'আমাকে তুমি চেনোনি, ঋতু। তোমার কাছ থেকে যা পাচ্ছি তা আসলে আমার হিসেবে নিতান্তই কম। এর চেয়ে বেশি দেবার মত মেয়ে এই শহরে আরও অনেক আছে। তারা আমাকে পাবার জন্যে বিরক্ত করে মারছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি ইতিমধ্যেই সন্দেহ করেছ। তুমি আজ ফোন করে আসোনি বলে আমি বিরক্ত হয়েছি—কেন বলো তো? রোজ রাতেই মেয়েরা আসে আমার কাছে, ঋতু। বলা যায় না, আজ কেউ না কেউ আসতে পারে। সেজন্যেই তোমাকে দেখে আমি বিরক্ত হয়েছি। তুমি যদি ভেবে থাকো আমার জীবনে তুমিই একমাত্র মেয়ে—ভুল!'

ঋতু ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলে রাখল কোনমতে।

'ঋতু, সত্যি কথা বলছি, তোমার শয্যাসঙ্গী হতে আমার আর ভাল লাগছে না। তোমার সাথে এতদিন ভালবাসার অভিনয় করেছি কেন জানো? ভেবেছিলাম তোমার টাকা, তোমার বাড়ি আমার নামে লিখে দেবে তুমি—আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু দেখছি তা হবার নয়। সুতরাং—গুডবাই, সুন্দরী। আমি অন্যত্র চেষ্টা

করব।'

ঋতু চাপা কণ্ঠে জানতে চাইল, 'রাফিয়াও আসে নাকি তোমার কাছে?'

'জানো তাহলে! আসে বৈকি! তোমার চেয়ে ভাল সে। সে অন্তত তোমার মত অসুস্থ নয়।'

'আমি অসুস্থ?'

ইয়াকুব চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি অসুস্থ নও, তুমি একটা কুৎসিত…!'

'ইয়াকুব!' দাঁড়িয়ে পড়ল ঋতু, কাঁপছে সে। 'কেন, কেন এমন অপমান করছ আমাকে? কি করেছি তোমার আমি? বিয়ের জন্যে কেন এমন জোর খাটাতে চাইছ? এতবার করে বলছি, তবু কেন বুঝতে চাইছ না? কি পাচ্ছ না তুমি আমার কাছ থেকে বিয়ে না করেও?'

'থাক, থাক। আর পটাতে হবে না। নরম হয়ে লাভ নেই, ঋতু। আমি যাচ্ছি। আমাকে আর আটকে রাখতে পারবে না। তোমাকে আমার আর ভাল লাগছে না। শখ মিটে গেছে। একজনের বাঁধা পুরুষ হয়ে থাকা—আর কতদিন।

'ইয়াকুব, প্লীজ! মাথা ঠাণ্ডা করো…'

ঋতু পা বাড়াল। ইয়াকুব ঠাস করে চড় মারল তার বাঁ গালে।

পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠল ঋতুর গালে। গালে হাত দিয়ে চেয়ে রইল সে ইয়াকুবের দিকে।

ঠোঁটে সিগারেট লটকে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল ইয়াকুব। বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'দূর হও আমার সামনে থেকে। আগামীকাল আমি চলে যাব। তোমার মুখ আর দেখতে চাই না আমি।'

দু'পা পিছিয়ে ধপ করে বসে পড়ল ঋতু সোফায়। বলল, 'ইয়াকুব…আমি যাচ্ছি, কিন্তু কাল আবার আসব। এখন তোমার মাথা গরম হয়ে আছে…'

'না। কাল এসে তুমি আমাকে পাবে না।'

ঋতু বলল, 'কেন যাবে তুমি? যা বলেছি, ভুলে যাও, আমি ক্ষমা চাইছি…'

'না। তোমাকে আমার ভাল লাগে না। তুমি একটা ডাইনী। তোমার কবল থেকে আমি মুক্তি চাই।'

'কিন্তু…কিন্তু তোমাকে আমি যেতে দেব না, ইয়াকুব,' নরম গলায়, অস্বাভাবিক নরম গলায় বলল ঋতু আবার।

'বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। আমি অন্য একজন মেয়ের কাছে যাব ঠিক করেছি।'

ঋতু আরও ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অন্য কোন মেয়ে তোমার আমার মধ্যে আসতে পারে না, ইয়াকুব। যা হবার হয়েছে, আজ থেকে তোমাকে আমি আর কোন মেয়ের কাছে যেতে দেব না।'

'আহা, আমার সোনার চাঁন রে!' ব্যঙ্গ করল ইয়াকুব।

ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলতে খুলতে ঋতু বলল, 'কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, ইয়াকুব? আমার জন্যে তোমার একটুও মায়া হয় না? তুমি ছাড়া কে আছে আমার…।'

'ওসব ন্যাকামি বন্ধ করো তো!'

ইয়াকুব সবেগে ঘুরে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল ঋতুর হাতে ·৪৫ একটা পিস্তল।

সম্মোহিতের মত চেয়ে রইল ইয়াকুব। বাকস্ফূর্তি হলো না তার অনেকক্ষণ। হাসছে ঋতু। নিঃশব্দ, হিংস্র হাসি। মুখটা ঘেমে গেছে তার। ঠোঁট দুটো ভেজা ভেজা। চকচক করছে ইলেকট্রিক আলোয় পিস্তলটার রুপোলি গা। সরাসরি ইয়াকুবের বুকের দিকে ধরে রেখেছে সেটা ঋতু।

'এবার আমি কথা বলব, ইয়াকুব। শোনো। আমি জানতাম এই রকম ঘটনাই একদিন ঘটবে। মেয়েরা তোমাকে পছন্দ করে, জানি। জানি, অনেকেই তোমার কাছে আসে রাত্রে। রাফিয়ার ব্যাপারটা সঠিক জানতাম না, তবে সন্দেহ যে করিনি তা নয়। সব জেনেও কেন চুপ করে ছিলাম বলতে পারো? চুপ করে ছিলাম এই জন্যে যে—আর কেউ নেই আমার। তুমিই একমাত্র···তা সে যাক। ভেবেছিলাম যতদিন পারি, তোমাকে নিয়ে থাকব। কি আছে আমার জীবনে? সবাই জানে আমি পঙ্গু। ইচ্ছা করলেও আজ সবাইকে আমি জানিয়ে দিতে পারি না যে আমি এতদিন অভিনয় করেছি। পঙ্গুর অভিনয় করতে গিয়ে সত্যি সত্যি আমি সব দিক থেকে পঙ্গু হয়ে গেছি। আমার পঙ্গু জীবনে তুমিই একমাত্র সহায় ছিলে। যখন জানতে পারলাম তুমিও বেঈমানী করছ—মনটা ভেঙে গিয়েছিল। তবু, তোমাকে হারাতে চাইনি। কিন্তু আজ···নিজের মুখেই তুমি সব স্বীকার করে ফেললে। আর সহ্য করা যায় না। আর তোমার আমার সম্পর্ক থাকতে পারে না। একটা কথা, তুমি আসলে আমাকে চিনতে পারোনি, ইয়াকুব। আমার জেদ কি রকম—কল্পনা করতেও পারবে না। তোমাকে হারাতে হবে—এটা আমি মনে মনে জানতাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এবং এই পরিস্থিতিতে তা জানতাম না। তুমি যে নীচ বংশের ছেলে, প্রায় অশিক্ষিত, লম্পট, সুযোগ সন্ধানী—জানতাম বৈকি। তবু সম্পর্ক গড়েছিলাম। কেন? তোমাকে পাব বলে। চিরকালের জন্যে। বিয়ের মাধ্যমে নয়, সুযোগ সুবিধের মাধ্যমে। তোমার মত একটা জন্ম পরিচয়হীন বাস্টার্ডকে বিয়ে করার কথা আমি কখনোই ভাবিনি। ভেবেছিলাম টাকার লোভ, আরাম আয়েশের লোভ দেখিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখতে পারব। কিন্তু তা সম্ভব নয়, বুঝতে পারছি। সুতরাং, ইয়াকুব, বিদায়। আমাকে ছেড়ে তুমি অন্য কোন মেয়ের কাছে চলে যাবে—এ আমি সহ্য করতে পারব না। আমার শখের জিনিস নিয়ে আর কেউ মজা করবে—এ আমি হতে দেব না। ইয়াকুব—বি-দা-য়···!'

গুলি করার জন্যে ঋতু পিস্তলটা একটু তুলে ধরল।

'ঋতু! ঋতু শোনো! কি পাগলামি করছ—শোনো! ঋতু···!'

পর্দা সরিয়ে ব্যালকনি থেকে রুমের ভিতর ঢুকে পড়েছে শহীদ। ঋতু ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। টের পায়নি সে। রিভলভার রয়েছে শহীদের হাতেও। কিন্তু গুলি করার সুযোগ কোথায়? গুলি করতে হলে করতে হবে ঋতুর হাতের পিস্তল লক্ষ্য করে। কিন্তু সে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, পিস্তলটা দেখতেই পাচ্ছে না শহীদ।

ইয়াকুব লোক যেমনই হোক, একটা হত্যাকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, চোখের সামনে

তা ঘটতে যাচ্ছে দেখে চুপ করে থাকা সম্ভব নয় শহীদের পক্ষে।

ঝুঁকিটা নিতে হয়েছে ওকে। পা টিপে টিপে এগোচ্ছে শহীদ। হাসছে শব্দ করে ঋতু। বলছে, 'অনেক মেয়েকে তুমি ভাসিয়েছ, ইয়াকুব! তারা আমার মত ছিল না কেউ! তারা প্রতিশোধ নিতে পারেনি! কিন্তু আমার হাত থেকে তোমার নিষ্কৃতি নেই!'

ইয়াকুব কথা বলছে না। বোকার মত চেয়ে আছে সে। চেয়ে আছে শহীদের দিকে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করেই ঋতু তাকাল পিছন দিকে।

গুলির শব্দ হলো সাথে সাথে।

ওরা তিনজন, কেউই বুঝতে পারল না কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

শহীদ পাঁচ ছয় হাত দূরে ছিল ঋতুর কাছ থেকে। ঋতু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেখতে পেয়েও করার কিছু ছিল না ওর। এতটা দূর থেকে লাফ দিয়ে ঋতুর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নেয়া সম্ভব ছিল না, তার আগেই গুলি করত ঋতু।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শহীদকে দেখতে পেলেও ঋতু গুলি করার অবকাশ পেল না। পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করার আগেই গুলির শব্দ হলো। বুলেট লাগল তার হাতের পিস্তলে। ছোঁ মেরে কেড়ে নিল যেন কেউ সেটা তার হাত থেকে। উড়ে গিয়ে সেটা লাগল রুমের দেয়ালে, দেয়াল থেকে পড়ল কার্পেটের উপর।

কে করল গুলি?

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই লাফে দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এল শহীদ ব্যালকনিতে।

কেউ নেই।

রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল শহীদ। হাঁপাচ্ছে ও উত্তেজনায়। গুলি যেই করুক, এই ব্যালকনি থেকেই করেছে। গুলি করে এখান থেকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কোন মানুষ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু নিচের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্যই হলো শহীদ।

চাঁদের আলোয় নিচের কংক্রিটের রাস্তা, বাগান—সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নিঃসাড়, নিস্তব্ধ চারদিক।

কেউ নেই।

ঋতুর কথা মনে পড়ে যেতে দ্রুত ফিরে এল শহীদ রুমের ভিতর।

দাঁড়িয়ে আছে সেই একই জায়গায়, সেই জানালার কাছে পাথরের মূর্তির মত ইয়াকুব। ভিজে গেছে তার মুখটা ঘামে। শহীদের দিকে চাইল বোকার মত। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েও আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে।

'কোথায় সে?' কার্পেটের উপর পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল শহীদ।

দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখাল ইয়াকুব। কথা বলতে পারল না। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল শহীদ, ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল আবার ব্যালকনিতে। রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াতেই ঋতুকে দেখতে পেল ও।

ছুটছে মেয়েটা গেটের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পরই আর দেখা গেল না

তাকে। একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ ভেসে এল।

ফিরে এল শহীদ রুমের ভিতর, 'তুমি একটা কুকুর, ইয়াকুব। ঋতুকে সুযোগটা দেয়াই উচিত ছিল আমার। কিন্তু তোমার কাছ থেকে কয়েকটা কথা আদায় করার জন্যে এসেছিলাম, তাই মরতে দিলাম না।'

সোফায় বসে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল শহীদ। আবার বলল, 'সবাইকে বোকা বানাচ্ছে কেন ঋতু? পঙ্গু সে নয়—অথচ পঙ্গু হয়ে আছে কেন?'

ইয়াকুব ভিজে বেড়ালের মত মিনমিনে স্বরে বলে উঠল, 'আপনি···আপনি··· আপনি···।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, আমি। তোমার যম। যা জিজ্ঞেস করছি পটাপট উত্তর দাও। সত্যি কথা বলবে, যদি ভাল চাও। তা না হলে কোমরে দড়ি পড়বে।'

ইয়াকুব খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'আমি আর এখানে থাকব না···আবার ফিরে আসবে ও পিস্তল নিয়ে···।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল শহীদ। বলল, 'অভিনয় করছ নাকি? ছুঁচোর মত এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

ইয়াকুব যেন শুনতেই পায়নি শহীদের কথা। বোকা, বিমূঢ় দেখাচ্ছে তাকে। গলাটা কেঁপে উঠল কথা বলার সময়, 'আমাকে আপনি মাফ করে দিন, আমি সেদিন না জেনে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আমি চলে যাই এখুনি···!'

'নোড়ো না!' সাবধান করে দিল শহীদ। হাতের রিভলভারটা ধরল তার দিকে। আবার বলে উঠল, 'নড়লেই গুলি করব। যাবে—বেশ তো। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি যদি মনে করি তুমি সত্যি কথা বলছ তাহলে ছেড়ে দেব তোমাকে। তা নাহলে তোমাকে জেলখানায় ঢুকিয়ে পচাবার ব্যবস্থা করব। বসো, পঙ্গুর অভিনয় কেন করছে ঋতু?'

ইয়াকুব নড়ল না। মনে হচ্ছে, উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সে। একটু পরই সে বলতে শুরু করল, 'ঋতু ওর বাবাকে ঘৃণা করে, তাই।'

'ঘৃণা করে কেন? অ্যাক্সিডেন্টটা হবার পর থেকে? যে অ্যাক্সিডেন্টে ও আহত হয়, ওর মা নিহত হয়?'

'না। তার আগে থেকেই। ওর বাবা ওকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। আগে থেকেই। কিন্তু বাবাকে ও ছোট বেলা থেকেই এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত। এই ব্যাপারটা নিয়ে ওর বাবা মার মধ্যে ঝগড়াও হত। তোয়াব সাহেব দোষ দিতেন ওর মাকে। আসলে ওর মায়ের কোন দোষ ছিল না। ঋতু, কি কারণে কে জানে, ওর বাবাকে দুই চোখে দেখতে পারত না। যত ভালবাসা সব ওর মায়ের প্রতি ছিল। এদিকে ওর বাবা ওর জন্যে পাগল ছিল! মেয়েকে এত ভালবাসত যে···। এসব কথা আমাকে ঋতুই বলেছে।'

'বলে যাও। যা জানো সব বলো।'

'ঋতু যখন বড় হয় তখন ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়। তোয়াব সাহেব মেয়ের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সারাক্ষণ চেষ্টা করতেন, ক্রমশ, তিনি গম্ভীর এবং জেদী হয়ে উঠতে থাকেন। এদিকে ঋতুও আরও বেশি করে তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। যাই হোক, এইভাবেই চলছিল। একদিন ওরা তিনজন

কোথায় যেন বেড়াতে বেরোয়। সেদিন নাকি তোয়াব সাহেব ড্রিঙ্ক করেছিলেন। গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনিই। পিছনে ছিল ঋতু আর ওর মা। তোয়াব সাহেব গাড়ি চালাতে চালাতে ঋতুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকো? ঋতু কোন উত্তর দেয়নি। প্রশ্নটা নাকি তোয়াব সাহেব কয়েকবার করেছিলেন। কিন্তু ঋতু একবারও মুখ খোলেনি। এর পরই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে। একটা ট্রাক আসছিল। ওদের গাড়িটার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অ্যাক্সিডেন্টের পরমুহূর্তের ঘটনা কারও মনে নেই। ঋতু একসময় দেখে সে পড়ে আছে রাস্তার ধারের একটা খাদের ঢালু গায়ে, পাশেই রক্তাক্ত অবস্থায় তার মা। তিনি তখনই মারা গেছেন। ঋতুর সারা শরীরে কাটা ছেঁড়ার দাগ ছিল। কিন্তু পায়ে সে কোনরকম ব্যথা পায়নি। ট্রাকের ড্রাইভারও নিহত হয় অ্যাক্সিডেন্টে। দুটো গাড়িই উল্টে পড়েছিল খাদের নিচে। তোয়াব সাহেব সম্পূর্ণ অক্ষত ছিলেন, একটা আঁচড়ও লাগেনি তাঁর গায়ে। ঋতুর কাছে দাঁড়িয়ে তিনি পাগলের মত নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছিলেন। মেয়ের জন্যে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন একরকম। হাসপাতালেও এমন আচরণ শুরু করেন তিনি যে অনেকেই বলাবলি করেছিল মেয়েটি যদি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেত তাহলে তোয়াব সাহেব নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যেতেন। কিন্তু যার জন্যে অমন দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন তিনি, সে এক নয়া পয়সাও মূল্য দেয়নি তাঁর কাতরতার। ঋতুর ধারণা হয় অ্যাক্সিডেন্টটা ইচ্ছা করেই করেছেন ওর বাবা, ওর মাকে খুন করার জন্যে। মা খুন হলে সে বাবাকে ভালবাসতে বাধ্য হবে—তাই। মনে মনে তখনই ঋতু ঠিক করে, ওর বাবাকে ও সারা জীবন মানসিক কষ্টের মধ্যে রাখবে। ঠিক করে পঙ্গু হবার অভিনয় করে যাবে সে। বুঝতে পারছেন, কি ধরনের বদ্ধ পাগল সে একটা?'

'তুমি ভিড়লে কিভাবে ওদের সাথে?'

'আমার হাতে টাকা-পয়সা ছিল না তখন, ওদের বাটলার মোখলেস মুক্তা নিকেতনের গার্ড হিসেবে চাকরি করার প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।'

'বুঝেছি। শুধু গার্ডের চাকরি করার মত বানর তুমি নও। তুমি আসলে মনে মনে আশাই করেছিলে চাকরি পেলে কোটিপতি তোয়াব খানের স্ত্রী বা মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে। অমন বড়লোকদের বাড়িতে ঢুকতে পারার সুযোগ পেয়ে তুমি আকাশের চাঁদ পেয়ে যাও হাতে। সে যাক। মিসেস রাফিয়ার বেডরুমে চুরি করা ছোটখাট জিনিস ভর্তি সুটকেসটা কে রেখে এসেছিল? তুমি জানো?'

'ঋতুর কাজ। সেই আমাকে ওটা রেখে আসতে বলে।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে শহীদ জানতে চাইল, 'রীটা গোমেজ সম্পর্কে বলো এবার।'

'রীটা গোমেজ? ওহ্—তার সাথে আমার এখন কোন সম্পর্ক নেই। কেমন যেন মেয়েটা। বক্সিং আর কুস্তি দেখতে খুব ভালবাসে। আমি যখন রয়েল জিমন্যাশিয়ামে যাওয়া-আসা করতাম, তখন তার সাথে পরিচয় হয়। পুরুষালি ভাবভঙ্গি করে, সে যে একটা মেয়ে একথা মনে রাখতেই চায় না। বক্সিং ছেড়ে দেয়ায় তুমুল ঝগড়া করে সে আমার সাথে। কিন্তু পাত্তা দিইনি তার কথায়, বক্সিং

শিখতে ফিরে যাইনি আমি আর। সেই তার সাথে সম্পর্কের শেষ—আর দেখা হয়নি। তবে শুনেছি, ক্লাবে ক্লাবে তাস খেলে, মানে জুয়া খেলে সে, চুরি করতেও জানে খেলায়। বেশ ভালই রোজগার হয় নাকি।'

জানতে চাইল শহীদ, 'বাদশা খানের নাম শুনেছ কখনও তার মুখে?'

'বাদশা খান—না। কে সে?'

'যেই হোক, ভুলে যাও। আচ্ছা—ক'দিন আগে তুমি সাধন সরকারের বাড়িতে কেন গিয়েছিলে চোরের মত, গেট টপকে?'

'ঋতুর কথাতেই গিয়েছিলাম। রাফিয়ার সাথে সাধন সরকারের গোপন সম্পর্ক আছে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্যে পাঠিয়েছিল সে আমাকে। কিছুই পাইনি।'

'শিল্পী কেন খুন হয়েছে, ইয়াকুব। কি জানো তুমি এ ব্যাপারে?'

'বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না। ঋতুর সন্দেহ, খুন করেছে রাফিয়া। কিন্তু আমি জানি না কিছুই।'

'এখন গুলি করল কে বলো তো?'

ইয়াকুব বলল, 'ব্যালকনিতে গিয়ে কাউকে দেখেননি আপনি?'

'না। কাউকে দেখতে পাইনি।'

ইয়াকুব বলল, 'আমি জানি না···কে হতে পারে···বুঝতে পারছি না···।'

শহীদ উঠে দাঁড়াল। গুলি কে করেছে সেটা খুব একটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কারণ, ইতোমধ্যেই শহীদ একজনের কথা ভাবছে।

গুলি করা হয়েছে শহীদকেই রক্ষা করার জন্যে। ঋতু ঘুরে দাঁড়িয়ে শহীদকে দেখে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিল, এমন সময় সেই রহস্যময় লোকটি ব্যালকনি থেকে গুলি করে ঋতুর হাতের পিস্তলে। সন্দেহ নেই, শহীদকে রক্ষা করতে গিয়েই কেউ কাজটা করেছে।

সে কে হতে পারে, অনুমান করা কঠিন নয় শহীদের পক্ষে।

'ইয়াকুব, তুমি একটা নর্দমার কীট। এখান থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও, কাল সকালেই তুমি ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। ঢাকায় যেন তোমাকে আর কোন দিন না দেখি।'

কথাগুলো বলে পা বাড়াল শহীদ দরজার দিকে।

ফেরার পথে গাড়িতে শহীদ ভাবছে। তুমুল ঝড় বইতে শুরু করেছে তার মাথার ভিতর। এমন কিছু বলেনি ইয়াকুব যা থেকে এই জটিল হত্যাকাণ্ড গুলোর উপর কোন আলোকপাত হয়।

মূল রহস্যটা নিহিত শিল্পীর খুন হওয়ার মধ্যে। সে যার হাতে খুন হয়েছে, তার হাতেই খুন হয়েছে মোরশেদ।

জামান অবশ্য খুন হয় বাদশা খানের হাতে।

আর রাফিয়া? রাফিয়া সুলতানা? সে কার হাতে খুন হয়েছে? শিল্পী আর মোরশেদের খুনী যে, সেই কি খুন করেছে রাফিয়াকে? রাফিয়ার লাশ—কোথায়? কেন, কেন খুনী লাশ সরিয়ে ফেলেছে? কেন?

এতসব কথা একসাথে ভাবতে গেলে কোনটারই হদিস পাওয়া যাবে না।

অফিসে পৌঁছুল শহীদ। প্রথমে শিল্পী, তারপর জামান! এরপর? এরপর কে? কামাল? নাকি ও নিজে?

পায়চারি শুরু করল শহীদ। কামাল কি ফিরেছে? মহুয়াকে ফোনে জিজ্ঞেস করলে হয়।

রিস্টওয়াচ দেখল শহীদ। মাত্র সাড়ে ন'টা। দশটায় ল্যাণ্ড করবে প্লেন। এখনও তাহলে পৌঁছয়নি কামাল।

শিল্পীকে কেন খুন করেছে খুনী? মোটিভ কি? শিল্পীকে কেন খুন করেছে খুনী? মোটিভ কি? শিল্পীকে কেন খুন···। একই প্রশ্ন বারবার মাথার ভিতর ঠোকর খাচ্ছে। এই প্রশ্নের ভিতরই লুকিয়ে রয়েছে যাবতীয় রহস্যের চাবিকাঠি। শিল্পীর বেডরুমে, কার্পেটের নিচে পাওয়া গেছে রাফিয়ার নেকলেস। কেন? কেন? কেন? কি অর্থ এর?

'ঠাণ্ডা হও, শহীদ, মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করো!' বিড় বিড় করে বলে উঠল কথাগুলো সে নিজেকেই উদ্দেশ করে। পায়চারি থামাল। পাইপে আগুন ধরাল। ধীরে ধীরে বসল, একটা চেয়ারে। হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

বাদশা খান। কোথায় সে? কুয়াশাকে অনুরোধ করেছে ও বাদশা খানের হদিস জানাবার জন্যে। কুয়াশা নিশ্চয়ই বসে নেই।

বাদশা খান খুন করেছে জামানকে। আর এক লোক—কাজী হানিফ। কি তার ভূমিকা?

রীটা গোমেজ!

নাহ্! তার স্বার্থ কি? না···ভুল হলো, স্বার্থ আছে বৈকি। রাফিয়া সুলতানা কেড়ে নিয়েছিল তার কাছ থেকে বাদশা খানকে। কিন্তু···নাহ্! বিশ্বাস হয় না। একটা মেয়ে অতগুলো খুন করে না, করতে পারে না অমন সামান্য একটা কারণে।

ঋতু? সে তো একটা মানসিক ভারসাম্যহীন চরিত্রহীনা গোঁয়ার মেয়ে।

কিন্তু মোটিভ? রাফিয়াকে ফাঁসানো? দূর, দূর! ওটা একটা খুনের, একাধিক খুনের মোটিভ হতে পারে না। তাছাড়া, ·৪৫ রিভলভার ব্যবহার করা তার পক্ষে কঠিন বলেই মনে হয়···।

পায়চারি শুরু করল আবার শহীদ।

পায়চারি করছিল শহীদ যখন রাত একটার সময় ফোন এল, তখনও।

ফোনের বেল ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠতেই থমকে দাঁড়াল ও। রিস্টওয়াচ দেখল। কে ফোন করেছে জানে ও। এই ফোনের জন্যেই অপেক্ষা করছে ও।

এগিয়ে এসে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে বলল, 'শহীদ বলছি।'

ভারি কণ্ঠস্বর, কুয়াশার, 'ডাক্তার কুমারকে চেনো তো, শহীদ?'

'চিনি। শয়তান কুমার নামে চেনে সবাই ওকে। খুনী, গুণ্ডা, বদমাশ, হাইজ্যাকারদের আশ্রয় দেয়, তাদের চিকিৎসা করে, তাদের দ্বারা নিহত লোকদের লাশ গুম করতে সাহায্য করে—এসবই তার বিরুদ্ধে রটনা, কেউ আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি একটি অভিযোগও।'

'তার বাড়িটা চেনো তো?'

'চিনি। ফরাশগঞ্জে, নদীর ধারে। বাড়িতেই ডিসপেন্সারি।'

কুয়াশা বলল, 'বাদশা খান ওখানেই আত্মগোপন করে আছে, শহীদ।'

গম্ভীর হয়ে গেল শহীদের মুখ। বলল, 'ধন্যবাদ, কুয়াশা।'

কুয়াশা বলল, 'শোনো, শহীদ। ডাক্তার কুমারকে তোমার চেয়ে ভাল চিনি আমি। এক কাজ করো, আমি ওখানে যাচ্ছি, তোমাকে অনুসরণ করে শয়তানটার বাড়িতে ঢুকব··· '

শহীদ বলল, 'আমি এই মুহূর্তে রওনা হচ্ছি।'

কুয়াশাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই শহীদ রিসিভার রেখে দিল যথাস্থানে।

তারপর ফোন করল মহুয়াকে।

'মহুয়া। অফিস থেকে বলছি···।'

প্রায় সাথে সাথে মহুয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তুমি অফিসে! এদিকে আমি তোমার অপেক্ষায় ফোনের সামনে বসে আছি···।'

'কামাল পৌঁছেছে?'

'পৌঁছেছে। কিন্তু এইমাত্র চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

'কোথায় গেছে বলে যায়নি। সম্ভবত তোমার খোঁজেই গেছে। মি. সিম্পসনের কাছে যেতে পারে।'

একমুহূর্ত চিন্তা করল শহীদ। তারপর বলল, 'ওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো। ওকে বলবে আমি ডাক্তার কুমারের বাড়িতে যাচ্ছি। ও খবরটা পাওয়া মাত্র যেন রওনা হয়ে যায়। মি. সিম্পসনকে একথা জানাবার দরকার নেই।'

'এত রাতে একা তুমি···।'

মহুয়ার কথা শেষ হবার আগেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল শহীদ। পকেট থেকে লোডেড রিভলভারটা বের করে চেক করে নিল ও।

সব ঠিক আছে।

পা বাড়াল শহীদ। দৃঢ়, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ও।

ছয়

বাড়িটা মেইন রোডের উপরই। ফোক্সওয়াগেন নিয়ে সেটার সামনে দিয়ে চলে গেল শহীদ। রাত একটা বেজে এগারো মিনিট। ফাঁকা রাস্তা। না আছে গাড়ি ঘোড়া, না আছে মানুষজন।

পঞ্চাশ ষাট গজ এগিয়ে একটা সরুগলির মুখে গাড়ি থামাল শহীদ। নামল, দরজা বন্ধ করল ধীরে ধীরে। নিঃশব্দ পায়ে গলির ভিতর ঢুকল ও।

ঘেউ। ঘেউ।

একটা কুকুর ছুটে এল হঠাৎ। দাঁড়িয়ে পড়ল। পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফেলল শহীদ।

'এই, শহীদ। একি করছ তুমি!'

কুকুরটাকে গুলি করতে যাচ্ছিল শহীদ, কিন্তু নিজের ভিতর থেকে কথা বলে উঠল ওর মন। কুকুরটা বিপদ টের পেয়েছে। লেজ দাবিয়ে ছুটল সে।

খানিকদূর এগিয়ে নদীর ধারে পৌঁছুল ও। ডান দিকে পায়ে হাঁটা কর্দমাক্ত পথ চলে গেছে। সরু, পিচ্ছিল পথ। দিনের বেলা এই জায়গায় লোকজন ওঠা-নামা করে নৌকা থেকে।

পঞ্চাশ গজের মত এগিয়ে একটা উঁচু পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল শহীদ।

নদীতে চাঁদ দুলছে। নৌকা নেই, বড় বড় ঢেউ নেই। কল-কোলাহল কিছু নেই। লাফ মেরে পাঁচিলের মাথা ধরে ঝুলে পড়ল শহীদ। ওটার গায়ে পা বাধিয়ে অনায়াসে উঠে পড়ল ছয় ফুট উঁচু পাঁচিলের উপর।

নিচে গাঢ় অন্ধকার। দোতলা বাড়িটার পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোন আলো নেই। একমাত্র চাঁদের আলোই সম্বল। মাথার ঠিক উপর থেকে ডেকে উঠল একটা উড়ন্ত রাত-জাগা পাখি।

অকারণেই গা ছমছম করে উঠল শহীদের। বুকের ভিতর কেমন যেন তোলপাড় হচ্ছে।

ঝুপ!

লাফ দিয়ে নামল শহীদ। ব্যথায় চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ওর। বড় একটা ইটের টুকরোর উপর পা পড়ায় পা'টা মচকে গেল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল ও। বুনো গাছ-গাছালিতে ভর্তি জায়গাটা। অদূরে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বা বারান্দা। ফাঁকা, শূন্য।

বারান্দার উপরে উঠে কান পাতল শহীদ। জানালা নেই একটাও, একপাশে শুধু তিনটে দরজা। তিনটেই পরীক্ষা করে দেখল ও। বন্ধ। নেমে এল বারান্দা থেকে। ডান দিকে এগোল ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে।

চাঁদের আলোয় পথ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। বাড়িটার দিকে নজর ওর। দশ-বারো গজ এগোতে একটা জানালা পেল ও। কিন্তু ভিতর থেকে বন্ধ সেটা। আবার এগোল। এবার খানিকদূর এগোতেই যে জানালাটা চোখে পড়ল সেটা খোলাই রয়েছে দেখা গেল।

নিঃশব্দে জানালার নিচে প্রায় মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। আছে, ভিতরে মানুষ আছে। ঘুমাচ্ছে লোকটা। ছন্দোবদ্ধভাবে নিঃশ্বাস পড়ছে লোকটার।

লোহার শিকগুলো হাতের স্পর্শ দিয়ে পরীক্ষা করল ও। তেমন মোটা নয়। দুটো রড ধরে শক্তি পরীক্ষা শুরু করল ও।

মিনিট খানেকের মধ্যে শিক দুটো বাঁকা করে ফেলল শহীদ। আরও এক মিনিট লাগল কাঠের ফ্রেম থেকে সে দুটোকে তুলে আনতে।

মাথা গলিয়ে কামরাটার ভিতরটা দেখে নিল ও। কিছুই দেখবার উপায় নেই অন্ধকারে। পকেট থেকে টর্চটা বের করে জ্বালল।

সাদামাঠা একটা কামরা। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। দুই দিকের দেয়ালে দুটো পেরেকের সাথে একটা পাটের দড়ি ঝুলছে, সেই দড়িতে ময়লা লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি। চৌকির উপর খালি গায়ে একজন লোক ঘুমুচ্ছে তা ও দেখে নিয়েছে প্রথমেই। লোকটা এ বাড়ির চাকর-বাকর হবে। একটিমাত্র দরজা কামরায়। সেটা

ভিতর থেকেই বন্ধ। খিল নেই, শিকল নেই—আছে শুধু ব্যাঙ! সেটাই নামিয়ে দেয়া নিচের দিকে।

নিঃশব্দে জানালা গলে নামল শহীদ কামরার মেঝেতে। ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না, কথাটা ভেবেই প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল লোকটার তেল চকচকে নাকের উপর।

যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে রইল লোকটা। নাকের ফুটো দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসতে শুরু করল দুটো রক্তের ধারা। জ্ঞান নেই তার, তা না হলে লোকটা গোটা এলাকার বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিত চিৎকার করে।

ব্যাঙ তুলে দরজাটা খুলল শহীদ। সরু একটা প্যাসেজ চলে গেছে দুই দিকে। ঝট্ করে মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিল ও। প্যাসেজের একদিকের শেষ প্রান্তে একজন লোক রয়েছে।

একটা টুলের উপর বসে রয়েছে লোকটা। দুই পায়ের মাঝখানে খাড়া করে রেখেছে সে একটা রাইফেল। দেয়াল ঘেঁষে বসেছে সে টুলে, মাথাটা দেয়ালে ঠেকানো।

একটু একটু করে মাথা বের করে আবার তাকাল শহীদ। নড়ছে না লোকটা। চোখ সম্ভবত বুজে আছে। ঘুমুচ্ছে কিনা দূর থেকে বোঝা মুশকিল।

পা টিপে টিপে প্যাসেজে বেরিয়ে এগোতে লাগল ও। লোকটার কাছেই প্যাসেজের শেষ দরজাটা, মুখোমুখি বড় একটা তালা ঝুলছে কড়া দুটোর সাথে। বাড়ির অন্দর মহলের সাথে উঠন বা বাইরের অংশের যোগাযোগ ওই দরজাটা।

লোকটার মাথা যে দেয়ালে সেই দেয়ালে, লোকটার কাছ থেকে হাত দুয়েক এদিকে, আর একটি দরজা। তাতেও তালা আটকানো। শহীদের মনে হলো, কামরাটার ভিতর কিছু থাকতে পারে। লোকটা হয়তো ওই কামরাটাই পাহারা দিচ্ছে।

ঘুমোচ্ছে লোকটা। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। ইচ্ছা করলেই হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে ও লোকটার চোখ দুটো। ইয়া লম্বা-চওড়া গোঁফ লোকটার। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। নাকটা মুখের তুলনায় বড়।

কোন শব্দ শোনা যায় কিনা বোঝার জন্যে কান পাতল ও, তারপর প্রচণ্ড জোরে মারল ঘুসিটা।

নাকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। রক্তের স্রোত বেরিয়ে এল সাথে সাথে।

টুল থেকে লোকটার অচেতন দেহটা নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিল শহীদ। রাইফেল থেকে বের করে নিল বুলেটগুলো। সেগুলো পকেটে ভরে পিছিয়ে এসে দাঁড়াল কামরার দরজার সামনে।

তালাটা খোলার কোন উপায় নেই। লোকটাকে সার্চ করে কোন চাবি পায়নি ও।

ভাঙতে হবে। কিন্তু ভাঙার শব্দটা চাপা দেয়া তো আর সম্ভব নয়। শব্দ হলে···চিন্তা করা যায় না। ছুটে আসবে শয়তান কুমার, ছুটে আসবে খুনী বাদশা খান, ছুটে আসবে শয়তান কুমারের অনুচরের দল হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করতে করতে।

কিন্তু উপায় কি? নিজেকে খুব বেশিক্ষণ ভাবনা চিন্তা করতে না দিয়ে ভারি

রাইফেলটা তুলে নিয়ে তালার উপর প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল ও। কেঁপে উঠল যেন গোটা বাড়িটা!

এক আঘাতেই খুলে গেল তালা। ফাঁক হয়ে গেছে কবাট দুটো।

আচমকা নিভে গেল প্যাসেজের আলো!

কামরার ভিতর অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে ভিতরে ঢুকল শহীদ। তালা দেয়া কামরা—কিন্তু কই, কিছুই তো নেই ভিতরে···আরে! ওটা কি? পা বাড়াল শহীদ।

ফাঁকা, শূন্য কামরা। ধুলো পর্যন্ত নেই কোথাও। কিন্তু এক কোনায় শুধু পড়ে আছে লম্বা একটা কাঠের বাক্স।

বাক্সটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। ধড়ফড় করছে বুকের ভিতরটা অকারণেই। বাক্সটার ভিতর কি আছে তা যেন জানে ও।

ঢাকনিটা তুলতে গিয়ে থামল ও। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল। কে যেন কিছুটা দূরে দৌড়ুল, পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভুল শুনতে পাচ্ছে নাকি ও?

বাক্সের ভিতরটা দেখা দরকার আগে। ঝুঁকে পড়ে ঢাকনিটা তুলে ফেলল ও।

নাকে ধাক্কা মারল তীব্র ঝাঁঝ—ফরমালডি-হাইডের গন্ধ। লাশ যাতে না পচে, তাই মাখিয়ে রাখা হয় লাশের গায়ে। বাক্সের ভিতর ঘুমুচ্ছে যেন মিসেস রাফিয়া ওরফে রাফিয়া সুলতানা। এতটুকু বদলায়নি তার চেহারা। চেহারায় শুধু ফুটে আছে আতঙ্ক।

ঢাকনিটা নামিয়ে রাখল শহীদ। টর্চটা নিভিয়ে ফেলল। পরক্ষণে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল ও। খোলা দরজা পথে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোন শব্দও ঢুকছে না কানে। হঠাৎ সামনের অন্ধকার যেন গাঢ় হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ খেলে গেল শহীদের দেহে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই গোটা আকাশ ভেঙে পড়ল শহীদের মাথায়।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল শহীদ। ছিটকে পড়ল হাতের রিভলভার, টর্চ। তীব্র ব্যথায় গোঙাতে লাগল ও। পরক্ষণে কোঁত্ করে একটা বিদঘুটে শব্দ বেরিয়ে এল গলা থেকে। লাথি মারছে শত্রু ওর পেটে।

দ্বিতীয় লাথিটা শহীদের বুকের নিচে লাগল। লম্বা হয়ে গেল দেহটা মেঝের উপর। মাথাটা ঠুকে গেল মেঝের সাথে।

বাঘের মত কেউ লাফ দিয়ে পড়ল ওর বুকের উপর। নড়েচড়ে জুতসইভাবে বসল, দুই হাত দিয়ে খুঁজে নিল ওর গলাটা। দম বন্ধ হয়ে আসছে শহীদের। মাথার ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে যেন ও। হাত দুটো নাড়ার চেষ্টা করল ও। কষ্ট হচ্ছে বড়। একটু বাতাস! একটু তাজা বাতাস! মরিয়া হয়ে উঠছে মনটা। মরতে চাইছে না ও।

হাত দুটো উঠে এল শহীদের। শূন্যে যেন দুলছে দুটো হাতই। আস্তে আস্তে নামাল একটু। লোকটার গলায় গিয়ে ঠেকল। জোর পাচ্ছে না ও হাতে। ছেড়ে দিল গলাটা। নিঃশেষ হয়ে আসছে শক্তি। কিন্তু তাই বলে কি শেষ চেষ্টা করবে না ও?

দুর্বল হলেও ঘুসিটা লাগল লোকটার বাঁ চোখে। শহীদের গলায় হাত দুটো

একটু ঢিল হলো।

জোরে তাজা বাতাস নিল শহীদ। সাথে সাথে আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠল বুক। একটা হাত লোকটার মুখের উপর রাখল ও। আঙুলগুলো কি যেন খুঁজছে। লোকটার একটা চোখের নিচে স্থির হলো শহীদের দুটো আঙুল। শত্রু বিপদ টের পাবার আগেই একটি আঙুল ঢুকিয়ে দিল শহীদ। আঙুলটা বাঁকা করে বাইরে বের করে আনল ও মণিটা সহ। মৃত্যু যন্ত্রণায় শত্রু এমনই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল যে চিৎকার করারও শক্তি পাচ্ছিল না সে। দ্বিতীয় আঘাতটা খেয়ে সে বস্তার মত গড়িয়ে পড়ে গেল শহীদের বুকের উপর থেকে।

সুযোগটা গ্রহণ করল শহীদ। উঠে দাঁড়াল ও। পায়ের সাথে ধাক্কা লাগল যেন কিসের, জিনিসটা গড়াতে শুরু করল। শব্দ লক্ষ্য করে নিচু হয়ে হাত বাড়াল শহীদ। তুলে নিল মেঝে থেকে টর্চটা।

টর্চের আলোয় শহীদ দেখল দুই হাতে চোখ ঢেকে নিঃশব্দে পা ছুঁড়ছে শয়তান কুমার।

রিভলভারটা কুড়িয়ে নিল শহীদ। লক্ষ্যস্থির করে শয়তান কুমারের পাঁজরে সবুট লাথি মারল একটা, তারপর মাথা লক্ষ্য করে আরও একটা।

নিঃসাড় হয়ে গেল দেহটা।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল শহীদ।

চারদিক নিস্তব্ধ। বাড়ির কোথাও কোন শব্দ নেই। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কান ফাটানো শব্দ হলো। গুলির আওয়াজ। একবার···কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পর আর একবার।

তারপর আবার সব চুপচাপ, নিস্তব্ধ।

ছুটল শহীদ। প্যাসেজের অপর প্রান্তে একটা বাঁক দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই ছুটল ও। সিঁড়িটা খুঁজে বের করতে হবে।

গুলির শব্দ এসেছে দোতলা থেকে।

সাত

ক্রেপসোলের জুতো পায়ে, প্রায় নিঃশব্দে ছুটতে ছুটতে সিঁড়ির গোড়ায় এসে থামল শহীদ।

নেই, কোন শব্দ নেই। দুটো করে ধাপ টপকাতে টপকাতে উঠতে শুরু করল ও। মাঝখানে একবার থামল, তারপর সোজা উঠে গেল উপরে। ফাঁকা করিডর দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির মাথার কাছেই একটা দরজা, খোলা রয়েছে সেটা।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বারুদের গন্ধ লাগল নাকে। ভিতরে রক্তাক্ত দৃশ্য। বিছানাটার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল শহীদ। কিন্তু পরক্ষণে আবার তাকাল ও।

ভিতরে ঢুকল শহীদ।

লোকটা বাদশা খান, সন্দেহ নেই। চেহারার বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে হুবহু।

চেয়ে আছে শহীদের দিকে। চেহারায় ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। যেন দম বন্ধ করে আছে সে।

করার কিছু নেই শহীদের। ·৪৫ পিস্তলের বুলেট, বাদশা খানের ক্ষতগুলো দেখেই বুঝল ও।

পেটের নাড়িভুঁড়ি দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বুলেটটা বেরোয়নি, এখনও আছে বুকের মাঝখানটায়।

চোখের দিকে তাকাতে বাদশা খান কি যেন ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করল। কাছে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। ঘামছে ও। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য—সহ্য করা যায় না। লোকটার জীবনী শক্তির তুলনা হয় না। এখনও বেঁচেই নেই শুধু, হাতটাও নাড়ছে সে।

বাদশা খান হাত সামান্য একটু উঁচু করে একটা আলমারির দিকে ইঙ্গিত করছে।

শহীদ আলমারির দিকে তাকাল। কিন্তু সেদিকে পা না বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল বাদশা খানের মুখের উপর। চিৎকার করে জানতে চাইল, 'কে গুলি করেছে তোমাকে?'

বাদশা খানের বাকশক্তি ফুরিয়ে গেছে। কথা বলার চেষ্টাই করল না সে। চোখ দুটো বুজে আসছে তার। কিন্তু হাতটা সে তখনও নাড়ছে আলমারিটার দিকে।

'কি আছে আলমারিতে!'

মাথাটা একপাশে কাত হয়ে গেল বাদশা খানের। শেষ।

আলমারিটা তালা বন্ধ। বালিশের নিচেই পাওয়া গেল চাবিটা। তালা খুলে ফেলে ভিতরটা সার্চ করতে শুরু করল শহীদ। একটা ডায়েরী পাওয়া গেল। আর কিছু না। দ্রুত কয়েকটা পাতা উল্টে দেখে নিল ও। ডায়েরীটা বাদশা খানেরই। পকেটে ভরে দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

পদশব্দ এবং উত্তেজিত শোরগোলের শব্দ ভেসে আসছে নিচের দিক থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। এগিয়ে আসছে শব্দ। ইন্সপেক্টর গনির গলা শোনা যাচ্ছে। সিঁড়িতে উঠে পড়েছে…বুট জুতোর ভারি শব্দ উঠে আসছে…।

দরজাটা ঝট্ করে বন্ধ করে দিল শহীদ। ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে দিল।

'এদিকে এসো, শহীদ।'

চেনা কণ্ঠস্বর। সবেগে ঘুরে দাঁড়াতেই খোলা জানালার বাইরে কালো আলখেল্লা পরিহিত একটি মূর্তিকে দেখতে পেল শহীদ। মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেল আমার। কারণ, খুনীর পিছু পিছু ধাওয়া করে দেখে আসতে হলো কিনা তার বাড়িটা।'

'কে…?'

ইন্সপেক্টর গনির বজ্রকণ্ঠ ভেসে এল করিডর থেকে, 'ভেতরে যেই থাকো, দরজা খোলো বলছি! তা নাহলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকব আমরা।'

সেই সাথে দরজার গায়ে বুটের আঘাত হলো।

কুয়াশা বলল, 'সরে দাঁড়াও শহীদ।'

কুয়াশার হাতে একটা পিচকারির মত যন্ত্র দেখা যাচ্ছে। সাদা একটা বোতাম রয়েছে পিচকারির মাঝখানে। জানালায় শিকের দিকে মুখ করে বোতামটায় চাপ দিতেই পানির মত তরল পর্দাথ বেরিয়ে এল। ভিজে গেল শিকগুলো।

যন্ত্রটা পকেটে ভরে কুয়াশা ভিজে লোহার শিকগুলো ধরে মৃদু টান দিতেই পাটখড়ির মত মট্ মট্ করে ভেঙে গেল একটা একটা করে।

'বেরিয়ে এসো?'

মাথা গলিয়ে জানালার বাইরে, কারনিসে বেরিয়ে এল শহীদ।

লাফ দিয়ে উঠে গেল কুয়াশা ছাদের উপর। 'আমার হাত দুটো ধরো।'

শহীদকে টেনে তুলে নিল কুয়াশা ছাদের উপর। 'এসো।'

ছাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। সাথে সাথে শহীদও। চাঁদের আলোয় শহীদ দেখল পাশের বাড়ির ছাদটা কমপক্ষে সাত গজ দূরে। মাঝখানে শূন্যতা। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল একটা মোটা দড়ি এ-ছাদ থেকে ও-ছাদ পর্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে ঝুলছে।

'পারবে?'

শহীদ মাথা কাত্ করল। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল শূন্যে। ঝুলতে ঝুলতে আধহাত আধহাত করে এগোতে লাগল ও।

প্রকাণ্ড একটা কালো মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। দেখছে।

পাশের বাড়ির ছাদে পৌঁছে গেল শহীদ। এরপর কুয়াশা দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। শহীদের চেয়ে অনেক কম সময়ে দূরত্বটুকু অতিক্রম করল কুয়াশা।

অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল শহীদ, 'কার কথা বলছিলে তুমি, কুয়াশা? কে খুনী?'

আলখেল্লার পকেটে হাত ভরে একটা রিভলভার বের করল কুয়াশা। শহীদ দেখল রিভলভারটা অদ্ভুত আকৃতির, সামনের দিকে টেলিস্কোপ লাগানো।

'এটা রাখো তোমার কাছে। কিন্তু, সাবধান! ভুলেও তুমি এটা ব্যবহার করবে না। আমি আবার বলছি, কোন পরিস্থিতিতেই তুমি এটা ব্যবহার করতে যেয়ো না। তোমাকে দিচ্ছি, হয়তো এর দ্বারা উপকৃত হতে পারো—এই ভেবে।'

চেয়ে রইল শহীদ অবাক হয়ে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না ও।

'এই ছাদের শেষ মাথায় একটা বাঁশের মই পাবে তুমি। মইটা দোতলার বারান্দায় নেমে গেছে। ওখান থেকে একটা পাঁচিলে নামবে, পাঁচিলের ওপারেই নদীর পাড়।'

শহীদ বলল, 'তুমি···?'

'আমার সাহায্য দরকার তোমার, শহীদ?'

শহীদ হাসল। বলল, 'না। কুয়াশা, খুনীর পরিচয় অনুমান করতে পারছি আমি। ভাবছি তার কাছে এখুনি যাব কিনা।'

কুয়াশা বলল, 'তোমার আসলে বিশ্রাম দরকার। রাত এখন আড়াইটা। এক কাজ করো না, রীটা গোমেজের বাড়ি তো কাছে পিঠেই, ওর বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে নাও কয়েক ঘণ্টা। সকাল হলে···।'

নিঃশব্দে শহীদ চেয়ে রইল কুয়াশার দিকে।

আট

ঢং-ঢং, ঢং! রাত তিনটের ঘণ্টা পড়ল দূরের গির্জা থেকে।

কিচির্‌র্‌! কিচির্‌র্‌! বোতামটা চেপে ধরতে ভিতর থেকে কলিংবেলের শব্দ ভেসে এল। ঘুমিয়ে আছে বেচারী! এত রাতে, প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, ঘুম না ভাঙালেই ভাল হত।

চোখ দুটো ভারি হয়ে আসছে শহীদেরও। ঘুম পাচ্ছে নাকি? না। ঘুমে নয়, শোকে। মনে পড়ছে শিল্পীর কথা। মনে পড়ছে জামানের কথা।

ওদের অকাল মৃত্যুর ব্যাপারটা নিয়ে দু'দণ্ড মন খারাপ করার অবসরও পায়নি ও। খুনীকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে সে সুযোগও দিতে পারেনি সে।

খুনীর পরিচয় এখন জানা গেছে। সন্দেহ এখনও আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এখনও কয়েকটা জিনিস আবছা আবছা ঠেকছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না—তবু, খুনীকে চিনতে ভুল হয়নি ওর।

'কে?' বিরক্তিতে ভরপুর কণ্ঠস্বর রীটার। ঘুমে জড়ানো।

শহীদ নিচু স্বরে বলল, 'আমি, রীটা। আমি শহীদ। এত রাতে তোমাকে বিরক্ত করছি...'

দরজা খুলে দিয়ে রীটা গোমেজ আপাদমস্তক দেখে নিল শহীদের। উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইল, 'ওহ্, গড! আপনি! কোন দুঃসংবাদ নিয়ে...'

'না। আমি খুব ক্লান্ত। একটা খবর পেয়ে আসতে হয়েছিল এত রাতে এদিকে। এতই ক্লান্ত আমি যে ড্রাইভ করে ধানমণ্ডিতে ফেরার শক্তি পাচ্ছি না শরীরে।'

'আসুন, আসুন! কি সাংঘাতিক, আপনি। এমন খাটা-খাটনি করলে যে স্রেফ মারা পড়বেন। দাঁড়ান, সকালেই আমি মহুয়াদির কাছে যাচ্ছি...'

পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল রীটা গোমেজ, পাশ ঘেঁষে এগোল শহীদ ছোট্ট বারান্দার উপর দিয়ে।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে মাত্র দুই কামরার একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে রীটা গোমেজ। ড্রয়িংরুমের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল শহীদ। পিছন পিছন রীটা গোমেজ।

'খাবেন কিছু?'

শহীদ বসল একটা গদি মোড়া চেয়ারে। দামী আসবাবে সুন্দর ভাবে সাজানো রুমটা। প্রশংসার দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখল শহীদ। বলল, 'সুন্দর। কিছু বললে?'

'কিছু খাবেন?'

'কফি হলে ভাল হয়।' কয়েক সেকেণ্ড পর শহীদ আবার বলে উঠল, 'না, থাক। একটু পর। রীটা, বসো আমার সামনে। তোমার সাথে আমি দু'একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। একের পর এক হত্যাকাণ্ড, বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—মাথাটা ঠিক রাখতে পারছি না। কেউ নেই যার সাথে আলোচনা করে গিটগুলো খুলতে পারি। রীটা, শোনো আমার কথাগুলো।'

রীটা বসল। বলল, 'আপনাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। শুয়ে পড়ুন না বরং?'

শহীদ সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক বলেছ। শোয়াই ভাল। চলো, তোমার বেডরুমে যাই।'

পা বাড়িয়ে মধ্যবর্তী দরজা অতিক্রম করে বেডরুমে ঢুকল শহীদ।

সিঙ্গেল একটা সেগুন কাঠের ফ্যান্সি খাট, বুক শেলফ, একটা বেতের চেয়ার, তেপয়, টেলিফোন, শো-কেস—মাঝারি আকারের বেডরুমটা এইসব দিয়ে সাজানো।

'শুয়ে শুয়ে আলোচনা করি। তুমি চেয়ারে বসো।'

বসল রীটা। শহীদ শুলো না, বসল খাটের উপর। বলল, 'আরও একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। আরও একজন লোক খুন হয়েছে, রীটা।'

গালে হাত চাপা দিয়ে আঁতকে উঠল রীটা গোমেজ। 'কে?'

'বাদশা খান।'

পকেটের টেলিস্কোপ লাগানো রিভলভারটা অস্বাভাবিক বড় বলে উরুর মাংসে খোঁচা মারছে নড়তে-চড়তে। পকেট থেকে বের করে নেড়েচেড়ে দেখল শহীদ কিছুক্ষণ। তারপর রেখে দিল তেপয়টার উপর।

রীটা গোমেজ চেয়ে আছে শহীদের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। তারপর জানতে চাইল, 'কে তাকে···?'

'যে শিল্পী, দেলোয়ার মোরশেদ এবং রাফিয়াকে খুন করেছে, সে-ই। আচ্ছা তোমার ব্যাপারটা কি, রীটা? কিছু কিছু ব্যাপার গোপন রেখেছ তুমি আমার কাছ থেকে। কেন?'

মুচকি একটু হাসল রীটা গোমেজ। বলল, 'মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, শহীদ ভাই, যা সে স্মরণ করতে চায় না, ভুলে যেতে চায়। আমার জীবনেও তেমনি কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে অতীতে।'

শহীদ বাঁ পকেট থেকে পাইপ এবং টোবাকোর পাউচ বের করল। বলল, 'তা ঠিক। তবু আমাকে তুমি বলতে পারতে। রাফিয়া সুলতানার সাথে তোমার পরিচয় ছিল, তিক্ত সম্পর্ক ছিল—সম্পর্ক ছিল, একসময় মধুর, পরে তিক্ত, বাদশা খানের সাথেও।'

'প্রাচীনকালের ঘটনা সেসব। আপনি এসব কথা জানলেন কিভাবে, শহীদ ভাই?'

শহীদ পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে বলল, 'চট্টগ্রামের সাদী সাহেবকে মনে পড়ে তোমার?'

'পড়ে বৈকি। ফ্রেণ্ডশীপ নাইট ক্লাবের ম্যানেজার।'

'তার সাথে কথা হয়েছে আমার। তুমি ওখানে কিছুদিন কাজ করেছিলে।'

'হ্যাঁ।'

রীটা গোমেজ হাই তুলল, আবার বলল, 'কফি খেলে হত না? ঘুম পাচ্ছে যে।'

'ঠিক বলেছ। করো দু'কাপ কফি। একটা কথা না বলে পারছি না, রীটা। একসময় তো ভালবাসতে তুমি বাদশা খানকে। তার মৃত্যু সংবাদ শুনে তুমি কিন্তু দুঃখ পাওনি এতটুকু।'

'কেন পাব? আমার জন্যে কি করেছে সে, আমাকে কষ্ট দেয়া ছাড়া? তাছাড়া তার সাথে সব সম্পর্কের ইতি ঘটে গিয়েছিল বহুদিন আগেই। তার অস্তিত্বের কথাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আজ আপনি নতুন করে তার কথা মনে করিয়ে দিলেন।'

রীটা কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে পা বাড়াল কিচেনরুমে যাবার জন্যে বন্ধ একটা দরজার দিকে।

রীটা গোমেজ বেরিয়ে যেতে খাট থেকে নেমে পায়চারি শুরু করল শহীদ। আড়চোখে তাকাল কয়েকবার তেপয়ের উপর রাখা অদ্ভুত আকৃতির রিভলভারটার দিকে। হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল আবার। টেলিস্কোপটার অস্তিত্ব ওর মনে একটা খুঁত খুঁতে ভাব এনে দিয়েছে। রিভলভারটা শো-কেসের উপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে তুলে ধরল ও, লক্ষ্যস্থির করে টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে তাকাল। কিছুই দেখতে পেল না ও। এ কেমন টেলিস্কোপ—কিছুই দেখা যায় না কেন? তারপর, হঠাৎ, মৃদু হাসল ও।

বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল শহীদ রিভলভারটা। মাথার ভিতর আবার ঝড় বইতে শুরু করেছে।

পায়চারি শুরু করেই থমকে দাঁড়াল শহীদ।

কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। চাপা গলায়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রীটা গোমেজ কিচেন রুমে।

আহা বেচারী! বাদশা খানকে আসলে ভুলতে পারেনি সে।

আবার পায়চারি শুরু করল শহীদ। একসময় বসল বেতের চেয়ারটায়।

রীটা গোমেজ খানিক পর বেডরুমে ঢুকল। দুই হাতে দুই কাপ কফি। তেপয়ের উপর নামিয়ে রাখল সে একটা কাপ। তার চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠেছে, তাছাড়া বোঝার কোন উপায় নেই এইমাত্র কান্নাকাটি করেছে সে। ধীরে ধীরে নিজের কাপটা হাতে নিয়ে বসল সে বিছানার উপর।

নিঃশব্দে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে চিন্তা করছিল শহীদ মেঝের দিকে তাকিয়ে। কাপটা নিঃশেষ করে নামিয়ে রাখল সেটা তেপয়ের উপর। মুখ তুলল। দেখল রীটা গোমেজ চেয়ে আছে ওরই দিকে।

'আপনি সম্ভবত আমাকে জেরা করবেন এখন, শহীদ ভাই?' রীটা গোমেজ ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

মৃদু হাসল শহীদ। বলল, 'ঠিক জেরা নয়। আমি তোমার কাছ থেকে নতুন কিছু কথা শুনতে চাই। এতগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে—এই রহস্যের কিনারা আমাকে করতেই হবে। তোমাকে জেরা করে নতুন কিছুই হয়তো জানতে পারব না। তবে, বলা তো যায় না, তোমার দেয়া কোন তথ্য হয়তো এই রহস্য উন্মোচনে আলোকপাত করতে পারে। অন্তত খুঁত খুঁতে ভাবটা দূর হবে। আমার মনে হচ্ছে এই রহস্যের প্রায় সবটুকুই জানো তুমি, অন্তত আমার চেয়ে অনেক বেশি জানো। খুনী কে—এই প্রশ্নের উত্তর আমি চাই। হয়তো খুনীর পরিচয় জানার পরও আমার কিছু করার থাকবে না···।'

'তারমানে? খুনীর পরিচয় জানার পরও আপনার করার কিছু থাকবে না—একি বলছেন আপনি!'

শহীদকে গম্ভীর দেখাল, 'বললে বুঝতে পারবে কেন বলছি কথাটা। তোয়াব খান—তাঁকে আমি কথা দিয়েছিলাম, তাঁর কেসটার কথা পুলিসকে কিংবা নিজের লোক ছাড়া আর কাউকে বলব না। কথাটার মূল্য আমাকে রক্ষা করতে হবে, রীটা। খুনীকে আমি নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারি—কিন্তু সেটা আমার নীতিবিরোধী ব্যাপার। আমি আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করার জন্যে আজ পর্যন্ত গুলি করিনি। সুতরাং, খুনীকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারছি না আমি। আর একটা উপায় আছে। পুলিসের হাতে তাকে তুলে দিতে পারি গ্রেফতার করে। কিন্তু তাতেও বিরাট বাধা রয়েছে। ইন্সপেক্টর গনি খেপে আছে আমার ওপর। খুনীকে তার হাতে তুলে দিতে গেলেই সে এতগুলো হত্যাকাণ্ডের বিশদ ব্যাখ্যা দাবি করবে। চুপ করে থাকা তখন সম্ভব হবে না। তোয়াব খানের কথা তখন আমাকে বলতেই হবে। কিন্তু তা আমি চাই না। আমার ধারণা, খুনীর পরিচয় তুমি জানো, রীটা। জানলে, বলো। সে যদি তোমার প্রিয়পাত্র কেউ হয়—ভয় নেই, তাকে আমি শহর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলব শুধু—তার বিরুদ্ধে আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই।'

'আপনি অনুমান করতে পারছেন না কে খুনী?'

শহীদ বলল, 'অনুমান করা আর নিঃসন্দেহে জানা দুটো আলাদা ব্যাপার, রীটা। বাদশা খান জানত খুনী কে—তাই তাকে মরতে হলো। বাদশা খান খুন করেছিল জামানকে। কিন্তু বাদশা খান শিল্পীকে খুন করেনি। দেলোয়ার মোরশেদও জানত খুনীর পরিচয়—তাই তাকেও খুন করেছে খুনী। তুমিও জানো, রীটা, খুনী কে। এবার হয়তো তোমার পালা। খুনী তোমাকে খুন করবে এবার। তার চেয়ে, রীটা, বলে দাও, বলে দাও কে সে, কি তার পরিচয়।'

হাত বাড়িয়ে খালি কাপটা রাখল রীটা তেপয়ের উপর।

'আমি জানি—কিভাবে বুঝলেন আপনি?'

শহীদ হাসল, 'অনুমানে জেনেছি। আমার ধারণা রাফিয়া সুলতানা নিহত হবার পর তোমার সাথে দেখা হয় বাদশা খানের। পুরানো মধুর সম্পর্কটা জোড়া লাগে আবার। বাদশা খানকে রাফিয়া যা যা বলেছে, নিশ্চয়ই সে তোমাকে জানিয়েছে সেসব কথা।'

রীটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন শহীদ ভাই! কথাগুলো বলতে চাইনি···কি লাভ! যাক, সে যখন খুনই হয়েছে—কিছু এসে যায় না আর এখন। মিথ্যে কথা বলেছি খানিক আগে আমি, শহীদ ভাই। আসলে বাদশাকে আমি ভুলতে পারিনি। তাকে আমি আজও ভালবাসি। সে মরে গেছে, তবু তার প্রতি আমার ভালবাসা থাকবে। বেশ ছিলাম আমরা, কিন্তু ওই রাফিয়া ডাইনীটা আমাদের দু'জনের মাঝখানে এসে পড়ায় সব ধসে পড়ল হুড়মুড় করে। বাদশা ভুলে গেল আমাকে, ঝুঁকে পড়ল ওই ডাইনীটার দিকে। ফেরাতে কম চেষ্টা করিনি আমি বাদশাকে। কিন্তু পারিনি। ফেরেনি সে রাক্ষসীটার মায়া ছেড়ে। তারপর···ওই ধরনের মেয়েরা যা করে তাই করল ডাইনীটা। আমার কাছ থেকে বাদশাকে ছিনিয়ে নিয়ে অল্প কয়েকদিন ফূর্তি করল সে, তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করল মোহাম্মদ তোয়াব খানকে। বিয়ে করে ওকে যখন তোয়াব সাহেব ঢাকায় আনেন

আমি তখন এখানেই রয়েছি। একদিন একটা পার্টিতে দেখি আমি ডাইনীটাকে। কৌতূহলী হয়ে খোঁজ খবর নিতে থাকি। জানতে পারি, বাদশা খানকে ডিভর্স না করেই সে বিয়ে করেছে তোয়াব সাহেবকে। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাটা দমন করতে পারিনি আমি। আমার জীবনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমার সুখ, আনন্দ, স্বস্তি সব পুড়িয়ে দিয়েছিল সে। আমিও ওর জীবনে আগুন ধরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিই। নাম ঠিকানা না দিয়ে আমি একটা চিঠি লিখি তোয়াব সাহেবকে। চিঠিতে জানাই, রাফিয়ার স্বামী আছে, তার নাম বাদশা খান।'

শহীদ শুনছে গভীর মনোযোগের সাথে।

'শুধু তাই নয়, আমি বাদশাকেও জানাই চিঠির কথাটা। বাদশা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ঢাকায় আসে সে রাফিয়ার সাথে দেখা করার জন্যে। এদিকে রাফিয়া তোয়াব সাহেবের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েছিল অল্প ক'দিনেই। একজন বুড়োর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কতদিন সম্ভব, বলুন? বিশেষ করে ওই রাক্ষসীর পক্ষে? তাই নতুন এক ছোকরার সাথে মেলামেশা শুরু করেছে সে তখন।'

'সাধন সরকার?'

'হ্যাঁ। রাফিয়া আগেই খবর পায়, বাদশা তার সাথে দেখা করতে আসছে। ভয় পেয়ে যায় সে। কারণ, সে ধরে নিয়েছিল বাদশা নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে তাকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। ভয় পেয়ে সে আশ্রয় নেয় ফেয়ারভিউ নাইট ক্লাবে, কাজী হানিফের কাছে। এসব কথা আমাকে বলেছে বাদশা নিজেই। রাফিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে এসব কথা বাদশাকে বলে গেছে। আপনার সহকারিণী, শিল্পী—তাকে ভুল করে গুলি করা হয়।'

মেঝেতে পা দুটো লম্বা করে দিয়ে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে শহীদ। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রেখেছে লম্বা কালো পাইপটা। নিভে গেছে সেটা কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই একবিন্দু।

'তোয়াব সাহেব আমার চিঠিটা রাফিয়াকে দেখিয়ে আসল ব্যাপার কি জানতে চান। মিথ্যেকথা বলে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে রাফিয়া। কিন্তু তোয়াব সাহেব তার কথা বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস যে করেননি তা রাফিয়াও বুঝতে পারে। তোয়াব সাহেব তাকে সেই মুহূর্তে খুন করতে গিয়েছিলেন···রাগে, ঘৃণায় তিনি উন্মাদের মত হয়ে উঠেছিলেন। রাফিয়া আতঙ্কে পালিয়ে আসে তাঁর কাছ থেকে। ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে সে, গাড়ি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। সেই রাতেই সে আপনার অফিসে গিয়েছিল। গিয়েছিল শিল্পী কেন তাকে অনুসরণ করছে এবং তোয়াব সাহেব সাধন সরকারের সাথে তার সম্পর্কের কথাটা জানেন কিনা জানার জন্যে। আপনার অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে সে দেখে আর একটা গাড়ি নিয়ে তোয়াব সাহেব তাকে অনুসরণ করছেন। আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে সে। গাড়ি থামিয়ে শিল্পীর মুখোমুখি হয়। শিল্পীও তাকে অনুসরণ করছিল সে সময়। শিল্পীকে অনুরোধ করে সে আশ্রয় দেবার জন্যে। শিল্পী তাকে সাথে করে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। তোয়াব সাহেব শিল্পীর ফ্ল্যাটের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। রাফিয়া শিল্পীকে নিজের গলায় পাথর বসানো নেকলেসটা ঘুষ হিসেবে দিতে চায়, যদি শিল্পী নিজের পরনের কাপড় তাকে দেয় এবং তার পরনের কাপড়

শিল্পী নিজে পরে—এই শর্তে। শিল্পী রাফিয়ার কাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে যাবে, তোয়াব সাহেব অন্ধকারে তাকে রাফিয়া মনে করে অনুসরণ করবেন, সেই ফাঁকে রাফিয়া ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নেবে কাজী হানিফের নাইটক্লাবে—এই ছিল পরিকল্পনা। শিল্পীকে অসৎ বলা চলে না। মেয়ে মানুষ, গহনার প্রতি স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ থাকেই। সে প্রস্তাবটা গ্রহণ করে। রাফিয়ার শাড়ি ব্লাউজ পরে সে বেরিয়ে যায় বাইরে। তোয়াব খান তাকে রাফিয়া মনে করে অনুসরণ করতে শুরু করেন। রাফিয়া এই সুযোগে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রওনা হয় কাজী হানিফের নাইটক্লাবের উদ্দেশে। নিরাপদেই সেখানে পৌঁছায় সে। কিন্তু বিপদ হয় শিল্পীর। তোয়াব খানের চোখে ধুলো দেবার জন্যে শিল্পী লেকের ধারে যায়। কিন্তু ধুলো সে দিতে পারেনি তোয়াব সাহেবের চোখে। তিনি তাকে অনুসরণ করতে থাকেন। লেকের ধারে পৌঁছে তিনি গুলি করেন শিল্পীকে। এসব তো আপনিও হয়তো অনুমান করে রেখেছেন আগেই, তাই না? দেলোয়ার মোরশেদকে তোয়াব সাহেবই খুন করেন। শিল্পীর দেহ থেকে কাপড় খুলে নিচ্ছিলেন তোয়াব সাহেব, হেদায়েত তা দেখতে পায়। পরে সে তোয়াব সাহেবকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে।'

'এত কথা তুমি জানলে কিভাবে?'

'রাফিয়া ফেয়ার ভিউয়ে থাকার সময় বাদশাকে একটা চিঠি লিখে সব কথা জানায়, বাদশা আমাকে বলেছিল পরে।'

শহীদ পাইপে আগুন ধরাল, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সাধন সরকারের বাড়িতে গেল কিভাবে শিল্পীর কাপড়-চোপড়?'

'রাফিয়া পরেছিল ওগুলো। ফেয়ার ভিউয়ে যাবার আগে সে সাধন সরকারের বাড়িতে যায়। সাধন সরকার সে রাতে ঢাকায় ছিল না, ছিল নারায়ণগঞ্জে। অবশ্য বাড়ির ভিতর ঢুকতে অসুবিধে হয়নি রাফিয়ার। একটা চাবি তার কাছে সব সময়ই থাকত। বাড়িটায় তার কাঁপড়-চোপড়ও ছিল অনেকগুলো। তালা খুলে ভিতরে ঢুকে শিল্পীর কাপড় ছাড়ে সে, পরে নিজের রেখে যাওয়াগুলো। তারপর ফেয়ার ভিউয়ে যায়। আপনি তাকে সেখানে আবিষ্কার করেন। এরপর কাজী হানিফ তাকে তাড়িয়ে দেয়। রাস্তায় বেরিয়ে আসে সে—কিন্তু যাবার জায়গা ছিল না তার। তোয়াব সাহেব তখনও তাকে খুঁজছিলেন। তাই সে আপনার অফিসে যায়। আপনি তখন তোয়াব সাহেবের কাছে ছিলেন। তোয়াব সাহেব হয়তো সন্দেহ করেছিলেন আপনি তাঁর অপরাধের কথা জানতে পেরেছেন, তাই আপনাকে খুন করার জন্যে তিনি আপনার অফিসে আসেন। কিন্তু তিনি পৌঁছেই আপনাকে নয়, দেখেন রাফিয়াকে। গুলি করেন তিনি সাথে সাথে। এদিকে বাদশাও খুঁজছিল রাফিয়াকে। সে আপনার সাথে দেখা করে রাফিয়ার সন্ধান নেবার কথা ভাবে। আপনার অফিসে সে-ও পৌঁছায়। কিন্তু অল্প দেরি হয়ে যায় তার পৌঁছতে। তোয়াব সাহেব তখন পালাচ্ছিলেন। ওদের দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়, তোয়াব সাহেব নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে যান। যাবার সময় তিনি তাঁর রিভলভারটা ফেলে যান। ঠিক এই সময় আপনি পৌঁছান। ইতিমধ্যে বাদশার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেছে। সে তোয়াব সাহেবকে ব্ল্যাকমেইল করে অগাধ টাকা আদায়ের পরিকল্পনা করে। তিনি যে রিভলভারটা ফেলে যান তাতে তাঁর নাম খোদাই করা ছিল। এই রিভলভার

দিয়েই খুন করা হয় শিল্পীকে, হেদায়েতকে এবং রাফিয়াকে। বাদশা আপনাকে পিছন থেকে আক্রমণ করে আহত করে, আপনি জ্ঞান হারান। রাফিয়ার লাশ কাঁধে নিয়ে আপনার অফিসের পিছনে দাঁড় করানো গাড়িতে গিয়ে ওঠে সে, সোজা পৌঁছয় ডাক্তার সজীব কুমারের বাড়িতে। সেখান থেকে ফোন করে আমাকে। আমাকে সে আপনার অফিসে যেতে বলে, আপনার মুভমেন্ট এবং রিয়্যাকশনের ওপর নজর রাখার জন্যে।'

রীটা ঠোঁট বাঁকা করে হাসল একটু। বলল আবার, 'সবই তো বললাম। বাকিটা আপনি কল্পনা করে বুঝে নিন। ইতিমধ্যেই বাদশা তোয়াব সাহেবের সাথে দেখা করেছিল। দশ লাখ টাকা ক্যাশ দাবি করে সে। তা নাহলে, ভয় দেখায়, রাফিয়ার লাশ এবং রিভলভারটা সে তুলে দেবে পুলিসের হাতে।'

'তুমি বলতে চাইছ সেই টাকা দেবার জন্যেই তোয়াব সাহেব ডাক্তার সজীবের বাড়িতে বাদশার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল আজ রাতে, এবং টাকা না দিয়ে সরাসরি খুন করে বাদশাকে?'

মাথা নেড়ে রীটা বলল, 'হ্যাঁ।' অন্যদিকে তাকাল সে। যেন একটা কান্নার বেগকে দমন করার চেষ্টা করছে। অন্য দিকে তাকিয়েই সে বলে উঠল, 'বাদশাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, তোয়াব সাহেব ভয়ঙ্কর লোক। কিন্তু আমার কথায় কান দেয়নি সে।'

শহীদ অকস্মাৎ তড়াক করে লাফিয়ে চেয়ার ছাড়ল। দুই লাফে গিয়ে দাঁড়াল সে ড্রয়িংরুমের ভিতর।

'কি হলো!'

খাট থেকে নেমে পা বাড়াল রীটা।

'কার যেন পায়ের শব্দ শুনলাম! কেউ বোধহয় রুমের বাইরে থেকে আমাদের কথা শুনছিল। পালিয়ে গেল।

বেডরুমে ফিরে এল শহীদ। বসল আবার চেয়ারে। রীটাও বসল খাটের উপর আবার।

'আপনি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন,' নিচু গলায় বলল রীটা।

শহীদ বলল, 'একমাত্র তুমি এবং আমি জানি তোয়াব সাহেবই এত সব কাণ্ডের হোতা। তিনিই খুনী। কিন্তু কথাটা তুমি এবং আমি—আমরা দু'জনেই বিশ্বাস করি না। তাই না, রীটা?'

'বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি। বাদশা আমাকে সব কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না বললে আমি নিজেই বিশ্বাস করতাম না।'

শহীদ বলল, 'বাদশা কি বলেছে না বলেছে—এতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি না আমি। আমি একজন ডিটেকটিভ, রীটা। আমার চোখে শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বিছানাটার দিকে তাকাও, তাকাও বালিশটার দিকে। আজ রাতে ওই বিছানায় শোওনি তুমি, ওই বালিশে মাথা রাখোনি তুমি। রক্ত মাখানো শাড়ি আর ব্লাউজটা, আমি হঠাৎ এসে পড়ায়, তুমি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছ খাটের নিচে। কিন্তু কি ভাগ্য দেখো তোমার, আমি এই চেয়ারে বসে বসে দেখতে পাচ্ছি শাড়ি আর ব্লাউজটা। তোমার স্যাণ্ডেলের কথা তুমি ভুলে গেছ। চেয়ে দেখো, রক্তের দাগ

লেগে রয়েছে ওতে।'

ঝট্ করে নিজের ঝুলন্ত পায়ের দিকে তাকাল রীটা। হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে তার। স্যাণ্ডেল দুটো সরিয়ে রাখেনি সে।

'কি বলছেন আপনি, শহীদ ভাই! রক্তের দাগ? বলছি দাঁড়ান ঘটনাটা। আপনি দেখছি ভীষণ খুঁত-খুঁতে মানুষ। কারও শাড়িতে, জুতোয় রক্তের দাগ দেখলেই বুঝি তাকে খুনী মনে করতে হয়? জানি, মিছামিছি ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন আমাকে···।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো শহীদের। কিন্তু হাসল না ও। কঠিন হয়ে উঠল ওর চেহারা। বলল, 'ন্যাকামি ছাড়ো এবার, রীটা। জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন আমার কাছে সব রহস্য। তুমি যে গল্পটা একটু আগে শোনালে, তা প্রায় ঠিকই আছে—শুধু তোয়াব সাহেবের জায়গায় তোমার নিজের নামটা বসবে। রাফিয়া মনে করে শিল্পীকে খুন করেছ তুমি। মোরশেদ দেখেছিল তোমাকে শিল্পীর দেহ থেকে কাপড় খুলে নিতে, পরে সে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে তোমাকে, তাই তাকে গুলি করো—তুমিই। রাফিয়াকে ঘৃণা করতে, কারণ সে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল বাদশাকে, তাই তাকেও খুন করো—তুমিই। ডাক্তার কুমারের বাড়িতে যাও আজ রাতে তুমি এবং বাদশাকে খুন করো—তুমি ছাড়া আর কে? বাদশাকে তুমি খুন করো, কারণ···'

থামল শহীদ। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে ও রীটা গোমেজের ফ্যাকাসে মুখের দিকে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল আবার শহীদই, 'বলো, রীটা—বাদশাকে খুন করার পিছনে কি কারণ ছিল?'

নয়

পা ঝুলিয়ে খাটের উপর বসে আছে রীটা। হাত দুটো দেহের দু'পাশে, খামচে ধরেছে ধবধবে সাদা চাদর মুঠোর মধ্যে। চোখে পলক নেই। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত তালে। নাকের নিচে, ঠোঁটের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম, চকচক করছে ইলেকট্রিক আলোয়। চুলগুলো অল্প অল্প উড়ছে ফ্যানের বাতাসে। কিন্তু নিঃসাড়, মূর্তি যেন সে একটা।

'আপনি সিরিয়াস, শহীদ ভাই?'

'চমৎকার অভিনয় করে এসেছ এতক্ষণ, রীটা। যেভাবে নিজেকে সকলের সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে পেরেছ—আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। আমার গোয়েন্দা জীবনে তুমি একটা অভিজ্ঞতা বটে। কিন্তু আর নয়, রীটা। খেলা শেষ হয়ে গেছে। ছদ্মবেশ ত্যাগ করো, অভিনয়ে ক্ষান্ত দাও এবার। তোয়াব সাহেবকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্যে যেভাবে গল্পটা বানালে—অপূর্ব। বিশ্বাস না করাই অসম্ভব বলে মনে হয়। তারপর—খানিক আগে কিচেনে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে—নাহ্, তোমার অভিনয়ের তুলনা হয় না। কিন্তু কি জানো, শেষ রক্ষা হলো না। আসলে হয়ও না। অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে পেতেই হয়। এটাই বিধির আমোঘ বিধান। যাক,

শেষ রহস্যটা জানা দরকার আমার। বাদশাকে খুন করলে কেন, রীটা?'

'না। বলেছি তো আপনাকে। ওকে আমি খুন করিনি। ওকে কেন আমি খুন করব? যাকে মানুষ ভালবাসে তাকে কি সে খুন করতে পারে, শহীদ ভাই? তোয়াব সাহেবই ওকে খুন করেছেন। আপনি ভুল করছেন। ভেবে দেখুন আবার।'

শহীদ দেখল রীটা গোমেজের দুই চোখ থেকে জলের ধারা বেরিয়ে আসছে, গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে টপ টপ করে কোলের উপর। চেয়ে আছে সে মেঝের দিকে।

হাসল শহীদ। বলল, 'একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, রীটা। সে কথা শুনলে তুমি বুঝতে পারবে, আর অভিনয় করে লাভ নেই। বাদশা খানের ডায়েরীটা আমি পেয়েছি। মরার আগে সে ডায়েরীটা আমাকে উপহার দিয়ে গেছে। পড়েছি আমি সেটা। বাদশা খান তাতে লিখে রেখে গেছে অনেক মূল্যবান কথা—সবগুলো তোমার বিরুদ্ধে। রাফিয়া তোমাকে যমের মত ভয় করত। তার সন্দেহ ছিল তুমি তাকে গুলি করে খুন করবে। পিস্তল ব্যবহার করতে জানো তুমি। ফ্রেণ্ডশীপ নাইট ক্লাবে তুমিও পিস্তলের কয়েক রকমের খেলা দেখাতে। ·৪৫ পিস্তল তুমি ব্যবহার করতে অভ্যস্তা। বাদশা খান তার ডায়েরীতে নিজের বিশ্বাসের কথাটাও লিখে রেখে গেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, রাফিয়াকে তুমিই খুন করেছ। আরও অনেক কথা লিখে রেখে গেছে বাদশা তার ডায়েরীতে। সে সব পরে না হয় শোনাব তোমাকে। তার আগে বলো বাদশাকে খুন করার কি প্রয়োজন ছিল?'

'কুত্তাটা ডায়েরী রাখত নাকি!'

'রাখত। না রাখলেও কিছু এসে যেত না। ধরা তোমাকে পড়তেই হত, রীটা। হয়তো আরও কিছু সময় লাগত। বলো এবার।'

রীটা সরাসরি তাকাল শহীদের চোখের দিকে। শান্ত সহজ গলায় বলে উঠল, 'কেন খুন করেছি? উত্তরটা খুবই সহজ। ওকে খুন না করার তো কারণ ছিল না। আমার জীবনটা ধ্বংস করেছে কে? ওই তো! এতগুলো খুন একটার পর একটা করতে হয়েছে আমাকে—কেন? ওর জন্যেই তো। ও যদি রাফিয়া ডাইনীর ফাঁদে পা না দিত—এত কিছু ঘটত? একের পর এক খুন করেছি আমি—কুকুরটাকে পেলেও কি সুখী হতে পারতাম? ওকে বাঁচিয়ে রাখলে লাভের চেয়ে লোকসানের ভয়ই বেশি ছিল না? বেঁচে থাকলে আমাকে ও ভয় করে চলত। হয়তো পুলিসকে জানিয়ে দিত সব কথা। এতগুলো খুন করে সন্দেহের বাইরে থাকতে পেরেছি, আর একটা খুন করলে কি আসে যায়। এই সব ভেবেই ওকেও শেষ করে দিয়েছি আমি। শিল্পী—শিল্পীর জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। চাঁদের আলোয় ওকে আমি চিনতে পারিনি। রাফিয়ার পোশাক পরা অবস্থায় দেখে ওকে আমি রাফিয়া মনে করেছিলাম।'

'ভুল করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে, খুন তো করেছ তুমি? শিল্পীর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেই আমি সিরিয়াস, রীটা। সে আমার সহকারিণী ছিল। এই অপরাধের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।'

শান্ত গলাতেই রীটা গোমেজ বলল, 'পেতে হবে বললেই তো হলো না। একটার পর একটা খুন করে আমি ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকেছি—এখন সব স্বীকার

করেও আমি আপনার বা পুলিসের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থাকব।'

খপ্ করে বিছানার উপর থেকে টেলিস্কোপ লাগানো রিভলভারটা তুলে নিল রীটা গোমেজ। 'সাবধান, শহীদ ভাই! নড়বেন না! ·৪৫ রিভলভার এটা। কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানা আছে আমার।'

জোরে শ্বাস গ্রহণ করে সিধে হয়ে বসল সে, আবার কথা বলে উঠল, 'শিল্পীর জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। দুঃখিত আমি আপনার জন্যেও। কিন্তু উপায় নেই, শহীদ ভাই। এত বিপদের মধ্যেও আমি মাথা ঠিক রেখে যেটা করার, তা যতই নিষ্ঠুর-নির্মম হোক, করেছি। কেন? শুধু নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। এই মুহূর্তেও আমি তাই করব। নিজের প্রাণটা সব কিছুর চেয়ে প্রিয়, শহীদ ভাই। সেই প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই আপনাকে এখন খুন করতে হবে। আমি এতগুলো খুন করেছি কিন্তু কারও কাছে কোন প্রমাণ নেই একটাও! তবু আপনাকে আমি খুন করব। কারণ কি জানেন? প্রমাণ নেই ঠিক, কিন্তু আপনি জানেন আমি কিভাবে কি করেছি—একমাত্র আপনিই জানেন। চেষ্টা করলে আপনি আমার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন। শহীদ ভাই, তাই আপনাকে মরতে হবে। চেয়ার ছাড়ুন, শহীদ ভাই। দাঁড়ান। ওই দেয়ালের গায়ে পিঠ রেখে, মাথার পিছনে হাত রেখে দাঁড়ান। আমাকে সুটকেস গুছিয়ে নিতে হবে।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শহীদ। পিছিয়ে গেল।

'না, আমার দিকে চেয়ে থাকবেন না। দেয়ালের দিকে মুখ করুন।

দু'জনের মাঝখানে রয়েছে সাত হাত দূরত্ব। মাঝখানে তেপয়টা রয়েছে। তেপয়ের উপর রয়েছে রিভলভারটা। লাফ দিয়ে লাভ নেই, তার আগেই মরতে হবে গুলি খেয়ে।

দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল শহীদ। বাঁ দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ড্রেসিং টেবিলটা দেখতে পেল।

আয়নায় দেখা যাচ্ছে রীটাকে। তেপয়ের উপর রিভলভারটা রেখে শাড়ি খুলছে সে।

নতুন একটা শাড়ি পরতে শুরু করল রীটা। ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে শহীদের দিকে। ব্যস্ততার সাথে কাপড় পরার কাজটা সারতে চাইছে সে। কিন্তু হাত দুটো অদম্য ভাবে কাঁপছে বলে দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেক।

'কোথায় যাবে তুমি? কোথায় পালাবে?'

স্থির হয়ে গেল রীটার হাত দুটো। 'কোথায় যাব বলব না।'

দ্রুত কোমরে শাড়ি জড়াচ্ছে রীটা।

এমন সময়!

পিছন ফিরে দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই লাফ দিল শহীদ। শূন্যে ঘুরে গেল এক পাক ওর দেহটা। মেঝেতে পা দিল ও।

পরমুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা। ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিয়েছে রীটা গোমেজ তেপয়ের উপর থেকে রিভলভার। কথা যতই বলুক, শহীদের এইরকম আচরণের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি ছিল সে।

শহীদ দ্বিতীয়বার লাফ দেবার আগেই গর্জে উঠল রীটা গোমেজের হাতের

রিভলভার। স্থির দাঁড়িয়ে রইল শহীদ।

সোজা শহীদের বুকের দিকে তাক করে গুলি করেছে রীটা। লক্ষভ্রষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—কিন্তু হয়েছে তাই। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল শহীদ, ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি।

বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল শহীদের।

মেঝের উপর পড়ে রয়েছে রীটা।

কলকল শব্দে তাজা লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে রীটার বুকের প্রকাণ্ড গর্তটা থেকে। ফুটো নয়, গভীর গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে রীটা গোমেজের বুকের মাঝখানে।

চেয়ে আছে শহীদ। রীটার হাতটা দু'তিন ইঞ্চি উপরে উঠল আস্তে আস্তে, তারপর ঝুপ্ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

শেষ।

মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা রিভলভারটার দিকে তাকাল শহীদ। টেলিস্কোপের প্রান্ত থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প অল্প।

রিভলভারটা সাধারণ রিভলভার নয়। কৌশলে তৈরি করা হয়েছে এটা। সেজন্যেই কুয়াশা ওকে এটা দেবার সময় নিষেধ করে দিয়েছিল ব্যবহার না করার জন্যে। এই রিভলভার যে ছুঁড়বে সে নিজেই খুন হবে, তার নিজের গায়েই লাগবে গুলি। ইচ্ছে করেই বিছানার উপর রেখেছিল শহীদ রিভলভারটা। রীটাকে নিজের হাতে খুন করা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। অথচ তার শাস্তি হওয়া দরকার ছিল। পুলিসের হাতে তুলে দেয়া যেত, কিন্তু পুলিস অভিযোগগুলো প্রমাণ করতে পারত না। এইসব কথা ভেবেই শহীদ রীটাকে রিভলভারটার ফাঁদে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে সে নিজেই খুন করে নিজেকে।

বিড়বিড় করে কি যেন বলল ও। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিস্তব্ধ চারদিক। পুবাকাশ আলোকিত হয়ে ওঠার সময় হয়ে এসেছে।

প্রতিশোধের আগুন নিভে যেতেই রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করতে চাইছে এখন শহীদের সর্বাঙ্গে। হাই তুলল।

বারান্দা থেকে নেমে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহটা নিয়ে এগোল শহীদ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা।

গেটের কাছে পৌঁছুতেই একটা কালো ছায়ামূর্তি মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

'ধন্যবাদ, কুয়াশা!' আন্তরিক গলায় বলে উঠল শহীদ।

কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, 'সমাধান হয়েছে?'

শহীদ কথা বলল না। টলে উঠল দেহটা। মাথাটা ঘুরছে ওর।

দু'হাত বাড়িয়ে কুয়াশা ধরে ফেলল শহীদকে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বুকের কাছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে শহীদকে নিয়ে গেটের বাইরে। জ্ঞান হারিয়েছে শহীদ।

***